KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর হুমায়ুন
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৭/১ ৫৭/২ ৫৭/৩	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪ কার্তিক-পৌষ ১৪০৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৩ কার্তিক-পৌষ ১৪০৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কী? প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে 'ভারতবর্ষের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা' সম্বন্ধে পুরাতন প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধতা করে বিতর্কের উপকরণ জুগিয়েছেন শ্রীনিরপেক্ষ।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির পিছনে রাষ্ট্রনেতা এবং পরিকল্পনাকারীদের চিন্তার আদলটি চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সমাজভাবনার বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার জটিল প্রশ্নটি পর্যালোচনা করেছেন অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য।

গৌরী আইয়ুবের অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় উন্মোচিত হয়েছে সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনের কিছু অজানা অধ্যায়।

সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষকে নিয়ে একই ধরনের স্মৃতিচারণায় অধ্যাপক অম্লান দত্ত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং চিরঞ্জীব — পাঠকদের গোচরে এনেছেন বহু অজানা কথা।

পরিবেশ সমস্যার বুনিয়াদি প্রসঙ্গ প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা করেছেন ড. দেবকুমার বসু।

কবি জীবনানন্দ দাশ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সাহিত্য নিয়ে রসগ্রাহী আলোচনা।

বিমূর্ত রাগের চিত্ররূপ রচনার সার্থকতা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কির গায়কভেদে বৈচিত্র্যের যৌক্তিকতার মতো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে দুটি গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত সন্দর্ভ।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর প্রবন্ধসংগ্রহ এবং সেলিম আল দীন-এর নাট্যবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন যথাক্রমে সুধীর চক্রবর্তী এবং ড. বিষ্ণু বসু।

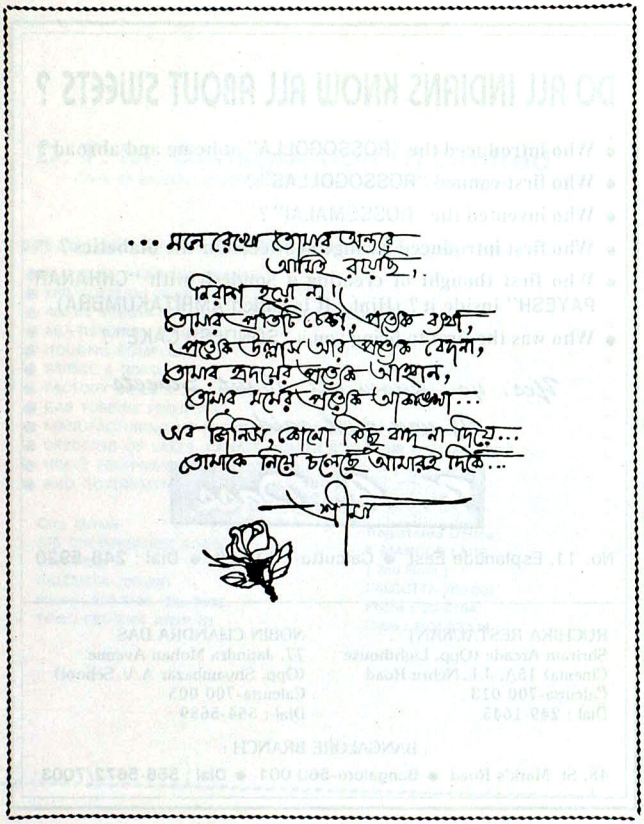

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৩
কার্তিক-পৌষ ১৪০৪

■ কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ ? অথবা এক মহনীয় চ্যালেঞ্জ ?	শ্রীনিরপেক্ষ	২১৯
■ কল্যাণরাষ্ট্র : বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সমাজভাবনা	সৌরীন ভট্টাচার্য	২২৫
■ জীবন ও জীবনান্ত	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২৩২
টিউকল	শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	২৩৩
বাস-রীলিফ	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৩৪
অকর্মণ্য হাত	বিজয়া মুখোপাধ্যায়	২৩৫
আবহমান	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	২৩৬
এবার ভুল	পঙ্কজ সাহা	২৩৭
জলধ্বনি	নাসের হোসেন	২৩৮
স্নানরাত্রি	চন্দন রায়	২৩৯
■ 'সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু'	গৌরী আইয়ুব	২৪০
■ আত্মজীবনীর কিয়দংশ	অসীম রেজ	২৪৬
■ মানুষের বরাত	চুনীলাল রায়	২৫২
প্রসঙ্গ : সন্তোষকুমার ঘোষ		
■ আমি কি ওঁকে বুঝেছি ?	অম্লান দত্ত	২৫৬
■ সন্তোষকুমার	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	২৫৭
■ সন্তোষকুমার ঘোষ—শ্রীচরণেষু	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	২৬৩
■ মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে পরিবেশসমস্যা	দেবকুমার বসু	২৬৬
বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ		
■ আশুতোষজ্জামান ইলিয়াস : সাহিত্য ও সমাজভাবনা	উৎপল ঝা	২৭০
■ 'খোয়াবনামা' প্রসঙ্গে	অশোকেন্দু সেনগুপ্ত	২৭৬
গ্রন্থসমালোচনা		২৭৯
সুধীর চক্রবর্তী ■ বিষ্ণু বসু ■ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ■ সোহরাব হোসেন		
পুলকনারায়ণ ধর ■ মেঘ মুখোপাধ্যায়		
বিশ্বসাহিত্য		
■ মার্কেজ এবং তাঁর একটি উপন্যাস	আনন্দ ঘোষ হাজরা	২৯৫
সঙ্গীত		
■ রাগ : রূপ-অরূপ	মীনাক্ষী ঘোষ	৩০১
■ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে	প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী	৩০৫
■ 'ঘেরাও মন্ত্রী' সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে	দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১১
■ সম্পাদকীয়		৩১৪

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত,
অক্ষর বিন্যাসে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

অফিস : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ দূরভাষ : ২৭-৩৭৭০
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত সম্পাদক : আবদুর রউফ

Philips, Siemens, Siemens Matsushita, Tatas, ACC, Reliance, Helios, GEC-Alsthom, Dun & Bradstreet, Price Waterhouse, Gestetber, Simoco, Modi Telstra, RPG Sprint, IBM, HCL-HP, Sema, Apple, PCL.

The key Players are in action

In West Bengal

Today electronics majors from India and the world crowd the planned infrastructure of Saltlec, India's only fully integrated electronics complex in Calcutta. With a modular, walk-in, Standard Design Factory and an in-home, modern, all world telecommunication network run by Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL). With several test houses of international standard, an indo-German Vocational Training Centre for Electronic Test Engineering (CETE), a Software Technology Park. A future compatible infrastructure for IT—'Infinity, the intelligent City is coming. The work on the first phase of Infinity—Think Tank Towers is progressing as scheduled.

Work on many more such facilities are commencing shortly. Side by side training centres, finishing schools and new technical institutes are coming up with special emphasis. Exclusive electronic complexs are coming up in various districts of the state.

All of these have made Webel the leading electronics industry development agency in India—a resource base for the country and beyond. Major projects are proceeding apace not only in Calcutta but out in the districts of West Bengal—the choice of key electronics companies from across the globe.

Webel West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited

Webel Bhawan, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Calcutta 700 091, India
Phone : 91-33-357 1710/1725/1740 Fax : 91-33-357 1739/1708
E.Mail Webel @giasclo1.vsnl.net.in.

কাশ্মীর কি রাষ্ট্রীয় অভিশাপ ? অথবা এক মহনীয় চ্যালেঞ্জ ?

শ্রীনিরপেক্ষ

॥ তৃতীয় খণ্ড ॥

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ নয়, কিন্তু দুই একটি বৃহৎ ব্যতিক্রম ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় প্রত্যেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এই 'বিশ্বাসটি' ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশিষ্টতম ভণ্ডামি।

কলকাতা, কানপুর, মুম্বাইর কয়েকটি দরিদ্রতম এবং সেই কারণেই জঘন্যতম বস্তিতে গিয়ে একবার যে দাঁড়িয়েছে, সেই জানে—আর তার আত্মার ভগবান জানেন—দরিদ্র মুসলমানের চেয়ে দরিদ্র এই ভারতে আর কেউ নেই। মেথর, ধাঙ্গড়, অছ্যুতের চেয়েও এই মুসলমান আরও দলিত। এই মুসলমান ভারতের অজ্ঞাত, অচিহ্নিত নাগরিক। এর পুত্রের জন্য শিক্ষা নেই, এর স্ত্রী পর্দার অন্ধকারে আজীবনের জন্য বন্দি। এই মুসলমান কতকগুলি দরিদ্র অশিক্ষিত মৌলভির শিকার। তুরস্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এর চেয়ে নিগৃহীত আর কেউ নেই। এই মুসলমানের একমাত্র অস্তিত্ব অথবা জীবনস্পন্দনও বলতে পারেন, সংঙ্ঘাবদ্ধ আছে ভোটব্যাঙ্ক নামক ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনী ষড়যন্ত্রে। এই একটি ন্যূনতম সত্ত্বাধিকারের জন্য সে মাঝেমধ্যে 'বারগেইনিং কাউন্টারে' উত্তমর্ণের দিকটায় বসবার জায়গা পায়। উত্তমর্ণের ওই মেকি স্বীকৃতি লাভ করার সময়ও সে মধ্যবিত্ত হিন্দু পার্টিগুলির রোমান্স, অর্থাৎ ফুসলানির লক্ষ্যবস্তু হিসাবে হঠাৎ এবং ক্ষণস্থায়ী একটা পদমর্যাদা লাভ করে। তার বেশি কিছু নয়। পক্ষান্তরে, মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার জিগীর সৃষ্টিকারী কিছু কিছু গোঁড়া মুসলমানি পার্টিও তখন তাকে এসে ধর্মীয় ব্যক্তিসত্তা বা 'আইডেন্টিটির' কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, মুসলমানের (অথবা মছলমানের ?) অপরিসীম ঐতিহ্যের বুলি ঝাড়ে। দুই-ই অবশ্য পরিষদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোয় আপনসর্বস্ব শোষক ছাড়া আর কিছু নয়। দরিদ্র মসজিদে সভাপতিত্ব করেন যে-মৌলভি তিনি পরিষদীয় গণতন্ত্রের শাবক নন। কিন্তু যে গরিব মুসলমানের ঘরে জন্মেছে মৌলভির হাত থেকে তার রেহাই নেই। সে মৌলভির সর্ব সময়ের ভিটে প্রজা। সেখানে সে বন্দি আছে অনেক আগে থেকেই—স্বাধীন ভারতবর্ষ, কিংবা তার পবিত্র বিধানের সঙ্গে এই দ্বিতীয় এবং বৃহত্তম শোষকের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই, যদিও স্বাধীন ভারত এবং আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এই দ্বিতীয় শোষকটিকে অনেক অনায়াসলব্ধ শক্তি উপহার দিয়েছে।

সংখ্যালঘুরা সবদেশেই নিগ্রহের বস্তুতে পরিণত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকবে, এ কথা মহম্মদ আলি জিন্না নিশ্চিতভাবেই জানতেন। এই আশঙ্কার ভিত্তিতেই পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি এবং আন্দোলন তৈরি হয়। অন্যদিকে, এই সম্ভাবনা আছে বলেই কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা ১৯৪৭ সনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইচ্ছাকে একটি বিশেষ এবং মহার্ঘ্য আদর্শরূপে স্থান দিয়েছে। সেই অভীষ্ট সাধনের জন্যই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র স্থাপনের সন্ধান। অর্থাৎ সংখ্যালঘু অভিপ্রায়, বিশেষত মুসলমানেরা নিগ্রহের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে—এই আশঙ্কা ঐতিহাসিকভাবেই ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে কাজ করেছে। সেই জন্য এই আশঙ্কাই বহুলাংশে ভারতীয় রাজনীতির নিয়ামক শক্তিতেও পরিণত হয়েছে।

কোনও প্রকার আশঙ্কা প্রতিরোধ করা, কিংবা কোনও প্রকার বিপদ নিবারণের জন্য যদি একটি কর্মসূচি তৈরি করা হয়, তাহলে সেই কর্মসূচিকে আমরা মহানুভব, সমবেদনশীল, মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করতে পারি। সেই অর্থে ১৯৪৭ সালের পূর্বে এবং পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই নিজেদের সাংগঠনিক মূলনীতিগুলির মধ্যে

সংখ্যালঘু অহিন্দু সম্প্রদায়ের বিপদ এবং শোষণ মোচনের জন্য যেসব কর্তব্য বা সঙ্কল্প লিপিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটিই প্রশংসনীয়। কিন্তু কার্যত এই সঙ্কল্পগুলিকে বাস্তবে পরিণতি দেওয়ার জন্য কোনও পার্টিই, কোনও উল্লেখযোগ্য আন্দোলন কিংবা কর্মসূচি গ্রহণ করেননি। কী রকম সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব ছিল, তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো যায় আজকের নারীবাদী, কিংবা পরিবেশদূষণ বিরোধী কর্মসূচিগুলি করার সাহসও তাঁদের ছিল না। বিগত ৫০ বৎসরে এই সঙ্কল্প উদযাপনের জন্য কোনও পার্টিই কোনও অভিনব আন্দোলন শুরু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ কিংবা কেরলে, মহারাষ্ট্রে কিংবা তামিলনাড়ুতে — এরকম কোনও দৃষ্টান্ত কি একটিও আছে? কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল এই জন্য যে, এই দুইটি রাজ্যের রাজনৈতিক মনস্কতা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। মহারাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হল এই কারণে যে, বিগত ৫০ বছরে — যার কৃপা, বা চেষ্টায় হোক — ভারতবর্ষের অন্য সব রাজ্যের তুলনায় এই খাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে মাথাপিছু সর্বোচ্চতম জি ডি পি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমাজবাদী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত ধনিকতমেরা এই রাজ্যে বাস এবং সম্পদ সৃষ্টি করেন। এখানেও কি মুসলমানদের মুক্তির জন্য কোনও ব্যাপক (এমনকী গুরুত্বপূর্ণ?) রাজনৈতিক কর্মসূচি রূপ লাভ করেছে? তামিলনাড়ুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য একটি বিশেষ কারণে। এই রাজ্যে সংখ্যলঘু মুসলমান অপেক্ষাকৃত কম। সংখ্যালঘু খ্রিস্টান বেশি। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের রজ্জুতে বাঁধা রাজনৈতিক দলগুলি এই রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রকৃত, কিংবা কৃত্রিম উদারনীতি দেখাতে পারত। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে ভোট হানির বিশেষ আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু উপরে উক্ত কোনও রাজ্যেই পতিতের চেয়ে পতিত, দরিদ্রের মধ্যে যে দরিদ্রতম, যে-মুসলমান তার নিজ সম্প্রদায় এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, উভয়েরই স্বার্থের শিকার, তাকে মুক্তির সঙ্কল্প দিতে পারে এমন কোনও আন্দোলনের কথা ভূভারতে কেউ শুনেছে?

একদা ধর্মনিরপেক্ষতা ভিত্তিক রাষ্ট্রকল্পনা হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৫ সনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে একদিকে সংখ্যালঘু কিন্তু বিত্তবান, শঙ্কিত মুসলিম বুর্জোয়া গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কল্যাণবিধানের জন্য যেমন মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়, তেমনই অন্যদিকে একই সময়ে হিন্দু দেশাত্মবোধসঞ্জাত আন্দোলনগুলির মধ্যে এই উপলব্ধি জন্মলাভ করতে শুরু করে যে, ভারতীয় বাস্তব রাজনীতি অবশ্যম্ভাবীভাবেই ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত স্বার্থশিবিরের দিকে আকর্ষণ করবে। কোনও তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলে সেই তৃতীয় পক্ষও অনিবার্যভাবেই এই দুই বৃহত্তম সম্প্রদায়কে ক্রমাগত দ্বিধাবিভক্ত, এমনকী সংঘর্ষসঙ্কুল স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত দেখতে চাইবে এবং সেইজন্য ফুসলাবে। এই বাস্তবানুগ রাজনীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'বিভক্ত রাখ, শাসন করা সহজ হবে', ভারতবর্ষে ১৯২০-২৫ নাগাদ ব্রিটিশ সরকার জ্ঞাতসারে এই নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। নীতিটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য কোনও তাত্ত্বিক চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়নি। তৎকালের রাজনীতির ক্ষেত্রে এইরূপ প্রকট এবং দৃশ্যমান বাস্তব আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রসার ("জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে" কথাটির উৎপত্তি) এবং ক্রমেক্রমে ওই সামাজিক সম্প্রীতির চিন্তাধারা ও কর্মসূচিগুলিই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের আদর্শরূপে পরিণতি লাভ করে। এই মনোভাব না নিলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে কোনও সংঘবদ্ধ আন্দোলন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এই অসাম্প্রদায়িক নীতি ঘোষণা ছাড়া কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য প্রতিনিধি হিসাবে ব্রিটিশ দরবারে নিজের পরিচয়পত্র দাখিল করতে পারবে না এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় কংগ্রেসের অধিকার অবিসম্বাদিত ও অবিভাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হবে না, একথা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও মূর্খ কংগ্রেসকর্মীও তখন জানত। যা ক্ষমতাভিলাষী রাজনৈতিক কৌশলমাত্র, তাকেই গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেসিরা একটা আদর্শবাদের রূপ দিলেন। আদর্শবাদ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বীকৃতি, উপলব্ধি এবং ঘোষণা একদিকে চলল। অন্যদিকে হিন্দু এবং মুসলমানের বিবদমান, পরস্পরের প্রতি সংঘর্ষসঙ্কুল প্রোথিত স্বার্থ যথাবিহিত ভাবেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সত্য এবং বাস্তবকে উদ্ঘাটিত করতে লাগল।

অসাম্প্রদায়িক, অখণ্ড ভারতীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গান্ধী হিন্দুদেরও নামালেন খিলাফৎ আন্দোলনে, কারণ খিলফতীদেরও এর দরকার অসহযোগ আন্দোলন যাতে এক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে পরিণত না হয়। কিন্তু তাতে বাস্তবের ভবি ভুলবার নয়। প্রকাণ্ড সর্বভারতীয় আন্দোলনের দ্বারা ইংরাজের কাছে এক একবার গান্ধী প্রমাণ করেন যে, কংগ্রেসই ভারতের সর্বময় নেতা। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই নিয়মিতভাবে — নেতাদের চোখের সামনেই — নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথা তুলে দাঁড়ায়। বিশ, ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে — অসহযোগ ('২১), আইন অমান্য ('৩২) এবং ভারত ছাড়ো ('৪২) আন্দোলনগুলি যেমন হিন্দু ও মুসলমানকে অভিন্ন এবং এক অভীষ্টের দিকে লক্ষ্যবদ্ধ রাখতে চেয়েছে, তেমনই এই তিনটি দশকই ভারতবর্ষে পুনঃপুনঃ হিন্দু মুসলমানের হিংসার রক্তে প্লাবিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ এবং ভীতি বীভৎস দাঙ্গার মূর্তিতে দেখা দিতে থাকে পৌনঃপুনিক অনিবার্যতার নিয়মে। দুই সম্প্রদায়কে এক এবং অভিন্ন শত্রুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলেন গান্ধী এবং কংগ্রেস। অন্যদিকে

হিন্দু এবং মুসলমানের বাস্তব জীবন এবং স্বার্থচেতনাও একই প্রকার তীক্ষ্ণ আলোক এবং কখনও কখনও বীভৎস চিহ্নের দ্বারা দেখিয়ে দেয় যে, হিন্দুর শত্রু মুসলমান। মুসলমানের শত্রু আর কেউ নয়, হিন্দু ছাড়া।

অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা মানবিক লাবণ্য আছে। এই লাবণ্য হিন্দু অন্তঃশীল ধর্মচেতনার সঙ্গেও খাপ খায়। গান্ধীর মধ্যে ভারতের ইতিহাস এই লাবণ্য অনুভব করেছে। অন্যদিকে মুসলমান যতই ভিন্নস্বার্থবুদ্ধি দ্বারা রাজনৈতিক বাস্তব, অথবা ধর্মালয়ের বাস্তবের দ্বারা চালিত হোক না কেন, গরিব — বিশেষত যে-মুসলমান গ্রামচ্যুত হয়নি — তার মধ্যে একটা স্বভাবজাত ঐতিহাসিক ইনস্টিংক্টও সর্বদাই কতকাংশে কাজ করে গেছে — কখনও স্তিমিত, কখনও উচ্চকিত। শান্তির সময় সেই ইন্‌স্টিংকটের কোমল প্রভাব মুসলমানকে হিন্দুর নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি পাঠিয়েছে। বাঙালি হিন্দু জনাব ফজলুল হকের মধ্যে এই ইন্‌স্টিংকট সবচেয়ে প্রকাশমান দেখেছে। (অন্যান্য বাঙালি হিন্দুর মতোই বাঙালাদেশি মুসলমানদের মধ্যে এই স্বভাবজাত নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি এই লেখকও বোধ করেছে। কিন্তু এই টান এবং অপরদিকে বিচ্ছেদের দূরত্ব যে কত তীব্র হতে পারে তা শ্রীনিরপেক্ষর পক্ষে কোনওদিনই উপলব্ধি করা সম্ভব হত না, যদি না সে ভাগ্যের নির্দেশে একদা কনিষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ঢাকায় ইত্তেফাক কাগজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেনের, অর্থাৎ মানিক মিঞার ঘনিষ্ঠ, অগ্রজপ্রতিম স্নেহস্বর্গের ঠিকানা না পেত।) এই দুই কারণেই স্বাভাবিক গ্রামীণ সমাজে কিছু কিছু পৌনঃপুনিক, নৃশংস ব্যতিক্রম সত্ত্বেও গ্রামস্থিত হিন্দু ও মুসলমান বেশিরভাগ সময়ই স্বাভাবিকভাবে নিকট প্রতিবেশীর মতোই সংহতভাবে বাস করতে পেরেছে এবং দাঙ্গার উদ্ভব ও আক্রমণকে অস্বাভাবিক বিকৃতি হিসাবে জ্ঞান করেছে। গান্ধী বাল্যাবস্থায় আধা শহরে গুজরাতি বানিয়া পট্টিতে এই সামাজিক লাবণ্য লক্ষ করেছিলেন। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায়, বুর্জোয়া হিন্দু এবং একই প্রকার বুর্জোয়া মুসলমানদের বাদশাহি সংস্কৃতির মধ্যেও এই সামাজিক আত্মীয়তার বোধ বিদ্যমান ছিল। নেহরু ওই অসাম্প্রদায়িকতায় গঠিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই সামাজিক সত্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিবর্তনের (বিপ্লবের?) ধোপে টিকে থাকতে পারবে, একথা স্বপ্নাবিষ্টের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৩০ এর দশকের গোড়া থেকেই ভারত অবিসম্বাদিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক পুঁজি, সমাজ এবং শাসন ব্যবস্থার বাইরে চলে যাওয়ার রাস্তায় গতিবেগ সঞ্চয় করতে থাকে। স্বাধীনতার সময় একই সঙ্গে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক বুনট (এবং শাসন ব্যবস্থার) শেষ ঘণ্টা বাজে। ওই বুনট এবং গ্রামীণ সমাজশাসন ব্যবস্থায় বেশির ভাগ নরনারীর মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সহজাত এবং স্বাভাবিক ছিল, তা বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক বিবর্তন সত্ত্বেও এবং প্রস্তাবিত বয়স্ক ভোটাধিকারের দ্বারা তৈরি নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আত্মরক্ষা করতে পারবে, গান্ধী-নেহরু-সুভাষ ইত্যাদির এই আশা বাস্তবের ছলনা হিসাবে কাজ করেছে। এই ছলনার কাছে একমাত্র ব্যক্তি যিনি আত্মসমর্পণ করেননি, তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে পারে না সেই ব্যক্তির নাম মহম্মদ আলী জিন্নাহ। ক্ষমতাপ্রেম এবং নেতৃত্বের দুর্জয় রোমান্স তাঁরও ছিল, যেমন ছিল নেহরু এবং প্যাটেলের। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্ন বা রোমান্স অবধারিতভাবে জিন্নাকে নিয়ে গেছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ মোলাকাৎ করার জন্য। আমরা রোমান্টিক প্রগতিশীল লোকেরা জিন্নাহকে ব্যক্তিগত ঘৃণার বস্তুতে পরিণত করেছি। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কুসংস্কার প্রসূত মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে, জিন্নাহর রাজনীতিকে পক্ষপাতহীন, যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁর চিন্তাধারার পক্ষে, কি বিপক্ষে আমাদের থাকা উচিত ছিল, সে প্রশ্ন আমার নয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি পাকিস্তান সৃজনের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু আসল কথা তা নয়। স্বীকার করতে হবে যে, জিন্নাহ তাঁর বাস্তব রাজনৈতিক উপলব্ধিবশত নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে আপোষহীন ভাবে অনুসরণ করবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর রাজরাজত্বে মুসলমান চিরকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে বাধ্য হবে। কাজেই এই বাস্তবানুগ আশঙ্কাকে কাজে লাগিয়ে মুসলমান সমাজকে সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা দিলেই তাদের স্বার্থ বেশি সংরক্ষিত হবে। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে ভারতের তৎকালীন শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত, পেশাদার সমাজ বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিক, পরিষদীয় পশ্চিমি গণতন্ত্রকেই একমাত্র রাষ্ট্ররূপ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অতি মুষ্টিমেয়, কিছু সংখ্যালঘু রাজনৈতিক নেতা বিকল্প হিসাবে প্রলিটারিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন, একথা সত্য। যেহেতু মুসোলিনি এবং হিটলারের মডেল কিছু বিকৃতবুদ্ধি মানুষ ছাড়া অন্যেরা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি, সেইজন্য বৃহৎ ভারতবর্ষের রাজনীতির নিয়ামক চিন্তাধারা — মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস নির্বিশেষে — পশ্চিমি, ভোটের গণতন্ত্রকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

এই ব্যবস্থা ভাল কি খারাপ, এর সঙ্গে ভারতীয় সমাজের আবহমান কালের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের কী কী সাদৃশ্য বর্তমান — এবং সেই কারণে এই রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণই ম্লেচ্ছ কি, ম্লেচ্ছ নয়, বহিরাগত কি আত্মিক, exogenous কি অনেকাংশে introgenous — ইত্যাদি প্রশ্ন অন্য কোনও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ বর্তমান থাকতে তো পারেই, বরং ওই পরিবেশে ওই

সামাজিক সম্প্রীতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এর মতো প্রকাণ্ড ভুল আর কিছু হতে পারে না।

স্বাধীন ভারত আজ ৫০ বৎসর বয়স্কা। এর সর্ব অঙ্গে একটি রাজনৈতিক বাস্তব পুনঃপুনঃ দৃশ্যমান হচ্ছে, কখনও অনুচ্চ আলোয়, কখনও নৃশংস সত্যের আলোকপাতের দ্বারা। সে একই কথা পুনঃপুনঃ বলে যাচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে কে সেকথা শুনবে?

সুসংবদ্ধ, প্রধানত একজাতিক এবং অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সমাজ ছাড়া সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের গণতন্ত্র কাজ করে না। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে—বিশেষত পার্টিভিত্তিক নির্বাচনী প্রতিযোগিতার ফলে—সমাজের ফাটল, স্বার্থের বৈষম্য, ধর্ম ও রীতির পার্থক্য ইত্যাদি পরিষদীয় গণতন্ত্রে ক্রমশ বিলীয়মান হয় না, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় না, সাধারণ মানুষ এবং তার শাসকবৃন্দ—প্রজা এবং ম্যাজিস্ট্রেট—পরস্পরের প্রতি ক্রমশ শালীনতর হয় না। গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল অথবা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, কিংবা রফি আহমেদ কিদোয়াই কোনও নেতার বিবৃতি বা আত্মজীবনীতে একথা উল্লিখিত হয়নি যে, পরিষদীয় গণতন্ত্র স্বভাবতই সংহতির বিরুদ্ধপন্থী। এই গণতন্ত্রও অন্য এক ভিন্ন চরিত্রের divide-and-rule পদ্ধতিতে কাজ করে। এই পদ্ধতির বহুবিধ, বর্ণাঢ্য এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ইতিবাচক গুণাবলী এখানে আলোচ্য নয়। তার তালিকা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ। প্রতিযোগিতামূলক, পরস্পরবিরোধী স্বার্থগোষ্ঠীকে সুসজ্জিত অধিকার দিলে (এবং ব্যক্তিমাত্রেই সমান ভোটাধিকার লাভ করলে) সমাজে কী বিষময় ফল দেখা দেয় বিগত ৫০ বৎসরে তা সর্বত্র প্রকট হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা এবং সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক নেতাদের মধ্যে এই দুর্গুণ, কিংবা অন্তর্দ্বন্দ্ব, কিংবা divide-and-rule পদ্ধতির অবিমৃশ্যকারিতা সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁরা রাজগৃহসংস্কৃতি, অর্থাৎ Metropolis এর ঐশ্বর্যে ও শালীন প্রগতিতে মোহমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু আমরা ৫০ বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এসবও কোন মোহের বশে এই শাসন ব্যবস্থার প্রকট দুর্গুণাবলীর সমাক হিসাবনিকাশ করতে ভয় পাই? ওই দুর্গুণাবলীর দিকে কেন আমরা এখনও চোখ বন্ধ করে রাখি?

এই গণতন্ত্রের দৃষিত আবহাওয়ায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছে। এই বহুমুখী, বহুভাষী, বহুজাতিক, ভিন্ন ইতিহাসসঞ্জাত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পরিষদীয় গণতন্ত্র কখনওই 'জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে' নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে না, কিংবা মৈত্রীর পরিবেশ নির্মাণ করতে পারে না।

শুধু এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের আত্মসম্মোহিত জয়গানকে আমি ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা বলে জ্ঞান করি। বর্তমান শাসন পদ্ধতিতে সংখ্যালঘুর প্রতি ন্যায়বিচার লাভ করা বা সামাজিক সহনশীলতা তৈরি করা সম্ভব হয়নি, একথা আমার মতো অনেকেই স্বীকার করবেন। কিন্তু খুব কম লোকই আছেন যাঁরা স্পষ্ট স্বীকার করবেন যে, বর্তমান ব্যবস্থায় অদূর ভবিষ্যতেও এই ন্যায়বিচার, কিংবা সামাজিক সহনশীলতা সম্ভবপর হবে না।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামির আর একটি বেদনাদায়ক দিক এই যে, এই ভণ্ডামির পরোক্ষ প্রভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তলার দিকের পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ মানুষ পূর্বের চেয়ে আজ আরও অধিকতর দরিদ্র হয়েছে, পূর্বের তুলনায় তাদের শিক্ষার প্রগতি সামান্যও ঘটেছে কিনা সন্দেহ, বরং অতিশোষণ এবং অতিদারিদ্রের ফলে দরিদ্র মুসলমান, বিশেষত গ্রামচ্যুত যারা, তারা আরও বেশি ধর্মান্ধতার শিকারে পরিণত হচ্ছে। এই কারণে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে কৃত্রিম ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান আছে তাতে কার্যত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিই হয়েছে। মুসলিম সমাজের অনগ্রসর এবং দারিদ্রপীড়িত পঞ্চাশ-ষাট শতাংশ নরনারী ও শিশুর সম্বন্ধে এই অভিমত শুনতে কঠিন।

কাশ্মীর সম্বন্ধে আমার তৃতীয় কিন্তির প্রবন্ধটিতে মুখ্য প্রশ্ন ছিল: কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কী? সরাসরি সেই প্রশ্নে প্রবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু অপ্রীতিকর সত্যভাষণের ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু সেই বিবৃতি যে এতটা দীর্ঘ হবে, তা আশঙ্কা করিনি। তবে, পাঠক যদি এই বিবৃতি ক্রান্তিকর মনে না করে থাকেন এবং উপরোক্ত মন্তব্যগুলির দ্বারা আমি যদি পুরাতন, প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস সম্বন্ধে বিতর্কের উপকরণ দিয়ে থাকি, তাহলে নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ দেখি না।

কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কী?

প্রথম, ধর্মনিরপেক্ষতার ঠাঁট বজায় রাখার জন্য মুসলমান প্রধান একটি রাজ্য (বা প্রদেশ) ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকুক, এই দুঃসাধ্য বাসনা ভারত শীঘ্র ত্যাগ করবে না। এ বিষয়ে ভারতীয় কনসেন্সাস প্রায় হিমালয়ের মতোই দৃঢ় এবং অলঙ্ঘ্যণীয়।

দ্বিতীয়, গণতন্ত্রের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য কাশ্মীরের নরনারীর পরাধীনতাকেও নানাবিধ প্যাকেজের দ্বারা একদিকে আমরা স্বাধীনতার ছদ্মবেশ পরিয়ে রাখব। অন্যদিকে যখনই এই পরাধীনতার চেহারা প্রকট হতে চাইবে, তখনই দিল্লির সরকার কাশ্মীরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্যিক ভেট, নজরানা এবং ঘুষ পাঠাতে থাকবে। অতীতে সামন্ততান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় করদ রাজা ভেট পাঠাত মূল রাজশক্তির কাছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা বিপরীত আচরণকেই বেশি উপযুক্ত জ্ঞান করি। সুতরাং দিল্লির ভেট কাশ্মীরে যেতে থাকবে—ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য মাথাপিছু উৎকোচ।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই উলটা প্রথা খারিজ করে এক সময় দিল্লির ডিক্তি এবং গুপ্ত শাসন কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আট বৎসরব্যাপী এই অভীপ্সার ফলে ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীর প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, একথা আমি পূর্বেকার কিস্তিগুলোতে উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী গান্ধীর প্রচেষ্টার পূর্বে এবং বর্তমান সরকারের আমলে—কাশ্মীর সরকারকে প্রভূত পরিমাণে ভেট পাঠানো হচ্ছে। যদি ঘুষ দিয়ে কাশ্মীরের মুসলমানকে হাত করা যায়।

চতুর্থ, এই বৈষয়িক উপঢৌকন এবং আর্থিক যৌতুকের ফলে কাশ্মীরের নরনারী কি ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকবে? আমার স্পষ্ট বিশ্বাস, কাশ্মীরকে অতীতের রাজনীতির আদর্শ এবং অঙ্গীকারের দ্বারা আবদ্ধ রাখায় বর্তমান যুবা সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ থাকার কথা নয়। এর পিছনে কোনও যুক্তি, অথবা বাস্তবতা নূতন যুগের কাশ্মীরিরা দেখতে চাইবে না। চাইলেও দেখতে পাবে কিনা সন্দেহ। কেননা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা রাজা নির্মাণের প্রতিজ্ঞা ও সংস্কৃতি এই ভারত উপমহাদেশে শুধু নয়, অন্যত্রও বহুধা বিপর্যস্ত (দৃষ্টান্তের দ্বারা এই প্রবন্ধকে দীর্ঘ করার কোনও কারণ দেখি না)। অপরপক্ষে লক্ষণীয়, কাশ্মীরের সন্নিকটবর্তী পূর্বতন সোভিয়েতের ভগ্নাংশ থেকে যে ঐসলামিক রাষ্ট্রগুলির জন্ম হয়েছে, তারা যেমন কাশ্মীরের সঙ্গে বন্ধুকরণী, কাশ্মীর তার চেয়েও বেশি তাদের নৈকট্য ও সখ্যতা আকাঙ্ক্ষা করে। তাই মনে হয় স্বাভাবিক।

পঞ্চম, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজবাদের অবস্থা উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল্ করা ছাত্রের মতো বার কয়েক চেষ্টা করেছে, আবারও চেষ্টা করবে। তার অবস্থা করুণ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাস্যকরও। এই অপদস্থ, ভারতীয় গণতন্ত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরাই আজ বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হয় না। শহরের মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্টি সক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক বিবেকবুদ্ধি ক্রমশ্রিয়মান। মঞ্চ প্রদীপের সম্মুখবর্তী সারির দর্শকেরাই যদি এই অনুষ্ঠানের প্রতি মোহ, আকর্ষণ কিংবা সচেতনতা হারিয়ে থাকে, তাহলে কাশ্মীরের নবযুগের সন্তানেরা কি ইন্দ্রকুমার গুজরালের ভজনায় মুগ্ধ হবে?

ষষ্ঠ, এক বৎসর দুই মাস পূর্বে ডঃ ফারুখ আবদুল্লা ক্ষমতায় তৃতীয়বার আসীন হওয়ার পর—যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জনৈক যুক্তফ্রন্ট শরিকের দ্বারা গঠিত কাশ্মীর সরকার এক বৎসরাধিককাল স্থায়ী হওয়ার ফলে—একথা কি আশা করা যায় যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ গতিপথ ১৯৯০-'৯৬'র রাস্তা থেকে বিরাট একটা মোড় নিয়ে সরে গেছে এবং অনন্তিদূর ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণই স্তব্ধ হবে? আমি মনে করি হবে না। আমার এই রাজনৈতিক অভিমত যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় এবং যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত, সেগুলিও যদি ধূলিসাৎ হয় তাহলে আমার চেয়ে কেউ বেশি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে না।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ এবং সেই সঙ্গে শেখ আবদুল্লা ও তৎপুত্র ফারুখের ভাগ্য তিনবার চক্রবৎ আবর্তিত হয়েছে—কাশ্মীর আমাদের এখন-মিত্র-তখন-শত্রু। বর্তমান পর্যায়টি মিত্রতার। এর পরের আবর্তে ঘূর্ণমান ভাগ্যচক্র শত্রুতার কোঠায় প্রবেশ করবে না, এরকম মনে না করার কোনও কারণ আমি দেখি না। বরং এরকম মনে না করার যুক্তিগুলিই ভারতে এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমশ প্রবলতর হচ্ছে। হতে থাকবেও।

তাহলে বর্তমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশের এবং ডঃ ফারুক আবদুল্লার আপাতদৃষ্ট সাফল্যের কারণ কি?

আমার প্রথম কিস্তির লেখায় আমি সশ্রদ্ধে স্বীকার করেছিলাম যে, আধুনিক দুনিয়ায় যেদিকেই তাকানো যায়—মধ্যপ্রাচ্য, যুগোশ্লাভিয়া, উত্তর আয়ারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ফিলিপিনস—যে সন্ত্রাসবদ্ধ অঞ্চলের দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন একটা উপপাদ্য ক্রমশই অখণ্ডণীয় সত্যের চেহারা নিচ্ছে। যদি কোনও দেশের রাষ্ট্রশক্তি কোনও অভ্যন্তরীণ কারণে দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং সেইকালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ যদি পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত রাখা যায়, তাহলে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বেসরকারি সন্ত্রাসবাদ কালক্রমে অবসাদগ্রস্ত হতে বাধ্য। কাশ্মীরে সেই অবসাদ দশা বর্তমানে বিদ্যমান।

কিন্তু এই অবসাদ চিরবিদ্যমান হবে এবং কাশ্মীরের মুক্তিকামী নবযুগের মানুষ একই সঙ্গে পাকিস্তান এবং ভারতের বন্ধনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য নূতন আন্দোলন তৈরি করবে না, একথা কে বলতে পারে? কাশ্মীর যত শান্তির পরিবেশ পাবে, যত আর্থিক অবাবস্থা হ্রাস পাবে, ততই কাশ্মীরে ওইরূপ আন্দোলন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, একথা রাজনীতির চক্ষুষ্মান পর্যবেক্ষকেরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন। কাশ্মীরকে যদি স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করে দেওয়া হয়—যে-লক্ষ্য বিজেপি ছাড়া ভারতের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী নরনারীর কাছে কাম্য হওয়া উচিত—তাহলে ওই সাবলকত্ব ক্রমশ কাশ্মীরকে পূর্ণ যৌবন, অর্থাৎ স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর করে দেবে। গণতন্ত্রের ওই চরিত্র অনস্বীকার্য—যত দেওয়া যাবে তত চাহিদা বাড়বে।

বিজেপি এই ভবিষ্যতের পরিপন্থী এবং সেইজন্যই স্বাভাবিকভাবেই পরলোকগত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে বর্তমান বাজপায়ি-আদবানি-যোশি নেতৃত্ব পর্যন্ত সকলেই কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিলেন। এর মধ্যে ভণ্ডামি সামান্যই, সেই বললেই চলে। প্রশংসনীয় স্পষ্টতার সঙ্গেই বিজেপি একটি যুক্তিবিন্যাস অবলম্বন করে রয়েছে: মহারাজার অন্তর্ভুক্তি চুক্তির পর কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তাকে অঙ্গচ্যুত করার অধিকার না আছে নেহরুর, না কোনও

আবদুল্লার। এই যুক্তি বিন্যাস যে গ্রহণ করে, তার পক্ষে একথা স্বীকার করাই স্বাভাবিক যে, পশ্চিমবঙ্গ, কিংবা অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার নেই, স্বতন্ত্রভাবে তা কাশ্মীরকে দেওয়া উচিত নয়। ন্যায়সঙ্গত নয়। বাস্তববুদ্ধি সম্মতও নয়। কাশ্মীর সম্বন্ধে বিজেপি প্রকাশ্যেই আধিপত্যবাদী। তার সঙ্গে পাকিস্তানিদের বা আজাদ কাশ্মীরিদের সাদৃশ্য অসাধারণ।

সুতরাং মুস্কিল বিজেপিকে নিয়ে নয়, আমাদের মতো তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যক্তিস্বাধীনতাপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নিয়েই আসল যন্ত্রণা। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বলব, সংখ্যালঘু দরিদ্র মুসলমানদের শোষিত হতে দেব — সে শোষণ তার নিজের সম্প্রদায়ের মোল্লারাই করুক, অথবা পরিষদীয় ভোট ব্যাঙ্কই করুক। ভারতবর্ষে সমাজবাদের অপমৃত্যু ঘটেছে, একথা স্বীকার করার সাহস আমাদের নেই। গরিবের সংখ্যা আনুপাতিক হারে — এবং বিশিষ্ট সংখ্যা হিসাবেও — বাড়ছে, সেকথা অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। পার্লামেন্টে শালীনতার শেষ চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত। ভোটের বাক্সগুলিতে যত ব্যালট পড়ে তার চেয়ে বেশি পড়ে দুর্নীতির স্বাক্ষর। মুসলমান দলিত ছাড়া, অন্য সব দলিত, বিশেষত হিন্দু দলিতরা সর্বহারার ন্যায় রাজনীতির ডান্ডা ঘোরাচ্ছে। যদিও অবশ্য দু'বেলা তাদের ভাত জুটছে না একথাও সত্য। তথাপি প্রগতিবাদীদের কাণ্ডজ্ঞান হওয়ার নয়। তাঁদের আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। তাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন যে, এই ভগ্নরথ গণতন্ত্র, এই বিকাল সমাজ এবং কৃত্রিম ধর্মনিরপেক্ষতার ডাকে কাশ্মীরের ৩১ লক্ষ মানুষ ভারতমাতার দিকে ঢুলুঢুলু নেত্রে তাকিয়ে থাকবে।

জম্মু এবং কাশ্মীর সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে যে জনমত জগদ্দল পাথরের মতো তৈরি হয়ে আছে, সেই জনমতকে নতুন করে শিখিয়ে পড়িয়ে নতুন একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত কাশ্মীরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুস্থ হতে পারে না। বিরোধীমতাবলম্বী কোনও রাজ্য, অথবা রাজ্যাংশের অধিবাসীদের (যেমন, রাজ্য অর্থে কাশ্মীরি মুসলমান, কিংবা নাগা অঞ্চলের ভূমিপুত্র, অথবা রাজ্যাংশ অর্থে দার্জিলিঙের গোর্খা সম্প্রদায় ইত্যাদির) সঙ্গে কী প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলে আমাদের স্বকীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং সুরুচি রক্ষা হয়, তা বিগত ৫০ বছরেও আমরা শিখিনি। (পূর্ববর্তী একটি কিস্তিতে এই বিষয়টি আভাসে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমি বলেছিলাম যে, মার্কিন দেশের গণতন্ত্র যে কতটা সবল এবং সুস্থ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরোধিতায় জনমত এবং সংবাদপত্রের প্রখর ভূমিকা থেকে। যে সব রাজনৈতিক বিষয়কে আমরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করি, সেসব বিষয়ে ভারতীয় জনমত — বিজেপি থেকে সিপিআইএম পর্যন্ত — অখণ্ড থাকতে অভ্যস্ত। কাশ্মীরের কিংবা নাগা অঞ্চলের ভবিষ্যৎ কী হবে, কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য কী প্রকার শর্তাধীন, অথবা নিঃশর্ত প্রচেষ্টায় আমরা অগ্রসর হব, এই প্রকারের প্রশ্নগুলি জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিনের সঙ্গে আমাদের সখ্যতা আবার স্থাপন করতে গেলে কী প্রকার লেনদেন, অর্থাৎ কী প্রকার give and take এর শর্তাবলী বিবেচ্য হওয়া উচিত। এবং সেই কারণে প্রকাশ্যে এই বিষয়গুলির বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো এখানেও সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে সে আলোচনা চান না। সংসদেও বিরোধীপক্ষ নতশিরে মেনে নেয় যে, ওই ব্যাপারগুলিতে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং উচ্চপক্ষে উভয়পক্ষের দ্বারা গঠিত সংসদীয় কোনও কমিটিতে এইসব বিষয় আলোচিত হয়। জনসাধারণকে এই ব্যাপারে অনবহিত রাখার ব্যাপারে উভয়পক্ষই একমত। সংবাদপত্রগুলিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করেন। কখনও কখনও সংবাদপত্রে ভিন্ন মতাবলম্বী লেখা দেখলে কদাপি মনে করবেন না যে, লেখাটি নিঃসন্দেহে এ্যান্টি-এসটাব্লিশমেন্ট অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ বিরোধী। কর্তৃপক্ষের অভিমতের কিংবা নীতি-বিতর্কের মধ্যে অনেক সময়ই দ্বিমত ত্রিমত দেখা দেয়। দিল্লির স্বরাষ্ট্র কিংবা বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে সম্পর্কিত রিপোর্টাররা কখনও কখনও ওই দ্বিমতাবলম্বী, কিংবা ত্রিমতাবলম্বীদের কানাঘুষা প্রতিবেদন করে থাকেন। কিন্তু মূলত ওই ভিন্ন প্রেক্ষণ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিন্ন যুক্তিবিন্যাস প্রায় সমস্তই (ধরুন, আনুমানিক চৌদ্দ আনাই) জন্ম নিচ্ছে তথাকথিত এসটাব্লিশমেন্টের ভিতর, অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের অন্দর মহলে। না চিনের ব্যাপারে, না পাকিস্তানের ব্যাপারে, কাশ্মীরের ব্যাপারে তো নয়ই — সংবাদপত্র এবং ভারতীয় জনমত লক্ষণীয়ভাবে কখনওই কর্তৃপক্ষবৈরী অর্থাৎ এ্যান্টি-এসটাব্লিশমেন্টপন্থী মতবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। দেশাত্মবোধের ভ্রান্ত আতিশয্য থেকে এই স্বভাব তৈরি হয়েছে। এই অপ্রকৃতিস্থিত স্বভাব গণতন্ত্রের পক্ষে বিষময়। জম্মু এবং কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সঙ্গত, সুবিচারমূলক এবং সবচেয়ে বড় কথা, গণতান্ত্রিক সমাধানের পক্ষেও এই মনোবৃত্তি অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই রূপ নীতির ফলে কাশ্মীরকে ধরে, বেঁধে, পিটিয়ে, শিখিয়ে, এমনকী মানসিক ও সামরিক কাউন্টার ইনসারজেন্সির ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা — ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখা কিছুই অসম্ভব নয়। এতে প্রবল রক্তপাত এবং অর্থপাত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কাশ্মীরকে ১৯৪৮ সালের গাঁটছড়ায় রাখা এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবারণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কে বলছে সম্ভব নয়? কিন্তু নিঃসন্দেহে এতে ভারতের গণতান্ত্রিক আত্মার অপমান বাড়তে থাকবে। আমাদের বংশধরদের জন্য এই আহত আত্মাই কি আমরা উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে যাব? □

কল্যাণরাষ্ট্র : বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সমাজভাবনা

সৌরীন ভট্টাচার্য

ঘটনার ইতিহাসে আমাদের যে আগ্রহ থাকে অনেক সময়ে দেখা যায় চিন্তার আদলে সে ঔৎসুক্য থাকে না। অথচ সমাজ-ইতিহাসের ঘটনাবলির পিছনে চিন্তার আদল তো বড় ভাবে কাজ করে। রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতিতে আমরা যে যা করতে চাই তার পিছনে একটা ছাঁচ আমাদের মাথায় থাকেই। এমন হতেই পারে যে সে-ছাঁচ খুব পরিষ্কারভাবে টের পাবার মতো থাকে না সব সময়ে। কিন্তু সমাজজীবনের আদলটা কেমন হলে ভাল হয় এ বিষয়ে একটা কোনও ধারণা মাথার মধ্যে নিয়েই আমরা সবাই কথা বলি। নিজের কাছেও হয়ত সে জিনিস তত পরিষ্কার থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। তবুও আদলটাকে খুঁজে পেতে চিনে নিতে হয়। ঘটনার সব ইতিহাস ঘটনাতেই কিন্তু নেই। ঘটনা, যা ঘটছে, যা ঘটবার কথা ছিল, অন্তত ঘটবে বলে ভাবা হয়েছিল আর যে-সব ভাবনার আদলে ভর দিয়ে ঘটনার ওইসব গতিপ্রকৃতির কথা আমরা ভেবেছিলাম, এই সব কিছু মিলিয়ে একটা গোটা ইতিহাস, একটাই ইতিহাস। আমরা সবাই তার সব অংশ সব সময়ে সমানভাবে হয়ত আয়ত্ত করে উঠতে পারি না, সে অন্য কথা। কিন্তু আমাদের অধিকার যে সব দিকেই ছড়িয়ে দিতে হবে এটা মেনে নিতে না পারলে রিক্ততার বিপদ দেখা দেবে। এ কাজ কারুর পক্ষে একলা হাতে করার নয়। সেই জন্যেই সবার মিলিত প্রয়াস এত জরুরি। আর তার জন্য চাই পদ্ধতিগত একটা বিশেষ মেজাজ। আজকের বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্বিদ্যা চর্চা বলে যে-পদ্ধতির খুব চল হয়েছে আমি কিন্তু তার কথা বলছি না। ওই পদ্ধতিতে যে-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে তা অনেকটা বহিরঙ্গ। বিভিন্ন বিদ্যাক্ষেত্রের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মিলে কোনও একটা গবেষণা প্রকল্পে কাজ করছেন। তাঁদের পরস্পর সহযোগিতা, নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদানের সুযোগ সুবিধা, ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলতে পারা অবশ্যই খুব জরুরি। এদের এই মিলিত প্রচেষ্টায় যা সাধিত হচ্ছে তা একটাই গবেষণা প্রকল্প, তার হয়ত বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সেই সব বিভিন্ন অঙ্গের দায়িত্বে আছেন। নিশ্চয়ই সব খণ্ড-দায়িত্ব কোনও এক বিন্দুতে মিলে গিয়ে একটা পূর্ণতা পাচ্ছে। আমি যে-পদ্ধতিগত মেজাজের কথা ভাবছি তা কিন্তু একটু আলাদা রকমের। সেখানে কোনও গবেষক হয়ত একলাই তাঁর কাজ করছেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনার ধরনটা এমন হওয়া দরকার যাতে করে তাঁর ভাবনার অভিমুখ বিভিন্ন দিকে খোলা থাকে। সেই খোলা পথে অন্য কোনও গবেষক আজই এসে হাত বাড়াবেন তা নাও হতে পারে, সেই গবেষকের দেখা পেতে হয়ত অনেকটাই সময় লাগতে পারে। কিন্তু সেই গবেষক যেদিন আসবেন তিনি কিন্তু জানবেন তাঁর জন্য কোন দরজা কোথায় খোলা আছে। তাঁর জন্য আজকের সেই একক গবেষককে হয়ত অপেক্ষা করতে হবে, তাঁর দিকে আগ্রহে হাত বাড়াবার জন্য তাঁর পদ্ধতির মধ্যেই যেন আমন্ত্রণ সাজানো থাকে। সেই নবীন গবেষকও তাঁর কর্মে ও ভাবনায় এসে হয়ত এই পদ্ধতিগত যৌথতায় মিলতে চাইবেন। তিনিও তাঁর অভিমুখ খোলা রাখবেন নানা দিকে। আমাদের প্রচলিত বিদ্যায়তনিক অভ্যাসে বিদ্যাক্ষেত্রগুলিকে যেভাবে খোপে খোপে ভাগ করে সাজানো আছে তাতে ওই আন্তর্বিদ্যা পদ্ধতি পর্যন্ত হয়ত যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খোলা অভিমুখের যে-অন্তরঙ্গ যৌথ মেজাজ, সে জিনিস ওই অভ্যাসের মধ্যে হাতে পাওয়া শক্ত। ওই খোপগুলিকে অনায়াসে টপকে যাবার সাহস অর্জন করতে হবে, সে আড়ষ্টতা কাটাতে পারলে আমাদের দৃষ্টির ঘেরাটোপের থেকে হয়ত কিছুটা মুক্তি মিলবে। যে-সব সমস্যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা হদিশ করে উঠতে পারি না, ঘেরাটোপ কেটে বেরতে পারলে অল্প কিছু আন্দাজ হয়ত পেয়ে যাব।

ঘটনা আর তার পিছনের চিন্তার আদলের কথা বলছিলাম ঠিক এই কারণেই। যেমন ধরা যাক, স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তী বছরে আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকের হিসাবনিকাশ করা

হচ্ছে। স্বাভাবিক। আমাদের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব কিছুটা পরিষ্কার থাকলে বুঝব কোথায় আর কী করার ছিল। আমাদের অর্থনীতিতে গত পঞ্চাশ বছরের হিসাবনিকাশও তেমনই একটা জরুরি করণীয় কাজ। কিন্তু শুধু ঘটনার স্তরের অবলোকনে সে হিসাবনিকাশের অনেকটাই মিটবে না। ঘটনার খামতি হয়ত আমরা বারবার চিহ্নিত করে যাব। ঘটনার স্তরে যে-কার্যকারণ সম্পর্কের ছকে বেঁধে ঘটনা সাজানো আছে সেই ছকের বাইরে দেখতে না শিখলে দৃষ্টির বদ্ধতা কাটানো যাবে না। সে অবস্থায় ঘটনার এখানে ওখানে একটু আধটু মেরামত করে কিছু লাভ কখনও আদায় করা যাবে না তা বলছি না। কিন্তু ওভাবে বড় কোনও আদায় হওয়া শক্ত। কারণ যতক্ষণ না অন্তর্নিহিত ছকে হাত দিতে পারছি ততক্ষণ কার্যকারণের পরিধি বাড়াতে পারছি না। এতদিন যেটাকে যে-জিনিসের কারণ বলে ভেবে এসেছি এখনও তাই ভাবছি। সেই কার্য যদি পুরোপুরি মনের মতন না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কারণকে কমবেশি ছোট বা বড় করে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করব। কিন্তু কারণের পরিধিই যদি আরও বিস্তৃত হয়, যেটাকে এ পর্যন্ত কারণ বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, যদি দেখা যায় যে সে কারণের শিকড় আরও অনেকদূর ছড়ানো, তাহলে ওই অভ্যস্ত চিন্তার ছকে তার নাগাল পাব না। তখন চিন্তার ছকটাই কেটে বেরনোর দরকার হতে পারে।

এখানে একটা অন্তত আপাত সঙ্গত প্রশ্ন উঠতেই পারে। একটা চিন্তার ছক যে কেটে বেরব, বিশেষত অভ্যস্ত চিন্তার ছক কেটে যখন বেরোবার কথা উঠবে, তখন বিকল্প ছকের দাবি জানাতে চাইব। অর্থাৎ আমি চেনা গণ্ডি ছেড়ে একেবারে নিরুদ্দেশে ভাসতে চাইব কেন ? বিকল্প চিন্তার ছক, তার গুণাগুণ, এসব বিষয়ে খোঁজ নেবার আগ্রহ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল হল যে ওই বিকল্পের ছক একই সঙ্গে পরিষ্কারভাবে সাজানো না থাকতেই পারে। অভ্যস্ত আদল থেকে বেরবার দরকার হয়ত টের পাচ্ছি, কিন্তু কোথায় কোনদিকে কতদূর যাব সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব হয়ত আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা-সংকটে এ অবস্থা কিছু অপরিচিত নয়। আর যা দৈনন্দিনে পরিচিত তা আমাদের গবেষণা লেখাপড়া ও তত্ত্বচিন্তায় খুব অপরিচিত থাকে যদি, তাহলে তো একটা সংকট তৈরি হতেই পারে। আমাদের গবেষণা লেখাপড়া বিদ্যাচর্চা যদি খুব বেশি পরিচ্ছন্ন আবহাওয়াতে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তাহলে এ ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে। কারণ দুনিয়াটা যদি তেমন পরিচ্ছন্ন না হয়, সেখানে যদি নানা ভাবনা মিলেমিশে থাকে, সেখানে যদি 'ভাল' ও 'মন্দ' অত সহজে ফারাক করা না যায়, নানা জিনিসের বিচিত্র সব মিশেলই যদি সেখানকার দস্তুর হয়, তাহলে আমাদের তত্ত্বছাঁদ, চিন্তার আদল, ভাবনার বয়ান, এসব অত সাজানোগোছানো পরিচ্ছন্ন করে রাখলে চলবে কেন। আমাদের চর্চার জগৎটাকে পটের বিবি সাজিয়ে আর কী লাভ। নোংরা যদি পরিপার্শ্বে থাকেই তবে তার গায়েও সেই নোংরা লাগানো চাই। তত্ত্বচিন্তা, তাতেই সবল ও সাবলীল হবে। অপরিশুদ্ধির ভয়ে ছোঁয়াছানি বাঁচিয়ে অত বাছবিচার করে চললে শাস্ত্র হয়ত রক্ষা পাবে, কিন্তু শরীরে তাকৎ কমে যাবে। তাই খোলা চোখে সংস্কার ঝেড়ে ফেলে এদিক ওদিক সব দিকেই ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে হবে।

এ কথা সকলের জানা যে স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কল্যাণমূলক সমাজ-লক্ষ্যে নিবিষ্ট করে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তোলার চেষ্টায় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কমিশনের অন্তর্গত ছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞ। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু পরিকল্পিত অর্থনীতির বিষয়ে পরমোৎসাহী ছিলেন। পরিকল্পনার ব্যাপারে অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁর পরিসংখ্যান চর্চা ও রাশিবিজ্ঞানের অধ্যবসায় সবটুকু তিনি তখন ভারতীয় অর্থনীতির সেবায় নিয়োজিত করতে উন্মুখ ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরাইয়া তখনও জীবিত ও কর্মক্ষম। পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যাপারে তাঁরও যথেষ্ট উদ্যম ছিল। কাবেরী বাঁধ পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই প্রযুক্তিবিদ্ জলপরিকল্পনার বিষয়ে এক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। ১৯৫০-এ পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও ১৯৫১-এ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত থেকে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী একদল মেধাবী তরুণও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে রীতিমতো উৎসাহী হয়ে ওঠে। নতুন প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে এরকম এক বৃহৎ জাতীয় কর্মযজ্ঞে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারা খুবই বড় ব্যাপার। এমনকী বস্তুগত উপকরণ হিসাবেও এ জিনিসের গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের মুহূর্তের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলেই উৎসাহ-উদ্দীপনার এই ফারাক প্রকট হয়ে চোখে পড়বে। আজ আমাদের তরুণ-প্রবীণ নির্বিশেষে কেউই আর তেমন করে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী নেই। নামে পরিকল্পনা এখনও চালু আছে বটে কিন্তু সবাই জানেন আজ আর অর্থনীতির রাশ ঠিক পরিকল্পনার হাতে ধরা নেই। ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোয় পরিকল্পনা আজ ধারণাগতভাবেই দুয়োরানীর অবহেলায় নির্বাসিত। তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপরেখা আজ আর কিছু নেই, গরজও তেমন কিছু নেই। পরিকল্পনার গয়ংগচ্ছ ভাব আজ আর কারও মনেই তেমন কোনও সম্ভ্রম জাগায় না। অথচ পঞ্চাশের দশকে এ-বোধ ছিল স্বতঃসিদ্ধ — পরিকল্পিত অর্থনীতিই তো অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র অমোঘ বাহন। বিশেষত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের হাতে এর চেয়ে উপযুক্ত কৌশল আর কী হবে। তখনকার যুক্তিন্যায়ে আমরা এরকম এক সরল শৃঙ্খলায় খুব অভ্যস্ত ছিলাম। সমাজের মঙ্গলের বিচারে যে

যে উৎপাদন যে যে পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়, পরিকল্পনা কমিশন তার বিবিধ ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ দক্ষতায় সেগুলিকে ঠিক মতো সনাক্ত করে লক্ষ্যমাত্রা করে দেবে। লক্ষ্যমাত্রা একবার ধার্য হয়ে গেলে বাকি কাজ তো সম্পাদনের। তখন যদি কোনও অপূর্ণতা দেখা দেয়ও সে হবে সম্পাদনের বিচ্যুতি। সুসময়ের অপেক্ষায় থেকে সেসব ত্রুটি শুধরে নিয়ে সম্পাদনকে সুঠাম করে তুলতে বাধা কোথায়। ফলে ওই যে বাজারের বেলাগাম আধিপত্য, তাকেও এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বাগে আনা যাবে। রাষ্ট্র এখানে পরম সহায় হতে পারে।

তত্ত্ব-আবহাওয়ার দিক থেকেও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে দুয়ো দেবার দিন তখনও দেখা দেয়নি। তাত্ত্বিক অর্থনীতিতে কেইন্‌সীয় প্রভাব তখনও রীতিমতো লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার তখনও অবসান হয়নি। শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিমণ্ডলেই যে রাষ্ট্রের বড় ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয়েছিল তাও নয়। এমনকী জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বেসরকারি পুঁজিনির্ভর অর্থনীতিও একটা পর্বে রাষ্ট্রের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ছিল। ফলে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার উপযুক্ত মনোভঙ্গির প্রশ্রয় পেতে আমাদের এখানে পঞ্চাশের দশকে কোনও বেগ পেতে হয়নি। তা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতালাভের সমস্ত পর্ব ও পর্বান্তরের কথা মাথায় রাখলে বেসরকারি পুঁজিকে তখনই রাতারাতি দাবিয়ে রাখার চেষ্টা বাস্তবসম্মত হত এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। কাজেই বেসরকারি পুঁজির প্রতি বেশি খড়্গহস্ত হবার প্রত্যাশা তখন কোনওমতেই স্বাভাবিক ছিল না। আবার এক ধরনের ভাসাভাসা সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ ও তার উপযুক্ত বাক্যবন্ধ এটাও কিন্তু আমাদের স্বাধীন উন্নয়নচিন্তার প্রথম পর্বে যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিল। এই চিন্তার লাগোয়াভাবেই এসেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের আদল। সমাজতন্ত্রের জন্য ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসারই মনে হয়েছিল প্রশস্ত পথ। বিজ্ঞাননির্ভর আধুনিক প্রযুক্তির আদলটাও এসেছিল এই পথে।

সত্যি কথা বলতে কী এর কোনও চিন্তাই যে স্বাধীনতার পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করার সময়েই হঠাৎ আমাদের পেয়ে বসল তা কিন্তু নয়। এই মূল আদলটা স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৮-এই যখন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে তখন থেকেই মোটামুটি এরকম এক ভাবনার আদল আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মাথায় ছিল। সবটাই আগাগোড়া খুব মসৃণ ছিল তা মনে করার কোনও কারণ নেই। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই একটু দক্ষিণপন্থী ও একটু বামপন্থী ঝোঁকের তফাৎ তখনও টের পাওয়া যেত। এই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য নির্বাচনের মধ্যেও সে সব ঝোঁক মোটামুটি প্রতিফলিত ছিল। সদস্যদের নামের তালিকা দেখলেই তা আন্দাজ পাওয়া যাবে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর সামান্য সময়ের জন্য সভাপতিত্বের কালেই তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করে ১৯৩৮-এর ১৬ অক্টোবর তা ঘোষণা করেন। এই সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, মেঘনাদ সাহা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, অম্বালাল সরাভাই, কে. টি. সাহা, নাজির আহমদ, এ. ডি. শ্রফ, এ. কে. সাহা ও ডি. এস. দুবে। মেঘনাদ সাহা তো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়েও দেশের রাজনীতিতে বেশ সক্রিয় ছিলেন। বস্তুত তাই নিয়ে তাঁর বিজ্ঞান-অনুরাগীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাপা অনুযোগও ছিল। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতির মধ্যে জড়াতে গিয়ে তিনি নাকি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষতি করেছেন। কোন কাজে কার কী ক্ষতি হয়, কী লাভ হয় সে কি অত যান্ত্রিকভাবে অত সহজে বলা যায়। মেঘনাদ সাহা নিজে অন্তত কাজকর্মের অত ভাগ বাঁটোয়ারা মানতেন বলে মনে হয় না। আর ওঁদের প্রজন্মের প্রস্তুতিপর্বের কথা মনে রাখলে অত ভাগাভাগি স্বাভাবিক মনে না হবারই কথা। ওঁদের কাছে বিজ্ঞানচর্চা তো দেশেরই কাজ ছিল, শুধুমাত্র বিদ্যায়তনিক গবেষণার মেজাজ তো ওঁদের নয়। আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র-শিষ্যদের পক্ষে কি সেটাই স্বাভাবিক নয় ? প্রফুল্লচন্দ্রের বন্যাত্রাণ সংগঠন ইত্যাদির সংস্পর্শে থেকেই তো তরুণ মেঘনাদেরও উদ্‌বোধন হয়েছিল। যদিও এ ব্যাপারে কিছু কূটাভাসও হয়ত আমাদের লক্ষ করা উচিত। প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশি শিল্পের চিন্তা আর মেঘনাদ সাহার আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পোন্নয়নের চিন্তা একই ঘরানার চিন্তা কিনা তা খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে যে-চিন্তার আদলের কথা বলে শুরু করেছিলাম সে-আদলের ভাবনায় এ রকম আরও কিছু কিছু কূটাভাসের সন্ধান আমরা পাব। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তো স্বীকৃতভাবে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একজন প্রধান স্থপতি। আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতির যে ছাঁদ তার মধ্যে ভারি শিল্পের উপর জোর দেবার চিন্তাধারার অন্যতম পথিকৃৎ প্রশান্তচন্দ্র। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পিছনে যে তাত্ত্বিক প্রকল্প তা মহলানবিশ প্রকল্প নামেই খ্যাত। আমাদের আধুনিক শিল্পোন্নয়নের ধরনটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়। এই ধাঁচের শিল্পোন্নয়নের সহযোগী আদল হল বৃহৎ নদী পরিকল্পনা এবং সংলগ্ন বহুমুখী অন্য নানা ক্রিয়াকলাপ। পরিকল্পনার প্রথম দিকে এই আদলেরই জয় জয়কার। নেহরু তখন কথায় কথায় এই ধাঁচটাকেই ভারতের মুক্তির পথ বলে তুলে ধরছেন এবং চারিদিকে আলাপ আলোচনা শিক্ষাদীক্ষা বক্তৃতা সেমিনারে এ ব্যাপারে প্রায় যেন একটা ঐকমত্য তৈরি হয়ে উঠছিল। নেহরুর বাচনে এই সব বড় বড় নদী-পরিকল্পনা ও শিল্পকর্মই আধুনিক ভারতের মন্দির। এই মন্দিরের অনুষঙ্গটা যে আলোকিত আধুনিকতার ওই উজ্জ্বল প্রহরেও ব্যবহার করতে

হয়েছিল সে-কথা বোধ হয় খেয়াল রাখা সঙ্গত। নেহরু কি তাঁর অবচেতনে এটা টের পেয়েছিলেন যে ভারত বোধ হয় মন্দির বোঝে, তাই নতুন শিল্প চেনাতে গেলে মন্দিরের ভাষাতেই তাকে তা চেনাতে হবে। একেবারে আচমকা কোনও কিছু আমরা ঠিক চিনে উঠতে পারি না। চেনা অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনও এক রকমের সমীকরণ তাই এত জরুরি। নেহরুর 'মন্দির' কি সেই অবচেতন সমীকরণ? প্রশান্তচন্দ্রও তো বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক এই আধুনিক উন্নয়নের শরিক। তাঁর জবানিতে কী পাওয়া যায় তা একটু পরে আমরা দেখব। আপাতত কূটাভাসের কথাটা তুলে রাখি। এই প্রশান্তচন্দ্র তো রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ সহযোগী, তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর কর্মকাণ্ডের নানা ব্যাপারে প্রশান্তচন্দ্রের বোধবুদ্ধি ও সুপরামর্শের উপর নির্ভর করতেন বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার যে-আদল তার মর্মকথা প্রশান্তচন্দ্রের সুপরিচিত হবারই কথা। প্রশান্তচন্দ্র কি সেই ভাবনার শরিক হতে পেরেছিলেন কখনও? চিন্তার ঘরানায় যেন দুস্তর ফারাক বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের উন্নয়নচিন্তা আর প্রশান্তচন্দ্রের উন্নয়নচিন্তার ধাঁচধোঁচ নিয়েও আমাদের খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার।

স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা চিন্তার কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কথা বলেছি। স্বাধীনতার আগে পরিকল্পনা চিন্তার কিন্তু আরও নজির ছিল। এর মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য শিল্পপতিদের প্রণীত পরিকল্পনার খসড়া। A Brief Memorandum Outlining A Place of Economic Development for India—এই নামে শিল্পপতিদের খসড়া প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে। খসড়াটি তখন যথেষ্ট নজর কেড়েছিল। ১৯৪৪-এর আগস্ট-এর মধ্যেই খসড়াটির ছবার পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। এই খসড়ার প্রণেতাদের মধ্যে ছিলেন স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জে. আর. ডি. টাটা, জি. ডি. বিড়লা, স্যার আরদেশির দালাল, স্যার শ্রীরাম, কস্তুরভাই লালভাই, এ. ডি. শ্রফ্ ও জন মাথাই। এর মধ্যে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও এ. ডি. শ্রফ্ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনার প্রয়োজন শুধুমাত্র কংগ্রেসের রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত আদর্শেই ধরা পড়েছিল তা নয়, তখনকার দিনের এই অগ্রগণ্য শিল্পপতিরাও এই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এই দুই পরিকল্পনা চিন্তার সাযুজ্যও লক্ষ করার মতো। ঝোঁক হিসাবে কংগ্রেসের পরিকল্পনা আর শিল্পপতিদের পরিকল্পনাকে বাম-দক্ষিণ যেরকমভাবেই আমরা চিহ্নিত করি না কেন, চিন্তার আদলের কিছু অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য আমাদের লক্ষ করতেই হবে। শিল্পপতিরা তাঁদের ভূমিকাতে বলে নিয়েছেন যে ভারতে পরিকল্পনার ধারণার প্রবর্তনে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির ভূমিকা অগ্রপথিকের এবং তাঁদের পরিকল্পনার ব্যাপ্তিও অনেক বেশি। এর পরে এই ১৯৪৪-এর খসড়াতে শিল্পপতিরা সংক্ষিপ্ত আকারে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি আপাতত নজর দিতে চাই ভারি শিল্প সংক্রান্ত অংশে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি কিংবা স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অনুসৃত আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি, এই সব স্তরেই ভারি শিল্প ও সংলগ্ন কিছু চিন্তায় আমরা রীতিমতো এক সহমত লক্ষ করতে পারি। শিল্পপতিদের খসড়ায় পাই:

> "It is an impotant part of our proposals regarding industrial development that in the initial stages attention should be directed primarily to the creation of industries for the production of power and capital goods. Nothing has more seriously hindered the development of India's industrial proposal (sic), however, is subject to this important qualification that provision should be made at the same time for the manufacture within the country of the most essential classes of consumption goods, as otherwise a great deal of unnecessarry hardship may be caused during the planning period. We suggest that, in the production of these essential consumption goods, the fullest possible use should be made of small scale and cottage industries. This will, besides providing employment, reduce the need for purchasing expensive plant and machinery." [মেমোরাণ্ডাম, পৃ. ৪]

শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রধান প্রয়োজন শক্তি ও মূলধনী দ্রব্যের। এ কথায় কারই বা আপত্তি হবে। কিন্তু শিল্পপতিদের চিন্তায় অন্তর্বর্তীকালীন সমস্যার কথাও জরুরি। এটা তো ঠিক যে বিদ্যুৎ বা অন্যান্য শক্তি উৎসের শিল্প কিংবা মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের উপযুক্ত শিল্প গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন প্রয়োজন। নইলে সংকট প্রায় অনিবার্য। কারণ নতুন নতুন ভারি শিল্পের উৎপাদনপর্যায় সমাপ্ত হতে যে সময় লাগবে, বাজারের নতুন চাহিদা কিন্তু তার আগেই টের পাওয়া যাবে, অন্তত সেটাই স্বাভাবিক। বিনিয়োগ যখনই করা হচ্ছে, তখনই অর্থনীতিতে নতুন আয়সঞ্চার হচ্ছে। যে-সব দেশ নতুন উন্নয়ন-প্রক্রিয়া শুরু করছে তাদের ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্য নতুন আয়ের একটা বড় অংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির কারণ হবে। এই চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণ কম এবং উৎপাদনের জন্য অপেক্ষার সময়ও অত দীর্ঘ নয়। অতএব মূলধনী শিল্পের পরিপূরক হিসেবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কথা ভাবতে হয়। তা ছাড়া এই সব শিল্প তুলনায় বেশি শ্রমনিবিড় হবার সম্ভাবনা।

তাই এখান থেকে কর্মসংস্থানও হতে পারবে। আমাদের মতো বিপুল জনসংখ্যা ও ব্যাপক বেকারির দেশে সেটা কিছু কম কথা নয়। তা ছাড়াও এই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানির দরকার হয়ত তেমন হবে না। শিল্পোন্নয়ন চিন্তার এই এক ধাঁচ।

মূলত কিন্তু এই ধাঁচটাই আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অনুসৃত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতারা শিল্পপতিদের খশড়া থেকে এটা গ্রহণ করেছিলেন তা নাও হতে পারে। তার তেমন দরকারও ছিল না। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ১৯৩৮-এ সূচনা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার কাজ শেষ করতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। বিষয়ানুসারে নানা উপসমিতিতে ভাগ হয়ে এই কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য বিভিন্ন খশড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল। তার জন্য তথ্য সংগ্রহ, আলাপআলোচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকটা সময় লেগেছিল ও তা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সেসব আংশিক প্রতিবেদনও তো এখন প্রকাশিত দলিল। ফলে পরিকল্পনা-চিন্তার ইতিহাস গড়ে তোলার কাজ এখন হয়ত কিছুটা সম্ভব। আপাতত আমাদের লক্ষ্য অবশ্য তা নয়। পরিকল্পনা চিন্তার বিভিন্ন পর্ব থেকে দু-একটা ধারণা তুলে নিয়ে আমরা একটু মিলিয়ে মিশিয়ে বিচার করে দেখতে চাই। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা পড়ে স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৯-এ। মাঝখানে যুদ্ধের জন্য এসব কাজ অনেকদিনের মতো আটকে গিয়েছিল। তাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেতে দেরি। আমাদের স্বাধীনতার পরবর্তীকালের পরিকল্পনা-চিন্তার সঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চিন্তা মিলিয়ে পড়লে ধারাবাহিকতা লক্ষ করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাই বলছিলাম যে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রণেতাদের পক্ষে শিল্পপতিদের প্রস্তাব বা চিন্তা ওরকম সরাসরি গ্রহণ করার তেমন কোনও দরকার নেই। আমাদের যুক্তির জন্যও গ্রহণ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সেটা তেমন বড় কথা নয়। চিন্তার সাযুজ্যই আমাদের লক্ষণীয়।

১৯৫৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি বক্তৃতা প্রচারিত হয়। সেই বক্তৃতার ভিত্তি ছিল ওই বছরের ১৭ মার্চ তারিখের খশড়া পরিকল্পনা কাঠামো। সেই পরিকল্পনা কাঠামোতে যে-সব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলিকে একটু সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল ওই বক্তৃতার লক্ষ্য। ওই বক্তৃতার ভিত্তিতে প্রশান্তচন্দ্র 'প্ল্যানিং-এর মূলসূত্র' নামে একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন। পুস্তিকাকারে সেই প্রবন্ধের প্রকাশক ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা। পরিকল্পনার যে-মূল কৌশলের কথা আমরা শিল্পপতিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পেলাম সেই মূল কৌশলের প্রসঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের রচনাতেও আমরা অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাব। প্রশান্তচন্দ্র লিখছেন: "দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে ছোট-আকারের শিল্পের স্থান যে বজায় থাকবে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার—শিল্প দু'ধরনের। এক ধরনের শিল্পে উৎপাদনকে হতে হবে কেন্দ্রীভূত। যেমন, ইস্পাত, সিমেন্ট, জমির সার, পেনিসিলিন, রেল-ইঞ্জিন, ভারী যন্ত্রপাতি—এসব তৈরি করতে হবে বড়ো বড়ো কারখানায় এবং সেজন্যে দরকার বিপুল পুঁজি। এ ধরনের শিল্পে সরাসরি যতো লোককে কাজে লাগানো যাবে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর এবং এ ধরনের শিল্পে আমরা সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তনই পছন্দ করব। যতো বেশি সম্ভব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ব্যাপারেও আমাদের উৎসাহী হতে হবে, যার একটা সুফল হবে এই যে উঁচুদরের দক্ষ টেকনিশিয়ানের (যন্ত্রকুশলীর বা যন্ত্রবিশারদের) প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে।" (অনুচ্ছেদ ৩১)

বড় আয়তনের ভারি শিল্পের ঝোঁকটা বোঝা যাচ্ছে। তবে ওই ধরনের শিল্পবিকাশের সমস্যা বিষয়ে যে তিনি অবহিত নন তা ঠিক না। তাঁর কথায়,

> "মূল শিল্পগুলিতে যতো লোক কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করতে হয়। ইস্পাত কারখানার ক্ষেত্রে এই পুঁজির পরিমাণ লাখ টাকার মতো হতে পারে; অন্যান্য ভারী শিল্পে বিশ-পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি। ব্যবহার্য দ্রব্যের কারখানাগুলিতে মোটামুটি আরও কিছুটা কম পুঁজির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা হলেও এক-একজন নতুন লোককে নিয়োগ করবার জন্যে সচরাচর দশ-বারো হাজার টাকার মতো পুঁজি দরকার হয়ে পড়ে। পুঁজির সঙ্গতি আমাদের যৎসামান্য; কাজেই সেদিক থেকে কারখানা-শিল্পের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি লোকের কাজের সংস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। ভারী শিল্পের পত্তন হলে ভবিষ্যতে যে আরও আনুষঙ্গিক শিল্পের পত্তন হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে দশ-পনেরো বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় লাগবে। কারখানায় ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপন্ন করতে গেলেও অর্থনৈতিক তৎপরতা বাড়বে কিন্তু তাও অল্প সময়ের কাজ নয়।" (অনুচ্ছেদ ২৪)

একদিকে শিল্পবিকাশের শক্ত ভিত তৈরি করবার জন্য ভারি শিল্প আর অন্যদিকে চাহিদা মেটানোর আশু প্রয়োজন ও কর্মসংস্থানের দিকে তাকিয়ে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প গড়ে তোলা, এই দুদিকের নজরটাকেই এক ধরনের সমতারক্ষার চেষ্টা বলে ভাবা হয়েছিল। এই মৌলিক কৌশলের পরিচয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি, শিল্পপতিদের রচিত পরিকল্পনা ও পরবর্তীকালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সবার মধ্যেই মোটামুটি ছিল। ঝোঁকের তফাত একটু আধটু থাকতেই পারে, তবে মূল ধাঁচটা একই রকম। এই প্রসঙ্গে যে-কথা লক্ষ করতে চাই তা এই যে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ভাবনা সবার চিন্তাতেই নিশ্চয় ছিল,

কিন্তু শিল্পবিকাশের জন্য সেটাকে মূল স্তম্ভ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিনও। ভারতের শিল্প-অর্থনীতির জন্য যে-চেহারাটা মূলত ভাবা হয়েছিল সেখানে যন্ত্রনির্ভর বড় আকারের ভারি শিল্পই হবে প্রধান। সেটাই হবে ভারতীয় শিল্পের আধুনিকতার পরিচয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্য একটা পরিপূরক ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই এ কথা ভাবা হয়নি যে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অবস্থা যা দাঁড়াবে তারই উপর ভারতের শিল্প-অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। ভারতের শিল্প বিকাশের রূপরেখা অবশ্যই নির্ধারিত হবে ওই আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর ভারি শিল্প অংশের গতিপ্রকৃতি দিয়ে। ভারতে পরিকল্পনাচিন্তার বিবর্তনে গান্ধী-চিন্তা প্রণোদিত শ্রীমান নারায়ণেরও একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব ছিল। কিন্তু চিন্তার মূলস্রোতে সেসব প্রস্তাবের খুব জায়গা হয়নি। 'পিপল্‌স্ প্ল্যান' নামে পরিচিত মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও এক প্রস্তাব ছিল। যাই হোক আমরা আপাতত প্রধান চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করছি।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প বিকাশের আলোচনায় মেঘনাদ সাহার চিন্তার ধরন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি যে শুধু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির একজন সদস্য ছিলেন তাই নয়, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির চিন্তাভাবনা সম্ভবত মেঘনাদ সাহা ও বিশ্বেশ্বরাইয়া এই দুজনের চিন্তায় খুব সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল। মেঘনাদ সাহা নিজে ছিলেন বড় বিজ্ঞানী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর দেশ-ভাবনা ও স্বদেশমনস্কতা। প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চারও তিনি শরিক ছিলেন। সব মিলিয়ে দেশ গঠন ও দেশের পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের চিন্তায় বিজ্ঞানের প্রয়োগভাবনা মেঘনাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশিত। মেঘনাদ সাহা মনে করতেন যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগে গড়ে তুলতে পারাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই শিল্পই হবে আমাদের শিল্প-অর্থনীতির মূল কাঠামো। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রতিতুলনায় যিনি ভারতের অবশিল্পায়নের কথা ভেবেছেন। ইংল্যান্ডে যখন শিল্পবিকাশের তালে তালে কৃষিনির্ভর মানুষরা সরে এসেছেন নগরে শহরে, ভারতে ইংরেজ শাসনের অধীনস্থ অর্থনৈতিক বিকাশের ধারায় তার ঠিক বিপরীত ফল দেখা গেছে। এই প্রক্রিয়ায় মেঘনাদের ভাষায় আমাদের "বেশীর ভাগ শিল্পজীবী—জোলা, তাঁতি, কামার, কুমোর, ঠাটারী ইত্যাদিরা বেকার হইয়া পড়িল। ফলে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া কৃষি অবলম্বন করিল। তাহার পর যখা রেল, জাহাজ, স্টীমার ইত্যাদি আসিয়া পড়িল, তখন যাহারা এদিক-ওদিক মাল পাচাইবার কার্য করিত, তাহাদেরও কাজ ছাড়িয়া জমির উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে হইল।" ['জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান,' ১৯৪৫ ; **মেঘনাদ রচনা সংকলন**-এর পাঠ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৭।]

'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধেই মেঘনাদ সাহা দেশের শিল্পোন্নয়ন বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে সেই মনোভঙ্গিতে দু-একটা জিনিস লক্ষ করবার আছে। শিল্পোন্নয়নচিন্তায় মেঘনাদ সাহার প্রথম জোর পড়ছে শক্তি উৎপাদনের উপরে। খুবই স্বাভাবিক। আধুনিক শিল্পায়নে শক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে আমরা সোভিয়েত শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্বের অনুরূপ পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারি। সেখানেও লেনিন জোর দিয়েছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ বিদ্যুতায়নের উপর। সোভিয়েত ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠা ও সার্বিক বিদ্যুতায়ন দেশকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকদূর এগিয়ে দেবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শিল্পোৎপাদনে অনেকটা এগিয়েও অন্য কোথাও তো গোলমাল দেখা দিল। কাজেই শিল্পোৎপাদনের সমস্যাকে আরও জটিল মাত্রায় হয়ত দেখার দরকার আছে। আমাদের দেশের প্রয়োজনের কথা বলতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা কিছু হিসাবপত্রও উপস্থিত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলছেন যে এক টন আলুমিনিয়াম তৈরি করতে লাগে ২৫,০০০ ইউনিট আর এক টন কৃত্রিম রবার তৈরিতে লাগে ৪০,০০০ ইউনিট শক্তি। এই সব হিসাবের যাথার্থ্য বিচার আপাতত আমাদের কাজ নয়। আমি লক্ষ করতে চাই যে এই হারে বিপুল শক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা শক্তি উৎপাদনের সাংগঠনিক দিকেও নজর দিয়েছেন। শক্তি উৎপাদনের দায়িত্ব সরকারি হাতে থাকবে না বেসরকারি হাতে যাবে? ব্রিটেন, আমেরিকার নজির মাথায় রেখেও মেঘনাদ সাহার বক্তব্য : "ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে এই শক্তি উৎপাদন শিল্প এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই, তথায় ব্যবস্থা এবং পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে উপযুক্ত নিয়মাদীনে বন্টন-ব্যবস্থা ভারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের হাতে আংশিক ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" (পৃ. ৩৩) মেঘনাদ সাহার এই চিন্তা প্রায় পরিহাসের মতো আজ ফিরে আসছে। আজ ভারতীয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে আমাদের বিদ্যুৎশিল্প সরকারি তত্ত্বাবধান থেকে কার্যত সরে যেতে বসেছে। শুধু আংশিক বন্টন নয়, উৎপাদনও। আজ বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবোচনায় ও আরোপিত শর্তের রকমফেরে আমাদের বিদ্যুৎশিল্প এক বড় মাপের সাংগঠনিক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে। রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে পুনর্গঠিত করে এক নতুন বিন্যাসে সাজানো হচ্ছে। সব রাজ্যে যে সব কিছুই আগাগোড়া এক হবে তা নয়, রাজ্যে রাজ্যে নিশ্চয়ই ফারাক থাকবে, তবে নতুন কাঠামোর মধ্যে বেসরকারি পুঁজি যে অনেকখানি জায়গা করে নেবে তা বলাই চলে। আর সেই পুঁজির সবটুকু আমাদের দেশি পুঁজিও হবে না। কিন্তু আজকের

বিশ্বায়নের পর্বে দেশ-বিদেশ নিয়ে কে আর তেমন মাথা ঘামায়। সমাজ-সংস্কৃতির বিন্যাস ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কত মারপ্যাঁচে যে এই সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার কিনারা নিশ্চয়ই আমরা মেঘনাদ সাহার কাছে প্রত্যাশা করব না। কিন্তু এক কথা লক্ষ করতে চাই যে তাঁর চিন্তার যে-ধরন তার মধ্যে এই অভিমুখটা নেই, যেটা থাকলে পরবর্তীকালের দুনিয়ার হালচালের হিসাব নিয়ে আমরা নিজেরাই সে-কাঠামো পূরণ করে নিতে পারতাম। শিল্পচিন্তায় মেঘনাদ ক্ষমতা ও তার দক্ষতা-কুশলতায় এঁরা বেশি মগ্ন, লাগোয়া সমাজ-সংস্থানের নানা পরিবর্তন ও মোচড়ের দিকে এঁদের ভাবনা তেমন নাস্ত নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন চিন্তায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বা জওহরলাল নেহরুর যে-ধরন সেখানেও এ কথা মোটের উপর প্রযোজ্য। উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ ও তাদের মধ্যেকার কারগরি সম্পর্ক, এসব তো গেল একটা দিক, বলা যাক বাইরের আঙ্গিকের দিক। কিন্তু উৎপাদনের গতিপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে গোটা উন্নয়নপ্রক্রিয়ার সামাজিক চেহারা কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করে প্রধানত এই নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়াচ-লাগা সমাজ-সম্পর্কের ধরনধারণের উপর। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কে লাভবান হবে আর কে হবে না তার খবর সবটুকু উৎপাদনের কলাকৌশলগত দক্ষতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শক্তি উৎপাদনের পরে কৃষিজীবী ভারতের ক্ষেত্রে সারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে মেঘনাদ সাহা শক্তি উৎপাদনের সাংগঠনিক দিকেও নজর দিয়েছেন। শক্তি উৎপাদনের দায়িত্ব সরকারি হাতে থাকবে না বেসরকারি হাতে যাবে? ব্রিটেন, আমেরিকার নজির মাথায় রেখেও মেঘনাদ সাহার বক্তব্য : "ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে এই শক্তি উৎপাদন শিল্প এখনও বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই, তথায় ব্যবস্থা এবং পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে উপযুক্ত নিয়মাদীনে বন্টন-ব্যবস্থা ভারপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের হাতে আংশিক ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" (পৃ. ৩৩) মেঘনাদ সাহার এই চিন্তা প্রায় পরিহাসের মতো আজ ফিরে আসছে। আজ ভারতীয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে আমাদের বিদ্যুৎশিল্প সরকারি তত্ত্বাবধান থেকে কার্যত সরে যেতে বসেছে। শুধু আংশিক বন্টন নয়, উৎপাদনও। আজ বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রবোচনায় ও আরোপিত শর্তের রকমফেরে আমাদের বিদ্যুৎশিল্প এক বড় মাপের সাংগঠনিক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে। রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিকে পুনর্গঠিত করে এক নতুন বিন্যাসে সাজানো হচ্ছে। সব রাজ্যে যে সব কিছুই আগাগোড়া এক হবে তা নয়, রাজ্যে রাজ্যে নিশ্চয়ই ফারাক থাকবে, তবে নতুন কাঠামোর মধ্যে বেসরকারি পুঁজি যে অনেকখানি জায়গা করে নেবে তা বলাই চলে। আর সেই পুঁজির সবটুকু আমাদের দেশি পুঁজিও হবে না। কিন্তু আজকের ভাষায় "অর্থকরী শস্য—যথা, কার্পাস, পাট, আখ, তৈলবীজ, তামাক ইত্যাদিরও চাষ করিতে হইবে, তবে সেগুলি দেশি শিল্পজ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে অর্থাগম হইবে না।" এই বক্তব্যের পিছনে যে-দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে তা বুঝতে পারা কিছু শক্ত নয়। বাণিজ্যিক ফসল, অর্থাগম, পুঁজির বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি, বাজার-নির্ভর কৃষির বিকাশ, এ তো চিন্তার একটা পরিচিত ছাঁদ। সমাজভাবনার খামতি এখানে যে এই বৃত্তে পড়ে গিয়ে কৃষি ও কৃষিসংলগ্ন অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট মানুষজনের জীবনে যে দুর্বিপাক দেখা দিতে পারে সে-বিষয়ে আমরা যেন অনেক সময়েই কিছুটা অন্যমনস্ক থাকি। অথচ দেশে দেশে এমন অনেক নজির আছে যে বাণিজ্যিক চাষের উপর জোর দিতে গিয়ে অর্থনীতি আশেরে নানা অর্থে কীভাবে রিক্ততায় পর্যবসিত হয়। বাণিজ্যিক পুঁজি যখন বাণিজ্যিক চাষের হাত ধরে কৃষিতে প্রবেশ করে, তখন বাজার ও মুনাফার নিয়মকানুনই মূলত কৃষির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে। এই পথে বিদেশি শোষণকারী পুঁজির প্রবেশের পথও সুগম হয়। তখন কৃষি আমার খাওয়া-পরার প্রয়োজন মেটাবার বদলে নজর দিতে বাধ্য হয় পুঁজির মুনাফার ও তার প্রসারে। আস্তে আস্তে শিল্পোন্নত দেশের বাজারের ও উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের সরবরাহকারীর ভূমিকায় নেমে আসা প্রায় অনিবার্য ভবিতব্য। ঔপনিবেশিক শাসন ও আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ধরণধারণ খেয়াল করলে এ-বিপদ সম্বন্ধে অবহিত থাকতেই হয়। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু নজর করে দেখতে পারলে দেখা যাবে যে আফ্রিকা মহাদেশের দেশে দেশে এই বাণিজ্যিক চাষের অভিজ্ঞতায় মরুপ্রসার পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে। এ কথা ঠিক যে ভাবনার এই প্রেক্ষিতে হয়ত মেঘনাদ সাহা-মহলানবিশদের সময়ে তেমনভাবে কথাবার্তার মধ্যে ঢুকে পড়েনি। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নচিন্তায় সমাজমনস্কতা থেকে বেশি দূরে থাকলে এরকম অনেক বিপদের দিকে নজর যায় না।

আমাদের তত্ত্বভাবনায় অপরিচ্ছন্নতাকে মেনে নেবার যে-কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম এইখানে তার প্রাসঙ্গিকতা। সুঠাম প্রযুক্তি উপকরণ ও উৎপাদনের মধ্যে নিতান্ত পরিচ্ছন্ন এক সম্পর্কের কথাই ভাবে। কিন্তু এসব প্রযুক্তি তো সামাজসম্পর্কের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়। তাই অপরিচ্ছন্ন হিসাব-বহির্ভূত নানা ফেরে পড়ে যেতে হয়। সবুজ বিপ্লবের চাষে যে ছোট জমির মালিক তার জমি ধরে রাখতে পারে না, নিজের জমিতেই যে শেষ পর্যন্ত তাকে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক হিসাবে খাটতে হয়, এসব সেই নানা ফেরের চক্রান্ত। আমাদের উন্নয়নচিন্তায় এসব ঘেঁটেঘুঁটেই ভাবনাকে দাঁড় করাতে হবে। শুধুমাত্র সরল বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমনস্কতায় খুব বেশিদূর যাওয়া যাবে কি? বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ভাবনা ভাবতে হবে সামাজসম্পর্কের গলিঘুঁজির কথা মাথায় নিয়েই। □

জীবন ও জীবনান্ত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অমল ও অকপট শিশু খেলে
নিস্তব্ধ পুতুল নিয়ে, সে কি ভাবে
খেলনা তার প্রাণহীন,
চেতনা-বলয়ে শূন্য, শুধু মোহ
বিহ্বল মধুর স্বপ্ন কল্পনায়
গড়ে দেয় প্রাণময় নিপাট সম্পদ;
তাই নিয়ে শৈশব আবির মাখে, খেলা করে।

শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে বার্ধক্যের নির্মোহ আশ্রয়ে
আমরা কি জীবনের দীর্ঘ পথ
স্মৃতির ক্ষয়িষ্ণু রঙে দেখি না কখনও?

মনে হয়—এই তো অরণ্য, বীথি,
সুরভিত পুষ্পিত উদ্যান, কাঁটা ঝোপ,
রূঢ়তা দীনতা

জীবনকে সমুদ্র বলে মনে হয়;
বুঝি রত্নাকর, কত প্রীতি, রত্ন ভালবাসা
কত স্মৃতি আনন্দ বেদনা সেখানে রয়েছে।
ওপরে বাতাসে বাজে জলের কল্লোল,
কখনও-বা উত্তাল উন্মত্ত ঢেউ,
আশা ও নৈরাশ্যের তুমুল তোলপাড়;
অথচ গভীর অতলে তার
সীমাহীন স্থৈর্যের ইসারা,
স্থবির প্রশান্তি।

হয়ত-বা জীবনের শেষাঙ্কে পৌঁছলে
জীবনকে মনে হয় আঁকাবাঁকা অনির্দিষ্ট পথ
ঘেরা জমি, বালিয়াড়ি;
কখনও-বা বৃষ্টিভেজা উষর শ্যামল,
কখনও তা প্রশস্ত বা কাঁটা-তারে ঘেরা।

জীবনের উত্তরণে কবি তাই বলেছেন
Crossing the bar,
কিংবা ভারতীয় ঋষি কবি জানালেন—
সমুদ্রেই শান্তি পারাবার!

আমরা বিত্রস্তপ্রাণ,
শুধু বুঝি—পাড়ি শেষ;
পৌঁছে যাব নিজের আলয়ে।

টিউকল

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

যখন পুকুর ছিলাম, মজে যাচ্ছিলাম অযত্নে,
তোমরা বুজিয়ে দিয়েছ,
তার ওপর বানিয়ে তুলেছ রাস্তা—
সেই রাস্তার ওপর দিয়ে ট্রাক যায়
সাইকেল রিকশা যায়
অনবরত। চাকার দাগ
নামতে নামতে আমার গায়ে এসে লাগে
চাবুকের মতো, আঁকাবাঁকা।

আজ আবার তোমরা জড়ো হয়েছ এখানে,
হল্লা করছ দল বেঁধে।
টিউকল পুঁতবে? ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লোহা ঢোকাবে
আমাকে ছুঁতে?

অপমানিত জল কোলে নিয়ে
অন্ধকারে শুয়ে আছি আমি অনেকদিন।
সূর্য দেখি না। গাছের ছায়া দেখি না।
গ্রামের বউরা চান করতে আসে না আমার পাড়ে।
এই সব না-বলা কষ্ট জমে জমে আর্সেনিক হয়ে গেল।

জোর করে টেনে তুলতে চাও জল, তোলো
বালতি ভরে নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও
আঁজলা ভরে খাও,
কিন্তু আর্সেনিক আছে বলে পরে যেন দোষ দিও না।

বাস-রীলিফ

অম্লোকরঞ্জন দাসগুপ্ত

ঘোড়াটা বারবার কেন চৈতালি চ্যাপেলে ঢুকে গিয়ে
প্যানেল ঘেঁষে দাঁড়ায়? সে কি চায় বাস-রীলিফের
নিভৃতে প্রশান্ত হয়ে থেকে যেতে, তাহলে তো আর
মদৎ দেবে না হায় রেস কোর্সে! ঠিক এভাবেই
ব্রহ্মের রন্ধ্রের মধ্যে অনুস্যূত হতে চেয়েছিল
প্রণব — আমার বন্ধু — অমনি তাকে গর্ভগৃহে নিয়ে
যজ্ঞ করে রাখা হল; সে এখন দিব্যি ভাল আছে
পাতাল-কারেন্সি মেপে, বলা যায়, রসাতলব্যাপী
শেয়ার মার্কেটে। নিজে কিছুই সে অর্জন করে না,
তবু কিনা বিনিময় ঘটে যায় তারই মনোহীন
মাধ্যমে, হা দীনবন্ধু! সেভাবেই এই ঘোড়াটার
সমাপ্তি সূচিত হল এইমাত্র, তাকে নিয়ে দেখি
টাগ-অফ-ওয়ার চলছে, একদিকে আর্চ বিশপের
লোকজন, অন্যদিকে ডার্বি-র ঐহিক দালালেরা:
যে দিকেই টান পড়ুক, সে এখন জীবন্মৃত দেহ!

অকর্মণ্য হাত

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

যাকে বন্ধু ভেবে সঙ্গ, সময় দিয়েছি এতকাল
সে এখন বউকে ঠেঙায়।
অগত্যা পালাবে শেষে, আমরা বলব, ও-ই
ভিতু ছিল, কুমতলবী, ক্লীব।

ভেবে মরি, ভেবে ভেবে মরি
তবে কি অপ্রকৃতিস্থ বউ
অথবা দজ্জাল?
কেন তবে মার খেল, গেল না মামলায়
আত্মসম্মানের খোল শক্ত ছিল কত?

ভেবে মরি, অকর্মণ্য হাত লজ্জা পায়
থাপ্পড় জানে না।
না কি জানে, লজ্জায় মানে না?

আবহমান

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মাথাভর্তি হলুদ ফুলের ঝাঁক। দাঁড়িয়ে বাবলাগাছ।
আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোট
কাগজের শীর্ণকায় তরুণ কবি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি
আমাকে জানালেন, বারাকপুরের এই নদীঘাটে বসে
বিভূতিভূষণ ভোরবেলা দাঁতন করতেন আর ইছামতীর
জলকল্লোলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গুছিয়ে
নিতেন উপন্যাসের প্লট।

এখন বিগতযৌবনা নারী যেন ;— জৌলুসহীন ও বিষণ্ণ
ইছামতীর ঠিক ওপারেই দেখা যাচ্ছে মাধবপুর।
তরুণ কবি জানালেন, বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় ছিল ওই
গ্রাম। বিকেলবেলা তিনি একা একা ওই গ্রামের
পায়ে-চলা রাস্তা ধরে হেঁটে যেতেন দূরে-বহুদূরে।
যখন ফিরতেন তাঁর সঙ্গী সন্ধের মন-কেমন-করা
হাওয়া। আর তাঁর মাথার চারপাশে জোনাকি-বলয়।

ভারি ডানার মতো অন্ধকার আমাদের মাঝখানে নেমে
আসছিল ধীরে। বাবলাগাছের ফুলে ফুলে
জোনাকির হীরে-মানিক জ্বলছে আর নিভছে।

আমি দেখছিলাম — মাধবপুরের অস্পষ্ট ছায়াপথ
ধরে হেঁটে যাচ্ছেন ধুতি ও শার্ট পরনে
একজন আনন্দময় মানুষ ...

দেখছিলাম — তাঁকে অনুসরণ করে হেঁটে যাচ্ছেন
ছোট কাগজের জেদী কবি আমাদের ; তার
পাশে পাশে আমি,... আমরা সকলে ...

এবার ভুল

পঙ্কজ সাহা

একশোটা ভুলের বিনিময়ে
তোমার একটা কথা
— দাবি রাখলাম।

আমার সব ঠিকঠাক
কিন্তু তুমি কোনও কথা বলোনি,
তুমি তাকিয়েছ
আমার চোখের দিকে
তাতে কোনও কথা ছিল না,
তোমার ঠোঁট বেজেছে
শব্দের তরঙ্গে
সেই শব্দ সুর ভরিয়ে দিয়েছে
সকাল বিকেলের উঠোন
কিন্তু আমার জন্যে
একটি শব্দও নির্দিষ্ট ছিল না।

আজ কথা চাই এসুনি
আমার সব ঠিকঠাক
ঘড়ির বাধ্যতা
সামাজিক সুঠাম সকাল দুপুর বিকেল
এবং সন্ধ্যা হয়ত রাত্রিও
কিন্তু কথা আসেনি
তোমার স্পন্দন থেকে

তাই একশোটা ভুল
লিখছি আমি
আকাশ এবং বাতাস ছুঁয়ে
জলে মাটিতে পাতায় বেডকভারে
তোমার জানালার পর্দায়
তোমার মনে পড়ার
তোমার ভুলে যাবার সীমান্তে

একশোটা ভুলে না হলে
সহস্র ভুলের শর্ত থাক
তবু কথা চাই
কথা থাক যামিনী
শকুন্তলা কঙ্কাবতী
মনস্বিতা মন্দিরা
না কি বন্দনা রায়
কি তোমার নাম!
কথা থাক
কথা দেবার

কিংবা কথা রাখার।

জলধ্বনি

নাসের হোসেন

জল ছিটকায়, শরীরের দেওয়ালে লেগে গড়িয়ে পড়ে
যতটাই লাফিয়ে উঠেছিল ততটাই আশ্লেষে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
নেমে যাচ্ছে মাটির দিকে, অবশ্য মাটিতে পড়ার আগেই
কাপড়ের পোশাক তাদের টেনে নিল, মুহুমহু ফোঁটা ফোঁটা
জলধ্বনি, বুকখোলা পাঞ্জাবি, দূরে দুটো শালিখ উড়ে উড়ে
বসছিল পাঁচিলের উপর, পাঁচিলের উপর কাচের পাহারা
এড়িয়ে তাদের ছোট ছোট লাফ, কথা বলাবলি, হলুদ ঠোঁট
আরও পেছনে আতাগাছে ঝুলে আছে অজস্র আতা
যেন নক্সাকাটা জাজিমের উপর অজস্র আতার নকশা
যেন অসংখ্য জলকণা লাফ দিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেছে

স্নানরাত্রি

চন্দন রায়

খুব দ্রুত নেমে এল স্নানরাত্রি
মেঘের তখন আঠাশ বছর
চোখের পাতায় নক্ষত্রের দল
রাতের গাড়িতে তুলে দিল বৃষ্টি

প্রথম হাওয়া উঠল ডালপালায়
তারপর পাখির আলাপ মিশে গেল
চমকে উঠল সিন্ধুতীর, মেঘলোক
পাথরের সমস্ত জটিল অন্ধকার
একবার মেঘ, একবার বৃষ্টি
বক্সের ভিতর ছড়িয়ে দিয়েই
বাষ্প হয়ে মিশে গেল নাভিমূল

চারিদিকে সারিবদ্ধ পাহাড়ি আকাশ
আঙুল আর তর্জনী এক ক'রে
সমস্ত মাঠের গান তুলে দিল, মেঘ—
সম্পূর্ণ ভিতরে খুলে-দিল স্নানরাত্রি...

‘সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু’

গৌরী আইয়ুব

১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে একটি তিন দিন ব্যাপী সাহিত্যমেলার আয়োজন হয় দুই বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অন্নদাশংকর রায় এবং তাঁর সঙ্গে সুযোগ সহায়ক পেয়েছিলেন নিমাই চট্টোপাধ্যায়কে। আমিও অল্প স্বল্প কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। সে আমার এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ওই মেলায় একদিন কয়েকজন নবীন কবির সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিনই পরিচয় হয়। আধুনিক কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা ওঠে, বিশেষ করে তখন তিনি শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন বলে। কথায় কথায় আমি যখন সুভাষকে বলি যে দু-চারদিনের মধ্যে আমি কলকাতায় যাব, আমার অসুস্থ অধ্যাপক আইয়ুবকে দেখে আসার জন্য তখন সুভাষও তাঁর সঙ্গে আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলে জানালেন। তিনিও শিগ্‌গিরই একদিন দেখা করতে যাবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরও বলেন যে, আইয়ুবের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন পার্ল রোডের দোতলায় আইয়ুবকে এবং একতলায় মুজতবা আলিকে দেখে তাঁর খুব বিস্ময়বোধ হয়। এই দুটি বন্ধু পরস্পরের থেকে এত বিপরীত স্বভাবের মানুষ কেন। এত ভিন্ন ধরনের দুটি মানুষ কি করে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন!

আমি অবশ্য তখনও সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্বচক্ষে দেখিনি — তবে আইয়ুবের কাছে নানারকম গল্প শুনেছি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই ১৯৫৩-এ তখনও সেখানে প্রাক্তন ছাত্র সৈয়দদার পরিচিত বহুলোক ছিলেন। তাঁদের মুখেও নানারকম গল্প শুনে মনে হয়েছিল তিনি সেখানকার একজন লেজেন্ড।

মুজতবা সাহেব যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, তখন আইয়ুবও মাঝে মাঝে তাঁর ডাকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যেতেন। তখনই কলাভবনের বিনায়ক. মাসোজী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় — এঁদের সঙ্গে আইয়ুবেরও বন্ধুত্ব হয়। ১৯৪৬-এ আইয়ুবের যষ্ঠা হয় — তখন মাসোজী এবং মুজতবা সাহেব আইয়ুবকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে মদনাপল্লীর স্যানেটোরিয়ামে গিয়ে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সে সময়কার নানারকম মজার গল্প আইয়ুবের কাছে শুনেছি। আমার সঙ্গে মুজতবা আলীর পরিচয় হয়েছিল আরও কয়েক বছর পরে — ১৯৫৩ সালে। আমি শুনেছিলাম যে মুজতবা আলী যদিও তখন দিল্লিতেই বেশি থাকেন কিন্তু মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে তাঁর পার্ল রোডের একতলার ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব জমিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। ১৯৫৩-তে একদিন বিকেলবেলা পার্ল রোডের বাড়িতে আইয়ুবকে দেখতে গিয়ে মুজতবা আলীর সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। ওঁরা দুই বন্ধু ডক্টর গণির ফ্ল্যাটে খাওয়ার ঘরে গল্প করছিলেন। ওই দুই ব্যাচেলর (মুজতবা সাহেবের বহু বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তখন ঢাকাতেই ছিলেন, কলকাতায় এসে সংসার করেননি) ওই বাড়ির দুটি ঘরের বাসিন্দা হলেও তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ভাবী সালেহা গণির সংসারে। কিন্তু সেদিন কেবল ওঁরা দুজনই চা ছেতে ছেতে গল্প করছিলেন। আর কেউ ছিলেন না। আইয়ুব তাঁর ছাত্রীর সঙ্গে মুজতবা সাহেবের আলাপ করাতে গিয়ে আমার পিতৃপরিচয় দিলেন। মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার বাবার কি করে পরিচয় হয়েছিল সে জানিনা। কিন্তু মনে হয়েছিল বাবাকে মুজতবা সাহেব জানতেন।

আমাকে প্রথম সম্ভাষণে মুজতবা সাহেব বললেন, ‘I expected a little more intelligence on your face’ — আইয়ুব খুব বিব্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। আর আমি তো কোনও দিনই তেমন হাজির-জবাব ছিলাম না। সেদিন প্রায় কিছুই বলতে পারিনি। শুধু বোকার মতোই একটু হাসতে

থাকলাম। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা হতে থাকল। খানিকক্ষণ পরে মুজতবা সাহেবের আরও অনেক বন্ধুবান্ধব এসে পড়ায় তিনি তাঁদের নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমরাও দুজনে আইয়ুবের ঘরে চলে এলাম। তখন আইয়ুব আমাকে জিগ্যেস করলেন, “মুজতবার কথায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে? ও এইরকম। ভালমানুষ কাউকে পেলে যা মুখে আসে বলে ঘাবড়ে দিতে ভালবাসে। কিন্তু এর পরে আলাপ করলে বুঝতে পারবে ও কতখানি সজ্জন বন্ধু হতে পারে। তখন আর আমার বন্ধুকে এমন শকিং লাগবে না তোমার।”

ওই সময়টা মুজতবা আলী বোধ হয় দিল্লিতে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-য় কোনও উচ্চপদে ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই কলকাতায় এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখাশুনা হতে লাগল ১৯৫৪/.৫৫-র সময় থেকে যখন আমি এম.এ পড়বার জন্য কলকাতায় চলে আসি। তখন দেখা হলে খুব হইহই করে নানারকম গল্প শোনাতেন। বিশেষ করে অল্প দিন পরে যখন কটকের রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর হন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। একবার আইয়ুবকে এবং আমাকেও তাঁর সঙ্গে কটক বেড়াতে যেতে ডাকলেন। আমাদের তখনও বিয়ে হয়নি। অতএব আমাদের দুজনের পক্ষে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হল না। আর আমি তখন এম.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আইয়ুব একাই তাঁর সঙ্গে কটক চলে গেলেন। সেটা নভেম্বর কি ডিসেম্বর — এক রাত্রির সফর। দুই বন্ধুতে একটি কুপে পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর আইয়ুব যথাসময়ে কিঞ্চিৎ নৈশ আহার সেরে নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। মুজতবা সাহেব আইয়ুবের হোল্ড অল খুলে নীচের বার্থে তাঁর বিছানা করে দিলেন। মুজতবা সাহেব নিজে কিন্তু বিশেষ কিছুই খেলেন না এবং ওপরের বার্থে একটি চাদরমাত্র বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। সারা রাত কম্বল জড়িয়ে আইয়ুব ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন। আর মুজতবা সাহেব দুটি পাখাকে ফুল স্পিডে চালিয়ে ওপরের বার্থে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ফেললেন। তাঁর গায়ে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল রাতের সুনিদ্রার পর মুজতবা সাহেব বেশ ঝরঝরে হয়ে নামলেন। তাঁর ভাষায় ‘ Fit as a fiddle’ আর আইয়ুব ধরা গলায় কাঁচকোঁচ করতে করতে নামলেন, ঠাণ্ডা লেগে চোখে নাকে জল গড়াচ্ছে। প্রথম কটা দিন সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে তিনি আর বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারেননি। বরং মুজতবা সাহেবের উৎসাহে তাঁর বাড়িতেই বেশ কিছু স্থানীয় সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হয়। কিন্তু মুজতবা যত বড় করে পার্টি ইত্যাদি দেবার প্ল্যান করেছিলেন, সেগুলি ভেস্তে গেল।

আবু সয়ীদ আইয়ুব যে বালক বয়সেই সিলেটে মুজতবা সাহেবের সতীর্থ ছিলেন সে কথা শুনে থাকলেও আমার মনে ছিল না। সম্প্রতি ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্রগুচ্ছ গ্রন্থটিতে এই তথ্য পেয়ে খুব ভাল লাগল। ওই সময়ে কিছুদিনের জন্য আইয়ুবের অভিভাবকেরা তাঁকে কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ এখানকার মাদ্রাসা স্কুলে কয়েকটি বয়স্ক ছাত্র সুকুমার দর্শন আইয়ুবকে অত্যন্ত বিব্রত করছিল। কিশোর আইয়ুব স্কুলে যাবেন না বলে কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তখন তাঁকে এবং তাঁর দাদা আবু আসাদ গণিকে কলকাতা থেকে সরিয়ে বছর দুয়েকের জন্য সিলেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওখানে তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক আবু-সয়ীদ আবদুল্লাহ সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় মুজতবা সাহেব আইয়ুবের সহপাঠী হয়েছিলেন।

আইয়ুব সিলেট থেকে চলে আসার পর মাঝে কিছুকাল মুজতবা সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ১৯২১ সালে মুজতবা যখন শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করতে এলেন, তখন আবার তাঁদের নতুন করে যোগাযোগ হল। মাঝে মাঝে মুজতবার আমন্ত্রণে আইয়ুব শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সিলেট যাওয়া আসার পথে মুজতবা কলকাতায় আইয়ুবের ঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন, কখনও একা কখনও সবান্ধব। মুজতবা সাহেব এলেই তো সেখানে আবার আইয়ুবের তরুণ আত্মীয়দের ভিড় জমে যেত। তাদের অভিভাবকরা অনেকে উদ্বিগ্ন হতেন যে মুজতবা বুঝি ছেলেপুলের মাথা খাচ্ছে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থার অবসান হলে পরে মুজতবা আলীর ভবঘুরে জীবন বেশ ভালভাবেই শুরু হয়ে গেল। প্রথম দফায় তিনি কাবুল চলে গেলেন। তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপকদের আহ্বানে। মাসে দুশো টাকা মাইনের ইংরেজি পড়ানোর মাস্টারি — তাঁর এবং বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে হল খুব চমৎকার একটা সুযোগ। অল্পদিন পরে সেটি মাসে তিনশো হল। কাবুলের তৎকালীন আমীর আমানুল্লাহ খান তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের অনুসরণে ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যাপক বেনোয়া ও বাগদানভ কাবুলে শিক্ষা বিভাগে ইতিপূর্বেই গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। তাঁদের সুপারিশেই মুজতবা আফগানিস্তানে শিক্ষা বিভাগে চাকরি পান ও ১৯২৭ সালে কাবুল যান। তিনি সেখানে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শেখাতেন। কিন্তু এই সুযের চাকরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পদিন পরেই প্রতিবিপ্লবের ধাক্কায় আমানুল্লাহর সব উন্নতির পরিকল্পনাই ব্যর্থ হল। বিদেশি শিক্ষকেরাও তড়িঘড়ি সেখান থেকে বিদায় নিলেন। মুজতবা সাহেবের অধ্যাপকরা চলে আসার পর তাঁর আসার ব্যবস্থা করতে অনেক বেগ

পেতে হয়েছিল। অত্যন্ত সংকটের মধ্যে তিনিও কাবুল ত্যাগ করে পেশোয়ারের প্লেন ধরেছিলেন।

দেশে ফেরার পর তাঁর এই বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা দিনের পর দিন পরম আগ্রহে শুনেছিলেন। তখনই তাঁর বন্ধুদের মনে হয়েছিল, এ কাহিনীটি উনি যেমন চমৎকার রসিয়ে বলতে পারেন তেমনটি যদি লিখে ফেলতে পারেন তা হলে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি ভ্রমণকাহিনী হবে।

এরপর ছ-সাত বছর তিনি বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক বগদানভের চেষ্টায় তিনি জার্মানিতে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন। প্রথমে বার্লিনে এবং পরে বন-এ। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'The Origin of the Khojas and Their Religious Life Today'. এরপর তিনি কয়েক বছর ফ্রান্স ও ইটালিতে কাটিয়ে দেশে ফিরবার পথে কায়রোতে যান এবং আল-আজহারে পড়াশোনার সুযোগ পান। কায়রোতে বরোদার বিদ্যোৎসাহী মহারাজা সয়াজি রাও গায়কোয়াডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

দেশে ফিরে তিনি বরোদার মহারাজার আগ্রহে বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তবে যে কয়েক বছর ছিলেন তার মধ্যে একটিও ছাত্র পাননি। এই সময়কার তাঁর নানারকম অভিজ্ঞতার গল্প করতেন। অল্পদিন পর পর রাজসভা বসত। সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে এই উজ্জ্বল অধ্যাপক রত্নটিরও নিমন্ত্রণ হত। তাঁরা সবাই সভা সাজিয়ে বসতেন। একদিন এরকম একটি সভায় মুজতবা তাঁর নির্ধারিত আসনে বসে এক পার উপর আরেক পা তুলে পা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন সবার দৃষ্টি তাঁর উপরে, আর সভাপরিচালক আমলাটি গম্ভীরকণ্ঠে ধমক দিচ্ছেন 'আলী আদব সে বৈঠো'। এরকম আদব-কায়দা মেনে বছর কয়েক থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন।

এবার তাঁর লেখালেখির কাজ বেশ আনন্দের সঙ্গে শুরু করলেন। কিছুদেন পর বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে উনি 'দেশে-বিদেশে' লেখায় হাত দিলেন। কয়েকবার কয়েকটি সাহিত্য সভাতেও কিছু কিছু অংশ পাঠ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮-এ লেখাটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। বলতে গেলে রাতারাতি তাঁর লেখক-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আইয়ুব সব সময় বলতেন যে 'দেশে বিদেশে'ই মুজতবার শ্রেষ্ঠ রচনা।

ততদিনে তো দেশবিভাগ হয়ে গিয়েছে এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয় মহলের তখন দেশত্যাগের হিড়িক পড়েছিল। সেই ভাঙাগড়ার মাঝখানে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন যদিও কেউ কেউ যেমন এদিকেই থেকে গেলেন তাঁদের তিন পুরুষের জন্মভূমিতে, কিন্তু মুজতবা সাহেবের আত্মীয়স্বজনের আদিনিবাস সব কিছু পূর্ব বাংলায় সিলেটে অর্থাৎ তখন পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম লিগের রাজনীতিভাবনা এবং দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রথম থেকেই তাঁরা কেউ-ই গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য দেশভাগের পরে কয়েক বছর কোন দেশে থাকবেন সে বিষয়ে মুজতবা সাহেব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এমনকী তিনি বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে সেখানে কিছুকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে কিছু মতামত অকপটে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে তখনও উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন দানা বাঁধেনি। কিছু বাঙালি পণ্ডিতও কায়েদে আজমের উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য করার প্রস্তাবে প্রতিবাদ তো জানাননি বরং নানা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার প্রয়াস করছিলেন এবং আরবি ফারসি ও ব্যাপক উর্দু চর্চাকে সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু মুজতবাই সর্বপ্রথম ওই সমস্যাটিকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। ইতিহাস থেকে আরও কিছু নজির টেনে উর্দুভাষার দাবি কতটা অযৌক্তিক তা প্রমাণ করেছিলেন। ফলে অচিরেই তিনি কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়েন এবং পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। তাই বলতে গেলে ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে প্রথম বীজটি তিনিই বপন করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সে কথা কেউ স্মরণে রাখেননি। বরং ভিসা পাসপোর্ট চালু হওয়ার পর উনি যে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেই তাতে ক্ষুব্ধ হন।

এদিকে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পরে এদেশে মুসলমানের পক্ষে জীবনযাত্রা বেশ কঠিন হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িকতার আবিল পরিবেশে যাঁরা এদিকে রয়ে গেলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

মদনাপল্লী থেকে অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর আইয়ুবের সমস্যা হল একটি চাকরি পাওয়া। পাকিস্তান থেকে ভাল ভাল হিন্দু অধ্যাপকরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের সুব্যবস্থা করতেই শিক্ষাবিভাগ তখন হিমসিম খাচ্ছে। তাই আইয়ুবের একটি কাজ পাওয়ার আশা তখন সুদূরপরাহত। ১৯৪৯ সালে ঢাকার কয়েকজন বন্ধু আইয়ুবের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে একটি চাকরির ব্যবস্থা পাকা করে চিঠি লিখলেন। ততদিনে আইয়ুব ৫ পার্ল রোডের দোতলায় এবং মুজতবা আলী এক তলার স্থায়ী অধিবাসী, একদিন বিকেলে মুজতবা যখন তাঁর বন্ধু কানাইলাল সরকার, কিঙ্কর সেন প্রমুখের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, তখন আইয়ুবও বিষণ্ণ মুখে সেখানে ওঁদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন। মুজতবা তখন হাসতে হাসতে বন্ধুদের বললেন যে, লোকে চাকরির খবর পেলে ফুর্তি করে

আর আমার এই বন্ধুটি এমন বিষণ্ণ হয়ে আছে যেন বিরাট কোনও শোকের সংবাদ এসেছে।

বন্ধুরা জানবার জন্য উৎসুক হলে মুজতবা তাঁদের বিশদ জানালেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে আইয়ুব অধ্যাপনার একটি পদ পেয়েছেন এবং থাকার জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। একথা শুনে বন্ধুরা হই হই করে উঠলেন, 'সে কি আইয়ুব পাকিস্তান চলে যাবেন, এটা হতেই পারে না, আপনাকে কবে যোগ দিতে বলা হয়েছে? আপনি কয়েকটা দিন আমাদের সময় দিন আমরা কালই রথীদার সঙ্গে কথা বলব।' রথীদা তখন শান্তিনিকেতন থেকে এসে জোড়াসাঁকোতে আছেন।

আইয়ুব দুরুদুরু বক্ষে আশার ক্ষীণ একটি সম্ভাবনা নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। দু-তিনদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার চাকরির নিশ্চিত খবর শান্তিনিকেতনের সেই বন্ধুরা নিয়ে এলেন। কিছুকাল আগে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হায়দ্রাবাদের নিজাম বিশ্বভারতীকে উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করার জন্য কিছু দান করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত বিশ্বভারতী এই পদের উপযুক্ত কাউকে পায়নি।

মাস ছয়েকের মধ্যে ১৯৫০-এর এপ্রিল-মে মাসে সেই চাকরিতে আইয়ুব যোগদান করেন। এর অল্পকাল পরে হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে মুজতবা সাহেবকেও শিক্ষামন্ত্রকের কোনও এক পদে যোগ দিতে হল। দুই বন্ধু কেউই তাঁদের নতুন দায়িত্ব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। আইয়ুব অসুস্থতার কারণে বছর খানিক ছুটি নিলেন। তারপর ইস্তফা দিলেন। ওদিকে মুজতবা সাহেব কালচারাল রিলেশনস্-এর সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করে অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে কয়েক বছর কলকাতা, কটক এবং পাটনায় চাকরি করার পরে তিনিও ইস্তফা দিলেন। যদিও তখন তাঁর একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে। ততদিনে দুই দেশের মধ্যে ভিসা পাসপোর্ট চালু হয়ে গেছে। স্ত্রী-পুত্র পূর্ব পাকিস্তানে থাকা সত্ত্বেও মুজতবা সাহেব ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ব্যক্তিত্ব তাঁকে পাকিস্তানবিরোধী করে রেখেছিল। তবে এর জন্য তাঁর পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল।

১৯৫১তে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্রী ছিলাম, আবু সয়ীদ আইয়ুব সেখানে আমাদের অধ্যাপনা করেছিলেন। তখন হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতনে খবর এল মুজতবা সাহেব বিবাহ করেছেন। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা অনেকেই তখন অবাক হয়েছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁরা আগে কোনওই খবর পাননি। কয়েক মাসের মধ্যেই আইয়ুব অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলেন। ৫, পার্ল রোডে ফিরে এসে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। কিছুকালের জন্য যাদবপুরে কিরণশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালেও গেলেন। সেখানে বড় একটা অপারেশনের কথা হয়েছিল এবং তা নিয়ে আইয়ুব খুবই দুর্ভাবনার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অপারেশনের প্রস্তাব বাতিল হল। সদ্য যেসব স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি ওষুধের খবর পাওয়া গিয়েছিল সেসব দিয়েই চিকিৎসা চলতে লাগল।

আমি তিপ্পান্ন সনের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনের বি.টি পরীক্ষা দিয়ে অভিভাবকদের আপত্তি সত্ত্বেও কলকাতায় এম.এ. পড়বার জন্য চলে এসেছিলাম। আইয়ুবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা আমার পিতা অবগত হয়েছিলেন বলেই কলকাতায় পড়তে দিতে তাঁর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল।

আমি কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে হস্টেলে স্থান পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং হস্টেলে স্থান পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আইয়ুবের অনুরোধে তাঁর বন্ধু অম্লান দত্ত সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

কলকাতায় আসার পর থেকে প্রায় রোজই পার্ল রোডে বিকেলের দিকে একবার করে আসতাম। তখনই আইয়ুবের পরিবারের সঙ্গে এবং মুজতবা কলকাতায় থাকলে তাঁর সঙ্গেও আলাপ হত। একবার কোনও ছুটিতে রাবেয়া আলী তাঁর শিশু পুত্রটিকে নিয়ে এসে মুজতবা সাহেবের ঘরে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছিল। তবে তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ খুব বেশি হয়নি। আসা-যাওয়ার অসুবিধার জন্য এবং মুজতবার একটি মাত্র ঘর থাকায় তাঁর স্ত্রী এখানে এই বাড়িতে এসে বেশি দিন থাকেননি। সম্ভবত দিল্লিতে কটকে এবং পাটনায় এসে মাঝে মাঝে থেকেছেন।

১৯৫৫ সালে আমি এম.এ. পরীক্ষায় পাশ করার পরেই ছাপান্ন সালের জানুয়ারি মাসে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে কাজ পেয়েছিলাম। এইভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই আইয়ুব বিবাহের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। নয়ত সবাই তাঁকে নাবালিকা হিন্দু কন্যাকে অপহরণের অপবাদ দেবে—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। আমাদের বিয়ের পরই একটু প্রশস্ত একটি আবাসের প্রয়োজন হল। কারণ একটি মাত্র ঘরে আইয়ুবের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সংসার করা সম্ভব ছিল না। ঠিক সেই সময়েই কলকাতা রেডিও স্টেশনের চাকরি ছেড়ে মুজতবা শান্তিনিকেতনে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর একতলার ঘরটির স্বত্ব তিনি আমাদের দিতে রাজি হন। ঘরটির উপর তাঁর এক অনুগত ভক্তের দাবি ছিল। মুজতবার নির্দেশে তিনি এই দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুবৎসল মুজতবা সাহেব আমাদের মস্তবড় উপকার করেছিলেন। অসুস্থ দেহে তাঁর ডাক্তার ভাইয়ের সান্নিধ্য

থেকে আর কোথাও তাঁকে নিয়ে গেলে আইয়ুবের প্রতি অবিচার করা হত। দোতলার একটি এবং একতলায় আর একটি ঘর নিয়ে আমাদের সংসার শুরু হল। ১৯৫৭-য় আমাদের পুত্র সন্তানটির জন্ম হয়েছিল।

এর পরে যখন মুজতবা সাহেব আসতেন, তখন এই বাড়িতে তাঁর ঘরটি না থাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ অনিয়মিত হয়ে গেল। কলকাতায় যেহেতু তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীর সংখ্যা যথেষ্টই ছিল, তাই কলকাতায় তাঁর আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল। তবে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারতেন না।

এরপর ১৯৭০ পর্যন্ত মুজতবা সাহেব প্রথমে শান্তিনিকেতনে ছিলেন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে। পরে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে এবং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে অভিমানে বোলপুরে গিয়ে থাকতে শুরু করেন। এই সময়টায় ওঁর কথা মনে পড়লে খুব অপরাধী বোধ করতাম। দোতলায় ও একতলায় দুটি বিচ্ছিন্ন ঘরে একটি শিশু এবং অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়েছিল, বিশেষ করে প্রায়ই উনি অসুস্থ থাকতেন বলে। তাই বছর পাঁচেকের মধ্যে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমরাও নিরুপায় ছিলাম। এই বাড়ির গৃহকর্ত্রী আইয়ুবের পার্শ্ববর্তী ভাড়াটেরা চলে যাচ্ছিল বলে তাদের একটি ঘর আমাদের এই শর্তে দিতে রাজি হয়েছিলেন যে একতলার ঘরটি তাঁকেই প্রত্যর্পণ করতে হবে। অসুস্থ স্বামীর পাশাপাশি ঘরে থাকতে পারব — এই আশায় আমি মুজতবার ঘরটি আমাদের আত্মীয়া গৃহস্বামিনীকে ফেরত দিয়েছিলাম। কথাটা আমি মুজতবা সাহেবকে সসঙ্কোচে জানিয়েছিলাম। মুজতবাও জেনে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমি উপরের ঘরটি পাই ১৯৬০ সালে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনা ছেড়ে দেওয়ার পর এই বাড়ির সেই প্রাক্তন ঘরটি পেলেই মুজতবা সাহেবের সবচেয়ে সুবিধা হত। কিন্তু তা যে হল না সেজন্য আমি এখনও মনস্তাপ ভোগ করি। সব থেকে বড় সমস্যা হল ১৯৭১-এ যখন পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময়ে বোলপুরে তাঁর বাড়িতে গোয়েন্দা দফতর থেকে পুলিশ গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্নাদি করেছিল। কোনও সংবাদপত্রে এ সংবাদটি সে সময়ে বিকৃত ভাবে বেরিয়েছিল দেখে আমাদের অত্যন্ত মন খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কিছু করার ছিল না। যখন শুনলাম আমার একজন শ্রদ্ধার পাত্র প্রবীণ গান্ধীবাদীও এই কারণে মুজতবা আলী সম্পর্কে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন, তখন আর সহ্য করতে পারিনি। তাঁকে পত্র লিখে আমার ক্ষোভ ও যন্ত্রণা জানিয়েছিলাম। তিনি পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ততদিনে এই বাড়ির বৃদ্ধ মালিক এবং তাঁর স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমাদের উপরের ফ্ল্যাটে থাকতেন কেবল সেই গৃহস্বামীর অকৃতদার কনিষ্ঠ পুত্র কচি। তিনিই মুজতবা সাহেবকে আবার তিনতলার ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাপারটা সহজে ঘটেনি। কারণ কচির এই কাজটায় তাঁর ভাইবোনেরা কেউ কেউ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, মুজতবা সাহেব যে উপরের ঘরে এসে থাকতে শুরু করলেন, এতে আমাদের বিবেক একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু দেখা গেল যে-মানুষটি ৫৬ সালে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আর যিনি '৭১ সালে ফিরে এলেন, তাঁরা যেন আর একই মানুষ নন। ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকা মারফৎ বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন বহুকাল ধরেই সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। দেশ পত্রিকায় নিয়মিত নানা লেখা বার হচ্ছিল বলে তাঁর অনেকটা আর্থিক সমস্যারও সমাধান হয়েছিল। কোনও রকমে সেই লেখাটুকু লিখতেন, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে আগের মতো পড়াশুনো করার অভ্যাস আর রাখতে পারেননি। যোগ্য-অযোগ্য নানা ব্যক্তির সঙ্গে আড্ডা দিয়েই সময় কেটে যেত এবং পানের অভ্যাসও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাঁকে সংযত করার সাধ্য আমাদের কারওর ছিল না। তাঁর মানসিক বিষাদের কারণও যথেষ্ট ছিল, সেকথাও অস্বীকার করা যাবে না। সারা একাত্তর সালটি তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টের কাল ছিল। তাঁর স্ত্রী, পুত্র যে ঢাকাতেই রয়ে গিয়েছিলেন সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের খান সেনাদের দৌরাত্ম্যের সব খবর পেয়েও মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। এর জন্যও তাঁর এখানে নানাজনের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছিল। স্বামী ভারতীয় এই অপরাধেই তাঁর স্ত্রীর উপরে কত যে নিগ্রহ হতে পারত সেই সব কথা ভেবেই তিনি অন্য ভারতীয় মুসলিম ইনটেলেকচুয়ালদের মতো সরাসরি বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতার নিন্দা করতেও পারছিলেন না। আবার নীরবে সহ্য করাও বড় কঠিন ছিল। এ সময় বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরেই তিনি ঢাকায় যান। সেখানে সকলকে ভাল দেখে তাঁর এতদিনের উদ্বেগের অবসান হল। কিন্তু বেশ কিছুকাল পরিবারের সঙ্গে থাকার পর উনি আবার কলকাতা ফিরে আসেন তাঁর লেখালেখির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তা ছাড়া তাঁর সেই ভবঘুরে জীবনের স্বাধীনতাটুকু তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু লেখালেখি যতটা করবেন ভেবেছিলেন, ততটা করতে পারছিলেন না। তাঁর ভাবীর নিজেকেও যথেষ্ট সংযত করতে পারছিলেন না। তাঁর ভাবীর পাঠানো খাবার বেশিরভাগ দিনই অস্পৃষ্ট পড়ে থাকত। এর কিছুকাল পরে যখন মিসেস রাবেয়া আলী তাঁর নিজস্ব চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন, তখন আমি এবং আমার বড় জা মিসেস গণি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

তখন কথায় কথায় তাঁকে অনুরোধ জানাই যে, তিনি যেন মুজতবা সাহেবকে আর এখানে একা রেখে না যান। তাঁকে বুঝিয়েসুজিয়ে নিজের সঙ্গে ঢাকায় নিয়ে যান। মিসেস আলীকে এইভাবে পরামর্শ দেওয়াটা হয়ত আমাদের পক্ষে উচিত হয়নি। তিনি আমাদের কথা চুপ করে শুনে গিয়েছিলেন, কিছু বলেননি। তিনি বোধ হয় আমাদের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। তারপর স্বামীকে যে কী বলেছিলেন তা শুধু অনুমানই করতে পারি। এর কয়েকদিন পরে মিসেস আলী ঢাকায় একা ফিরে যান। তখন একদিন সন্ধ্যায় আমি মুজতবার ঘরে গিয়েছিলাম। দু-একটি হাস্য পরিহাসের কথা হবার পরই মুজতবা অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন এবং যেভাবে আমাকে কঠোর তিরস্কার করতে লাগলেন, তাতে আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। তিনি আমাকে এবং আমার জাকে কত ভালবাসতেন এবং কলকাতায় নিজের ঘর দিয়েও আমাদের একদিন উপকার করতে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রতিদানে আজ আমরা তাঁকে এই ঘর থেকেও দূর করে দেবার চেষ্টা করছি। আমরা যে এতদূর স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর তা তিনি জানতেন না। তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে পর্যন্ত আমরা ওই উদ্দেশ্যে বিব্রত করেছি। কয়েক মিনিট এইসব কথা বলার পর যখন উনি একটু থামলেন, তখন আমি উঠে নীরবে চলে এলাম।

তারপর আর তাঁর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয়নি। উঠতে নামতে সিঁড়িতে দেখা হলে আমি মাথা নিচু করে সরে দাঁড়াতাম। কিছুদিন পরে ঈদের সময়ে আমার কাছে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে বলেছিলেন, সেদিন রাগের মাথায় যে সব কথা বলেছিলেন তা বলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না এবং সেহেতু আমি যেন তাঁকে ক্ষমা করি।

আমার এত আত্মঘাতী অহঙ্কার ছিল যে এর জবাবে আমি তাঁকে জানাতে পারিনি যে আমরাও তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তার কয়েকদিন পর তিনি আবার ঢাকা যাচ্ছেন শুনেও আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। আমি ভেবেছিলাম, শিগ্‌গিরই তিনি আবার ফিরে আসবেন। সেইজন্য অনুতাপের জ্বালা আমি আজ পর্যন্ত বয়ে বেড়াচ্ছি। চুয়াত্তরের গোড়ায় যখন খবর এল যে তিনি আর ইহলোকে নেই, তখন আমার সমস্ত প্রাণটা হাহাকার করে উঠল।

এই জীবননাট্যের উপর যবনিকা যে এত তাড়াতাড়ি নেমে আসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তার ফলে, সারাজীবন একটি গভীর অনুতাপ বহন করাই আমার ভবিতব্য। এককালে যিনি এত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি কি করে এভাবে চলে গেলেন তা আজও আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যা যথাসময়েই প্রকাশিত হবে। চতুরঙ্গের প্রতি সংখ্যার বর্তমান মূল্য মাত্র বারো টাকা। পত্রিকার কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সেকথা বুঝবেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪ টি, ৮ টি এবং ১২ টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে কটি সংখ্যার গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচ বহন করব। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। চেকে কিংবা ড্রাফটে 'চতুরঙ্গ' কথাটি লিখতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য, যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন। যোগাযোগের ঠিকানা :

চতুরঙ্গ, ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা–৭০০ ০১৩। ফোন : ২৭-৩৭৭০

আত্মজীবনীর কিয়দংশ

অসীম রেজ

সে আত্মজীবনীটা কোথা থেকে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না। প্রথম প্যারাটা লিখে আবার কেটে দিল। প্যারাটা ছিল এরকম—"আমার শৈশব কেটেছে শহরতলীর একটা অন্ধকার, পচা, নোংরা গলির মধ্যে। গলির মুখে একটা বিশাল জলের গম্বুজ, আমাদের বাড়ির দিগ্‌চিহ্ন হিসাবে কাজ করত। সরু, হাড় জিরজিরে, স্যাঁত সেঁতে, এবড়োখেবড়ো গলিটার মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে বেরোনোর পথ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। গলিটার মুখে নীল টিনের পাতে লেখা গলিটার নাম প্রায় মুছে গেছে। এর মুখোমুখি ছিল একটা নিষিদ্ধ বস্তি যেখান দিয়ে আমাদের হাঁটাচলা বারণ ছিল। অল্প পয়সায় এতবড় একটা বাড়ি পাওয়া যাবে না বলে আমরা আট দশজনের একটা বিশাল পরিবার এখানে উঠে আসি। তা ছাড়া বাবার অফিস, আমাদের স্কুল, পোস্ট অফিস, বাস স্ট্যান্ড এগুলো খুব কাছে ছিল। এ পাড়ায় হাতে গোনা যে ক'জন শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, আমার বাবা তাদের মধ্যে একজন। গলির বেশির ভাগ লোক দুধের ব্যবসা বা পান বরজে কাজ করত। এরা আমাদের সঙ্গে মিশত না। ভাবত এক ভিন্‌দেশি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।" এইভাবে লিখতে গিয়ে তার মনে হল ঠিক হচ্ছে না। সে কোথা থেকে এখানে এল, সেটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। এ গলিতে আসার আগেও একটা ইতিহাস আছে যেটা সে কিছুটা স্মৃতিতে আনতে পারে। কিছু অস্পষ্ট। এর আগে তার বাবা ছিলেন একজন ছোটখাটো সরকারি অফিসার যিনি জমিজায়গার বিবাদ নিষ্পত্তি করতেন। প্রায় বছরে বছরে এ অঞ্চল থেকে সে অঞ্চল করে বেড়াতেন। একটা যাযাবরের জীবন। কাঠের বিশাল প্যাকিং বাক্সগুলো ছিল তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্বল। এগুলো কখনও খাট, কখনও বসার চেয়ার, কখনও বা টেবিলের কাজ করত। আধা গ্রাম আধা শহরের মতো ডিস্‌ট্রিক্ট টাউনগুলো তখন সবে গড়ে উঠছে। সব সময় বাবার অফিস লোকে লোকারণ্য। কাঠের রেলিং ঘেরা একটা উঁচু ডায়াসে বাবা বসতেন বিচারকের আসনে। তিনিই যেন সবার উপর রাজার মতো।

সে ভাবল আত্মজীবনীটা যদি সে এইভাবে শুরু করে তাহলে কি আগের জীবনটার কিছু ছায়া মিলবে? সে নিশ্চিত হতে পারল না। মনে হল তার বাবার জীবনেরও একটা অংশ আছে যেটা তার জীবনেরও অংশ। জীবনের ঘটনাগুলোকে স্লাইজ রুটির মতো কেটে কেটে টেবিলের উপর সাজাতে গিয়ে দেখে দু'এক টুকরো কোথাও-বা পড়ে আছে। এমন খোঁজার চেয়ে বরং সে আবার নতুন করে লেখায় মনোনিবেশ করল : 'মাঝ বয়সে বাবা দুম্‌ করে সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। যোগ দিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া এক আন্তর্জাতিক সংস্থায়। কলম পেশার বদলে বাবার কাজ হল লেখাপড়া করা। বাবার গা থেকে 'গেজেটেড' ছাপটা খসে গেল। বাবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনে হল। অনেক রাত অবধি তিনি লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাবার কাজটা ঠিক কী ছিল জানি না। বাড়িতে প্রায় বিদেশি অতিথিদের আনাগোনা চলত। তাঁদের জন্যে মা নানান ধরনের দেশি খাবার বানাতেন। সে নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট চলত। জানলার ফাঁক দিয়ে আমরা ভাইবোনেরা সেই ভিন্‌দেশিদের দেখতাম যেমন করে পাড়ার লোকেরা আমাদের দেখে। তাঁদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মনে পড়ে এক সময় আমরা, 'হাওয়া খানা' নামে এক বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো সরকারি নিবাসে থাকতাম। ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক আসতেন। আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন থালা ভর্তি মণ্ডা। আমরা সবার থেকে আলাদা এ ভাবনাটা তখন থেকেই দানা বাঁধতে থাকে।"

এই ভাবে লিখতে গিয়েও সে থেমে গেল। তার মনে হল বাবার প্রসঙ্গটা বড় হয়ে যাচ্ছে। অথচ মা যিনি সবচেয়ে বেশি

সংসারের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, একগাদা ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন তার কথা এল না কেন? কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মায়ের প্রসঙ্গ তখনই আসে যখন কষ্টের কথা আসে। নিত্যনৈমিত্তিক বেঁচে থাকার, তেলনুন, রেশন, জুতো, জামা কাপড়, স্কুলের টিফিন, রাস্তার কল থেকে জল আনা, ছাদে গরম জামা শুকোনো অথবা শীতে উনুনের চারপাশ ঘিরে আগুনের তাপ নেওয়ার কথা মনে পড়ে। একটা দৃশ্য খুব পরিচিত—রোজ প্রায় অন্ধকারে বসে মা রুটি সেঁকতেন। বাল্বের আলোর নীচে মাদুর পেতে সে যখন ইংরেজি টেনসের মারপ্যাঁচগুলো বোঝার চেষ্টা করত, তখন মা পাশ থেকে ভুল শোধরাতে থাকতেন, 'have been', 'shall have been', 'have had been' ইত্যাদি শব্দরাজি কয়লার ধোঁয়ার সাথে ঘুরে ফিরে মায়ের আঁচলের কাছে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়। সে আর এগোতে পারে না। একটু তফাতে মাকে ভয়ানক অচেনা মনে হয়।

সে জানে তার জন্মবৃত্তান্ত দিয়ে যদি আত্মজীবনীটা শুরু করা যায় তাহলে অনিবার্যভাবে মা ও মাতুলালয়ের কথা আসে। দাদামশাই ছিলেন চোখের ডাক্তার, খাস কলকাতার, ভবানীপুরের, যেখানে তার জন্ম। তার জন্মের দিনই দাদামশাই মারা যান। ওই জন্মের সঙ্গে এমন মৃত্যুর কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কি না সে জানে না। তবে ওই ঘটনা তার মায়ের জীবনকে ভয়ানক পাল্টে দিয়েছিল। জন্মের পর প্রথম কয়েক বছর ঐ বাড়িতে থেকে যাওয়া তার স্মৃতিতে নেই। শুধু মনে পড়ে দোতালার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দেওয়ালে টাঙানো অজস্র মৃত মানুষের ছবি, চওড়া কালো ফ্রেমে বাঁধানো সাদাকালোর প্রিন্ট প্রায় অস্পষ্ট, পোকায় কাটা, হলুদ ছোপ ছোপ। এঁদের প্রায় কাউকেই সে চিনতে পারে না। সিঁড়ি ছাড়িয়ে লম্বা করিডর, ভাঙা আলমারি, খড়খড়ির জানলা, একজোড়া মোষের সিং, আলতাপরা পায়ের ছাপ, শ্যাওলা পড়া কাঁচের অ্যাকুইরিয়ামে কয়েকটা মরা মাছ ভাসছে,—এমন ভয়ভীতি শঙ্কা জড়ানো মাতুলালয়ের স্মৃতি সে যেন আজও ভুলতে পারেনি।

আধা স্বপ্ন আধা স্মৃতির ভিতর যেন সবকিছু ধরা থাকে। দু'একটা স্বপ্ন হয়ত বা সে স্মরণে আনতে পারে, আর অন্য স্বপ্ন যার কোনও সে মানে খুঁজে পায় না খুব সহজেই ভুলে যায়। সে ভাবে, গোটা জীবনের ঘটনাগুলোকে যদি সময়ের ছোট ছোট ফ্রেমে ভেঙে দেওয়া যায় অথবা বয়সের মাপকাঠিতে ভাগ করা যায় এই ভাবে—৮ থেকে ১২, ১২ থেকে ১৬, ১৬ থেকে ৩২, ৩২ থেকে ৪৮ ও এর অধিক তাহলে হয়ত লেখার কাজটা সহজ হতে পারে। যেমন অনেকের 'আমার ছেলেবেলা', 'যৌবনের দিনগুলি', 'প্রবীণের আত্মকথা', 'বার্দ্ধক্যের বারাণসী', এমন শিরোনামে নিজেকে টুকরো টুকরো করে দেখা। তবু এরই ভিতর সব যেন কেমন মেকি, কৃত্রিম ও নাটকীয় মনে হয়। লেখার ভিতর মানুষগুলোকে আবেগ ও অনুভূতিহীন এক মিথ্যে, বানানো কাহিনীর এক একটা চরিত্র বোধ হয়। পুতুলের মতো সর্বদা লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনার দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে আবার শুরু। সে দেখে উষালগ্নে চেতনায় যে সূর্যোদয় হয়েছিল, যৌবনে তা প্রখর তেজে মধ্যাকাশে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতা অর্ধবৃত্তাকারে স্তুপের মতো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আবার শুরু হয় নতুন করে যাত্রা। যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু। বার্দ্ধক্যে শৈশব পুনরুদ্ধার, চৈতন্যে নতুন গর্ভ সঞ্চার।

সে এক আশ্চর্য সূর্যোদয় দেখেছিল শৈশবে সমুদ্রতীরে। প্রায় অন্ধকার ভোরে সাদা খোলস ভেঙে টুকটুকে এক সূর্য ডিমের কুসুমের মতো খসে পড়ল সমুদ্রের নীল জলে। আর তখনই মনে পড়ে সিন্ধবাদ নাবিকের গল্প, আরব্য রজনীর রোমাঞ্চকর কাহিনী। সেই প্রথম সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া, ভ্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতা। সে ভাবল এমন এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত থেকেও আরম্ভ হতে পারে লেখাটা। এইভাবে, " পুজোর ছুটি পড়তে না পড়তেই আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম ঘরের বাইরে। বাবা ঘরকুনো ছিলেন বলে একটা অপবাদ ছিল। আমার ঠাকুর্দাও ছিলেন অনেকটা এরকম। বইয়ের বাইরে জগৎটাকে খুব কমই দেখেছিলেন। অথচ বিশাল বিশাল বইয়ের পাতা জুড়ে লুকিয়ে থাকা অচেনা, অজানা সেই সব জল, জঙ্গল, পাহাড় ও মানুষদের দেখার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। সুযোগ এল যখন প্রায় জোর করে আমাদের গৃহ-চিকিৎসক বাধ্য করলেন ঘরের বাইরে বেরোতে। মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ দিলেন। মনে পড়ে সেদিন একটা নীল ভ্যান এসে আমাদের তুলে নিয়ে গেল এক জঙ্গলের রাস্তায়।"

নীল ভ্যানের কথা মনে পড়তেই তার অনেক কথা মনে এল। রোজ এমন নীল ভ্যানে সে স্কুলে যাতায়াত করত। গাড়ির ভিতর হৈ হট্টোগোল, ধাক্কাধাক্কি, হর্নের শব্দ, স্কুল চত্বরে প্রেয়ার, নির্জন দুপুরে একটানা সাইরেনের আওয়াজ, কালো ব্ল্যাকবোর্ড হেড টীচারের মুখের মতো গম্ভীর হয়ে চশমার ফ্রেমে আটকা পড়ত। টিফিনে তার বরাদ্দ ছিল চার স্লাইজ রুটি, একটা ডিম সিদ্ধ ও কয়েক টুকরো শশা। একে একে প্রত্যেক ভাইবোনকে মা ভর্তি করে দিয়েছিলেন একটা মিশনারি স্কুলে। স্কুলের দিনগুলো কাটত কঠোর নিয়মানুবর্তিতায়। ক্যাম্পাসে উঁচু স্বরে কথা বলতে নিষিদ্ধ ছিল। চার্চের সাথে লাগোয়া স্কুলের পরিবেশটা ছিল থমথমে। দুপুরে সাদা পোষাক পরিহিত নানেরা নিঃশব্দে হেঁটে যেতেন ইউক্যালিপটাসের ছায়ায়, মাথায় থাকত রঙিন ছাতা। ক্লাসের জানলা দিয়ে দূরে দেখা যেত গম্বুজের মতো চার্চের মাথাটা। তার নীচে ঝোলানো বিশাল এক পিতলের ঘণ্টা। ঘণ্টার

উপর গোলাকৃতি একটা কুলুঙ্গিতে কয়েকটা শ্বেত পাথরের পরী উড়তে চাইছে আকাশে। আর তখনই তার মনে হত যে যেন কেমন আট্‌কা পড়ে গেছে এক খাঁচার ভিতর।

স্কুলে নম্বরের দৌড়ে সে সব সময় থাকত পিছিয়ে। বাঘবন্দি খেলার মতো অঙ্কের অসংখ্য সংখ্যার জালে সে যেমন যখন তখন আট্‌কা পড়ত, তেমনই ভূগোলের মানচিত্রে মাকড়সার জালের মতো সরু রেখা ও লাল নীল হলুদ সবুজ রঙের ছোপে অজানা দেশগুলো কোথায় যে হারিয়ে যেত কে জানে। ইতিহাসে সন তারিখের ভুলভুলাইয়ায় পথ হারিয়ে সে চলে যেত এক অবাস্তব, স্বপ্নের জগতে। তার স্মরণশক্তি বরাবরই দুর্বল। আজকের ঘটনা কাল তার মনে থাকে না। শুধু একবার একটা দশ লাইনের কবিতা শুনিয়ে সে সবাইকে চম্‌কে দিয়েছিল। পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'রাজকাহিনী', যা আজও সযত্নে কাচের আলমারিতে রক্ষিত আছে।

একটা সূত্র থেকে আর একটা সূত্র ধরে এগোতে গিয়ে কোথায় যেন সূত্রটা ছিঁড়ে যায়। এন.সি.সির স্যার SKC-র কথা মনে পড়ে। তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি। চালচলন, কথাবার্তা, আদর্শ এবং লেখা থেকে শুরু করে খেলাধূলা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সেদিন। ছাত্রদের ভিতর স্কুলের আনাচেকানাচে তাঁকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনেক গল্প। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের, এই মানুষটা হঠাৎ একদিন 'দুম' করে আত্মহত্যা করে বসলেন। আমাদের সরল ব্যাখ্যায় তাঁর মৃত্যুর রহস্যের কিনারা হল না। তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। একা মানুষটার ঘরে জমা রইল কয়েকটা ট্রাউজার, বুশ শার্ট, একটা নেভি ব্লু কোর্ট, ভেলভেটের টুপি, টেবিলের উপর জমানো একরাশ সিগারেটের খাপ, বাসের টিকিট, স্তূপীকৃত ম্যাগাজিন, খুচরো পয়সা, আধা সিকি এবং একটা ডাইরিতে অসংখ্য স্কেচ গাছপালা, পশুপাখি, মানুষের।

একটা উপন্যাসের চরিত্রের মতো সুকোমলকান্তি চক্রবর্তী বা SKC নামের এই মানুষটি একদিন তার জীবন থেকে উধাও হল। বছর শেষে স্কুলে তোলা একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফে তাঁকে আর চেনা যায় না। কে এই সুকোমলকান্তি, কারা এই সুকোমলকান্তি তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনার ভিতর একের পর এক এসে চলে যায়। সে কাউকে ধরে রাখতে পারে না। নতুন ভেঞ্চার হিসাবে আর এক সুকোমলকান্তিকে সে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। তার সামনে একটা পথ তখন হাজার রাস্তা হয়ে নামের অসংখ্য চোরাগলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সুকোমলকান্তিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রাস্তায় রাস্তায় পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, হাসিমুখ, স্মার্ট মডেল, গাড়ির স্টিয়ারিং, ঘড়ির ব্যান্ড, শার্প কলমের ঝক্‌ঝকে মুখ তাকে যেন ডাকে বারবার। নাক, চোখ, মুখ, চশমার ফাঁকে গোঁফজোড়া সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও সে তেমন আর একজনকে পায় না। তার কাছে সুকোমলকান্তিরা চিরদিনের জন্য অজানা থেকে যায়।

একটা বাড়িতেই প্রায় পনেরোটা বছর তারা কাটিয়ে দিয়েছিল। 'L' শেপের লাল রঙের বাড়িটার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল এক আত্মিক সম্পর্ক। তিন কামরার বাড়িটার ভিতর ছিল লম্বা একটা উঠোন যেটা খেলার মাঠ হিসাবে তারা ব্যবহার করত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল বাড়ির খোলা ছাদটা যেখান থেকে দূরে নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত লোকাল ট্রেন চলছে। ওই ট্রেনের যাতায়াত দিয়ে সে দিনের সময়কে চিহ্নিত করত। ট্রেন ছাড়া সময়কে জানার উপায় ছিল রেডিও প্রোগ্রাম, চটকলের সাইরেন বা চার্চের ঘণ্টা। বাবার অফিসের ছাদে বসানো টিনের মোরগটা দিয়ে বাতাসের গতিপ্রকৃতি বোঝা যেত। মাঝে মাঝেই আকাশ থেকে তারাদের খসে পড়া, দুরন্ত গতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ চলে যাওয়া অথবা আকাশের নির্দিষ্ট কোণে কালপুরুষ বা ধ্রুবতারা দেখতে দেখতে তার বিজ্ঞানের বইয়ে পড়া মহাকাশের চিত্রটা কেমন যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠত। রোজ সন্ধেবেলা পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসত ভারী কণ্ঠস্বরে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু'এক পংক্তি—'আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ...'। আর তখনই মনে পড়ত 'আম্রকুঞ্জে'র কথা, খোলা মঞ্চে যেখানে নিয়মিত অনুষ্ঠান চলত নাচ গান ও নাটকের।

বাবার অফিসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনটার কে এই নামটা দিয়েছিলেন? বোধহয় রবীন্দ্রনাথ। মঞ্চের চারপাশ ঘিরে ছিল অসংখ্য দেশ বিদেশের গাছ। আম, নিম, কদম, বকুল ও এমন চেনা অচেনা অসংখ্য গাছেদের ফাঁকে ফাঁকে রঙ বেরঙের বাহারি পাতার শোভা এবং ফুলের গন্ধে ম' ম' করত চারিধার। ছোট ছোট মেয়েরা পুতুলের মতো নরম হাত পা দুলিয়ে নাচত গলায় মালা পরে। বড়দের নাটক চলত সারারাত। আর প্রায় প্রতি ভোরে এখান থেকে সে লুকিয়ে চুরিয়ে কয়েকটা গোলাপ ছিঁড়ে এনে দিত এক কিশোরীর হাতে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকত একা। পাড়ার যে মেয়েটি সবচেয়ে ভাল ইংরাজি বলত তার প্রতি ছিল এক দুর্বার আকর্ষণ। রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল থামওয়ালা বাড়িটার একেবারে পশ্চিম কোণে দোতলার বারান্দায় মেয়েটি হাওয়া খেতে বার হত মাঝে মাঝে। সেই ক্ষণিকের দেখা। প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে চলে যেত ঘরের প্রতিটি আনাচে কানাচে। কেবল বছরে একবার সে যেতে পারত তাদের বাড়ির ভিতর—রাসযাত্রায়। ঠাকুর দালানে রঙিন নক্‌শাকাটা কাঁচ বসানো খিলান, দুধের মতো সাদা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, ছোট ছোট ঝাড়লণ্ঠন, রুপোর প্রদীপদানীতে আলোর ফুল্‌কি তাকে এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত। পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ালে মনে হত সত্যি নয়, যেন হেমেন মজুমদারের আঁকা একটা ছবি। এঁদো পচা গলির বাড়িটাকে তখন তার অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হত। কখনও বাড়ি পাল্টে অন্যত্র কোথাও যাওয়ার কথা হলে তার ছিল সবচেয়ে আপত্তি।

সে ভাবে এখান থেকেও শুরু করা যেতে পারে লেখাটা। পরিচ্ছেদ 'প্রজাপতি ও তার স্বপ্ন'। কিন্তু যেখান থেকে সে শুরু করবে ভেবেছে সেটাই হল ঘটনার শেষ। পুরনো দিনের স্মৃতি তছ্‌নছ্ করে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক এসে তাদের তুলে নিয়ে গেল একেবারে শহরের শেষপ্রান্তে। বার'শ স্কোয়ার ফিটের এক নতুন ফ্ল্যাট। চোখ ধাঁধানো এই ফ্ল্যাটে প্রথম প্রথম নিজেদের কেমন যেন সিনেমার চরিত্রের মতো মনে হত। সে সাদা টাইলসের উপর, দরজায় পালিশে, ঘষা কাঁচে, গ্রীলের কারুকাজে হাত বুলিয়ে ও রঙের গন্ধে নতুনত্বের অনুভূতিটা বোঝার চেষ্টা করত। ফুলদানিতে প্লাসটিকের রজনীগন্ধা, একজোড়া পরী চিনেমাটির, ক্যালেণ্ডারের পাতায় হারিয়ে যাওয়া নদীর স্মৃতি, দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িটা থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটা পাখি বার হয়ে ডাক দিত।

এখান থেকে তার জীবনটা একটা নতুন মোড় নিল। আগের পরিচয়টা কোথায় হারিয়ে গেল। এবার নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ ও নতুন সব মানুষ। সমাজের শ্রেণীভেদে তারা একধাপ উঠে এল। ইতিমধ্যে তার বাবা দু'একবার ঘুরে এলেন ইউরোপে। আনলেন বেটোভেনের 'নাইনথ সিম্ফনি', পিকাশোর ছবির প্রিন্ট, এনসাইক্লোপেডিয়ার ৩০ খণ্ড, জার্মান নাটক ও ফরাসি কবিতা। তার জন্যে বিশেষ উপহার একটা নক্‌শা করা কাঠের বাক্স যেটার ঢাকনা খুললে বাজনা বেজে উঠত। গোটা বাড়ির আবহাওয়া গেল পাল্টে। এখানে তাদের পরিচয় 'New age Apartment' এর Block-B, Flat-2। পিতলের নেমপ্লেটে বাবা ও মায়ের নাম বসানো হল। উর্দিপরা দারোয়ান গেট খুলে দেয়। মিস্টার দাশগুপ্ত, রায়, নটরাজন বা আগরওয়ালরা ছাদের উপর হাওয়া খান। মিসেসরা উল বোনেন আর তাদের চর্চার বিষয় ছেলেমেয়েদের হোম টাস্ক, ইংলিশ মিডিয়াম ও টিভি। এরই মধ্যে কারও জন্মদিন, কারও বিয়ে, অন্নপ্রাশন, কেউবা মারা যান। সে লেখে, "আমাদের পারিবারিক বন্ধু বলতে মিস্টার সেন যিনি সুন্দর সায়েন্স ফিক্‌শন লিখতেন। ফুল চাষে তার জুড়ি মেলা ভার। পাশের ফ্ল্যাটের অণিমাদি সুন্দর ভজন গাইতেন। 'সি' ব্লকের একটি ছেলে হায়ার সেকেন্ডারিতে সেভেন্থ হয়ে সবাইকে চম্‌কে দিল। সাঁতারে পুরস্কার পেল দশ নম্বরের রীতা। মিস্টার সেনগুপ্তের বাঘের মতো অ্যালসেসিয়ানটা একদিন রাতে হাতেনাতে ধরে ফেলল একজন দাগি আসামিকে। বাবাকে করা হল হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান। তাঁর পরিচয়েই আমার পরিচয়।"

লিখতে লিখতে তার মনে হল নিজের আইডেন্‌টিটিটা প্রায় উহ্য থেকে যাচ্ছে। তা ছাড়া সে ছাদে উঠে এল। তার পুরনো দিনের কথা নতুন করে আবার মনে পড়ল। বিশাল খোলা ছাদে মাদুর পেতে ভাইবোনেরা মিলে বাঘবন্দি খেলা, গলা অব্দি উঠে আসা গাছের ডাল ভেঙে যুদ্ধের মহড়া, উঠোনে বাসন মাজার শব্দ, কপিকলের ঘর্ঘর আওয়াজ, মায়ের চিৎকার, পেটের মতো ফুলে উঠছে রুটি, একফালি চাঁদ আছড়ে পড়েছে কুয়োর জলে, শ্যাওলা জমা মেঝের উপর মৃত্যু যেন সর্বদা একহাত এগিয়ে। সে পুরনো সব কিছুর সঙ্গে নতুন, নতুনের সঙ্গে পুরনো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। এখানে ছাদ থেকে রেলগাড়ি দেখা যায় তবে সেটা স্টীমের নয় ইলেকট্রিকের। আকাশের ছাদ ভরে থাকে অ্যান্টেনা ও কাপড়ের তারে। আর্টিফিসিয়াল গাছ সিঁড়ি-ল্যান্ডিংয়ে, কল থেকে জলপড়ার শব্দ, মিক্সির আওয়াজ, টিভির নয়েজ মিলেমিশে ঝুল বারান্দায় এসে থম্‌কে দাঁড়ায়। সবাই ইংরাজি স্কুলে পড়ে। একটা নয় অজস্র নীল ভ্যান আসে রোজ। মিলের চেয়ে অমিল বড় হয়ে ওঠে। এলোমেলো, অসংলগ্ন, টুকরো অজস্র ঘটনা ও মানুষের ভিতর সে এমন কোনও ছিদ্র খুঁজে পায় না, যেখান থেকে সে অনুসন্ধান করতে পারে লেখাটায়।

সে ভাবে তার এই সাদামাটা জীবনের মধ্যে এমন কী রয়েছে যা অন্যের চোখে বিস্ময়ের হয়ে উঠবে? আত্মজীবনীতে সৌখিন যাত্রাদলের ঝল্‌মলে পোষাক পরিহিত এক রাজার মতো নিজেকে এমন খুঁজে বেড়ানোর প্রচেষ্টাকে তার অত্যন্ত কৃত্রিম ও উদ্ভট মনে হয়। তার চারপাশে সে এমন কোনও ব্যক্তিকেও খুঁজে পায় না যার জীবন অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও মূল্যবান। বংশগৌরব তার নেই। প্রায় দু'শো বছরের এক জরাজীর্ণ সাতপুরুষের ভিটেমাটি তারা ফেলে এসেছে বর্ধমানের এক অখ্যাত গ্রামে যেখানে বছরে বছরে বন্যায় সব ডুবে যায়। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে একটা ঢাল ও তরোয়াল তার ঠার্কুদা বয়ে এনেছিলেন কলকাতার বাড়িতে। তারা না কি সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয়। যুদ্ধবিদ্যা ছিল তাদের পেশা। ইতিহাসের বই ঘেটে সে এমন সব তথ্য জেনেছে বহুদিন আগে। চর্চার বিষয় হিসাবে ইতিহাস হল তার সবচেয়ে প্রিয়। ঠিক কবে থেকে যে সে ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে তা মনে পড়ে না। প্রথম বই পড়েছিল টডের 'হিস্ট্রি অফ রাজস্থান'। তখন থেকে ভ্রমণের ইচ্ছা। ধূ ধূ করা মরুভূমির মধ্যে রাজা মহারাজাদের প্যালেস আর কেল্লা। উটের মাথার ফাঁক দিয়ে সূর্য ডোবে, জলের মতো ঢেউ ওঠে বালুস্তরে—এ চিত্রটা বহু ক্যালেন্ডারের পাতায় তার দেখা। মনে মনে এর থেকে একটা ছবি সে স্বচ্ছন্দে এঁকে নিতে পারে। হয়ত বা এরই সঙ্গে তার ক্ষীণ যোগসূত্রতার কথা ভেবে সে মৃদু গর্বও অনুভব করে। ঠার্কুদার মুখে শোনা তারা না কি মান সিংহের বংশধর।

পড়া ছাড়া ভ্রমণ ছিল তার সবচেয়ে বড় নেশা। হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে হারিয়ে যাওয়া জঙ্গলে, পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে। জলের সূত্র ধরে নদীর উৎস খুজে ফেরা অথবা মাইলের পর মাইল আস্তানার খোঁজে হেঁটে চলা। তার এই খামখেয়ালি স্বভাবটাকে কেউ পাল্টাতে পারেনি আজও। মা

বলতেন, 'ঘরমুখী হ' খোকা, আর কতদিন এভাবে কাটাবি?' ঘরমুখী হওয়া তার কপালে নেই। সবকিছু এলোমেলো, ছন্নছাড়া। কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। ফিজিক্স পড়তে পড়তে চলে গেল ইতিহাসে; সেতারটা মাঝপথে ছেড়ে দিল; গালিবের অনুবাদটা অসমাপ্ত; অসংখ্য টুকরো পাতায় অঙ্ক ও কবিতার কয়েকছত্র; সখের গোলাপগুলো শুকিয়ে গেল জলের অভাবে, হাঁ করে খোলা পড়ে আছে পায়াভাঙা ড্রয়ার, ছেঁড়াফাটা জ্যাকেট প্যান্টগুলো ঝুলতে থাকে ফাঁস দেওয়া সারিসারি মৃতদেহের মতো। তার বুক পকেট ভর্তি অজস্র কাগজের টুকরোয় কিছু সংখ্যা, শব্দ, নাম ও ঠিকানা লেখা। কোনওটারই প্রসঙ্গ সে মনে করতে পারে না এই মুহূর্তে। এমন ভুলে যাওয়া তার এক অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। না কি সে স্বেচ্ছাকৃত ভুলে যেতে চায় সবকিছু যা তার অপছন্দের। এতদিনে সে খুব সহজেই ভুলে গেছে দৈনন্দিন জীবনে ভিড় করে আসা অসংখ্য মানুষ বা ঘটনাকে যা তাকে দুমড়েমুচড়ে দিয়েছে ভিতরে ভিতরে। স্মৃতি হাতড়ে অথবা স্বপ্নের ভিতর কারও সঙ্গে দেখা হয় যাকে সে চিনেও চিনতে পারে না। টুকরো টুকরো কাঁচের মতো ভাঙা ঘটনা, ভাঙা চরিত্র, ভাঙা আবেগ ও অনুভূতি মনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়। সবই যেন সঙ্গতিবিহীন, অনির্দিষ্ট ও অসমাপ্ত।

পাশের ঘর থেকে এফ.এম. চ্যানেলে ভেসে আসছিল 'পুরানো সে দিনের কথা...'। কেমন এক নস্টালজিয়ায় সে ভুগতে থাকে। পুরনো অনেক কিছুই সে ছাড়তে পারেনি,— পুরনো অভ্যাস, পুরনো সম্পর্ক, পুরনো চিঠিপত্র, ডাইরি, ম্যাগাজিন, অকেজো কলম, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি। অ্যান্টিকের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ। শেষ জন্মদিনে দিদিমা তাকে উপহার দিয়েছিল ভিক্টোরিয়ার আমলের রুপোর এক কলমদানি।

অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে অতীত, একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা, কোনও এক মুহূর্তের একটি শব্দ, চিত্র বা গন্ধ তাকে সুড়ঙ্গের মতো একবার ভিতর থেকে বাইরে, বাইরে থেকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। এখান থেকে সে বেরোতে পারে না। একই বৃত্তের চারপাশে সে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো মস্ত একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ — বাবা, মা, ভাইবোনদের নিয়ে একটা গোটা পারিবারিক চিত্র। সে ভাবল এখান থেকেও লিখতে পারে আত্মজীবনীটা। তাদের পরিবারের উত্থানপতন ও সুখ-দুঃখের কাহিনী,— সেজ ভাইয়ের বিদেশ যাত্রা, বোনের বিয়ে, মায়ের কঠিন অসুখ, গ্রামের সম্পত্তি বেচে দেওয়া ইত্যাদি অথবা সেই সব পুরনো দিনের কথা বা ছড়ানোছেটানো ঘরের কোণে একটা গোল টেবিল, বেতের ইজি চেয়ার, দু'পাল্লার ড্রেসিং টেবিল, রঙচটা সিলিং ফ্যান, হ্যাঙ্গারে ঝোলানো দাদামশাইয়ের ওভারকোট, দিদিমার হাতে বানানো কুরুশের টেবিলক্লথ। বিশাল ট্রাঙ্কের ভিতর অজস্র টুকিটাকি — মরচে ধরা টর্চ থেকে তামার ফুটো পয়সা পর্যন্ত।

সে ভাবে, নতুন করে এই ভাবে শুরু করা যেতে পারে লেখাটা — "আমাদের বাড়ির বদনাম ছিল আড্ডা ও চায়ের নেশার জন্যে। প্রতিদিনই প্রায় খাবার টেবিলে কিছু না কিছু নিয়ে শুরু হয়ে যেত তর্ক, রাজনীতি থেকে খেলা পর্যন্ত। চিৎকার, চেঁচামেচি, প্রায় খণ্ডযুদ্ধ। এই উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে জন্ম নিয়েছিল আমাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা — বাবার যতিহীন উপন্যাস, বড়দার নতুন মঞ্চ পরিকল্পনা, ছোটদার ছবিতে নারী ও বৃক্ষের উপমা ও আমার কবিতায় কেবলই বিষাদের ছায়া। ছুটির দিন ছাদের উপর চলত খালি গলায় গান, কবিতা পাঠ, বেহালা বাজাত পাশের বাড়ির একটি ছেলে। তারই করুণ সুর গভীর রাত অবধি ছড়িয়ে থাকত বাড়ির চারপাশে, মানিপ্ল্যান্টের পাতায়, নীল ফুলে, কাঁচের শার্সিতে, ঘরের পর্দায়, বিছানা, বালিশ, অ্যাসট্রে ও সিগারেটের ধোঁয়া। মা জানলার সামনে বসে আঁচলে চোখ মুছতেন। যেন সেই মুহূর্তে পেতাম জীবনের অন্য একটা মানে"। পূর্বদিকের জানলায় চোখ পড়তেই সে দেখে এককোণে পুরনো গীটারটা ঠেস দিয়ে রাখা, ধুলো জমেছে বহুদিন। দূর সম্পর্কের এক কাকা তার মাকে এনে দিয়েছিলেন বিদেশ থেকে। কয়েক মাস শেখার পর মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সব সময় অবসাদ পেয়ে বসত তাঁকে। সেই থেকে আজ অব্দি সেটা কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। পাশে শোকেসে বাবার বিদেশযাত্রার ছবি, একটা রকেটের মডেল, জাঁ পল সার্ত্রের 'এজ অফ রিজন', বেশ কয়েকটা জীবনমুখী গানের ক্যাসেট ও আরও কিছু। বিশাল দেওয়াল জুড়ে টাঙানো ২০" × ২০" ছবির একটা প্রিন্ট — এক মৎস্যকন্যা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল হাতে।

মৎস্যকন্যাটির মুখের সঙ্গে সে তার বিগত জীবনের নারীদের মুখের মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। এইসব নারীরা এক একসময় এসেছে তার জীবনে, আবার চলে গেছে। ভালবাসা কি সে আজও জানে না। তবু এই নারীরা কেন বারবার ফিরে এসেছে? সে ভাবে। একটি সিরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান মেয়ে, একজন ফটোগ্রাফার, একজন পড়তি রাজপরিবার থেকে আসা এবং একজন নিজেকে ধ্বংস করতে গিয়ে ফিরে এসেছে নতুন আশ্রয়ের আশায়। এইসব নারীদের কৌতূহলোদ্দীপক জীবনকাহিনী নিয়েও সে লিখতে পারে তার আত্মজীবনীর আকর্ষণীয় অধ্যায়। কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে না। কোথায় যেন অনুপ্রেরণার অভাব অনুভব করে। প্রসঙ্গত তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। যাকে লেখা অসংখ্য চিঠির মধ্যে ওই সব অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত গঙ্গার ঘাটে। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিত

ঘাসের উপর শুয়ে। গান গাইত আপন মনে। খোলামেলা, হঠকারি, স্পর্শকাতর, সম্পূর্ণ তার বিপরীত চরিত্রের এই ব্যক্তিটির সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল সূত্রটি কোথায় সে আজও জানে না। ঝড়ের মতো এল, আবার চলে গেল। শেষ দেখা বছর দশেক আগে দার্জিলিঙয়ের ম্যালে। দূরবীণে চোখ লাগিয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছিল পাহাড়ের, পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট, বুশশার্ট, লালকালো ডোরাকাটা পুলওভার ও মাথায় ফারের টুপি। এতটুকু পাল্টায়নি, — ধারালো, স্মার্ট, ঝকঝকে কথাবার্তা। তারই কবিতার কয়েকটা লাইন শুনিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, আজও খুঁজে পেল না সে।

এমনভাবে হঠাৎ কেউ আসে। আবার হারিয়ে যায়। ছোট ছোট ঘটনা মনের ভিতর দানা বাঁধে। টুকিটাকি এইসব সে লিখে রাখে ডাইরির পাতায়। বিশেষ ঘটানগুলো লালকালিতে লেখা — কারও জন্মের, বিবাহের বা মৃত্যুর দিন। সময়মতো সে পাঠিয়ে দেয় তার শুভেচ্ছা বা শোকবার্তা। আর জানিয়ে দেয় সে এখনও বেঁচে আছে।

বেঁচে থাকার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তার জানা নেই। যে যেমন যেখানে, সেই ভাবে কেটে যায়। ছোট্ট একটা ঘরের ভিতর নিজের অস্তিত্বকে জানানোর জন্যে ঘরের বস্তুকে সে মাঝে মাঝে পাল্টে দেয় — ঘরের রঙ, পর্দা, চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি পর্যন্ত। একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্যে নতুন নতুন ছবি দেওয়ালে টাঙায়। গান শোনা ও ফটো তোলা ইদানীং তার হবি। ভোর না হতেই বিশাল ক্যামেরাটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায়। রোজই যেন নতুন করে আবিষ্কার করে তার শহর ও মানুষদের। ছবি তোলার এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়েও হয়ত লেখা যেতে পারে আত্মজীবনীর এক নতুন অধ্যায়। তার প্রথম ছবি তোলা নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের দিন। দৃশ্যটা ছিল এরকম — "এমন খুশির দিনে সবাই জড়ো হতে লাগল একে একে। বড় পিসি এল গ্রাম থেকে এক বস্তা মাছ নিয়ে। দিল্লির মাসি মেয়েটাকে পুতুলের মতো সাজিয়ে এ ঘর ও ঘর করতে লাগল। সেজদা বাজার থেকে কিনে আনল সেতার ও সানাইয়ের যুগলবন্দি। মায়ের জমানো জাজিম পাতা হল বহুদিন পর। সারা ঘরে নেপথলিনের গন্ধ। শো কেসের মাথায় বাবামার বিয়ের ছবি। নতুন পর্দায় গোলাপের আভা। মাথার উপর ছোট্ট ঝাড়লণ্ঠন, আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে চারধারে। মা ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন ইজিচেয়ারে। ক্যামেরায় একটার পর একটা ছবি উঠে আসছে — সবার চালচলন, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা। ঘরের কোনে আবছা অন্ধকারে দরজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী নিশ্চল পাথরের মতো।"

এই মেয়েটিকে এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া এনে দিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে কাজের জন্য। মা প্রায় নিজের মেয়ের মতো তাকে মানুষ করেছিলেন। নিজের হাতে চান করানো থেকে শুরু করে মাথার ফিতে বেঁধে দেওয়া ও চুল আঁচড়ানো পর্যন্ত। তাকে পড়াশোনা শেখানো, নতুন নতুন ফ্রক ও তার শখ আহ্লাদের জিনিস কিনে দেওয়া ছিল মায়ের একটা অতিরিক্ত কাজ। সবচেয়ে আশ্চর্যের, এমন সবকিছুর পরেও মেয়েটি একদিন উধাও হল বাড়ি থেকে। থানা পুলিশ করেও মিলল না তাকে। একদিন নিজেই হাজির হল মাথায় সিঁদুর হাতে শাঁখা, হলুদ ডুরেকাটা শাড়ি পরে। মাকে শোনাল তার জীবনের আর এক গল্প। মায়ের চোখ ভরে উঠল জলে। সে ভাবল এটাও কি তার আত্মজীবনীর অংশ। লিখতে লিখতে মনে হল নিজের প্রসঙ্গটা খুব ছোট ও অন্যেরটা বড় হয়ে উঠছে। একটার পর একটা দৃশ্য মিশে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র যেন কখনও ক্লোজ আপে, কখনও লঙ শটে। কখনওবা ধরা মনতাজে ফিল্মের মতো। তার জীবনের একটা পর্বকে নিয়ে সে এক সময় ফিল্ম করার কথাও ভেবেছে। সে কাহিনীটা লিখব লিখব করেও লেখা হয়ে ওঠেনি। শুরুটা ভেবেছে নায়কের রহস্যজনক মৃত্যু দিয়ে। ভোররাতে রাস্তা থেকে এক যুবকের বেওয়ারিশ লাশ তুলে নিয়ে এল পুলিশ হাসপাতালে। তারপর চলবে মৃতদেহ সনাক্তকরণের অনুসন্ধান।

সামনের আলমারি থেকে সে নীরদ সি. চৌধুরীর লেখা 'অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' বইটা বার করে আনে। দু'চার পাতা উল্টে আবার বন্ধ করে দেয়। বাংলাভাষার প্রতি তীব্র ভালবাসা তাকে এখনও বাঙালি করে রেখেছে। নিজেকে এতটুকুও পাল্টাতে পারেনি আজও। খাবার টেবিলে কাঁটা চামচ ঠিক ধরতে ভুলে যায়; টাইয়ের নট বাঁধতে গেলে বড়-ছোট হয়ে যায় কিংবা ইংরাজি উচ্চারণে ভুল থেকে যায় বহু। পার্টিতে, ক্লাবে, সোস্যাল গ্যাদারিং-এ একেবারেই সে খাপছাড়া। বেমানান। অথচ সে অনেক কিছুই করতে চেয়েছিল। কিছুই হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। কলেজে ইউনিয়ন করতে করতে ছেড়ে দিল। দুই বন্ধু মিলে বার করল পত্রিকা; পয়সার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। শুরু করল সাংবাদিকতা। সেখান থেকে বিজ্ঞাপন সংস্থার কপি লেখা। কিছুদিন মঞ্চ পরিকল্পনা করল অপেশাদার নাটকে। শেষ পর্যন্ত দশটা পাঁচটার সরকারি চাকুরে।

এরই মধ্যে যে-ঘটনাটা তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিল তা হল বাবার আকস্মিক মৃত্যু। সংসারের সব দায়দায়িত্ব এসে পড়ল তার ঘাড়ে। মা বিছানায় চিরদিনের জন্যে শয্যাশায়ী হলেন। এবার ঘটনাগুলো ঘটতে থাকল সম্পূর্ণ অন্যরকম, যেমন সে ভেবেছিল তেমন নয়। সে ভাবল এইখানে শেষ করা যেতে পারে আত্মজীবনীটা অথবা নতুন করে শুরু করা যেতে পারে পুনরায়। সে দেখে রঙচটা, বিবর্ণ, সাদা দেওয়াল জুড়ে ঝুলছে ল্যামিনেশন করা বাবার এক মস্ত ফটোগ্রাফ। মুখে তাঁর মৃদু হাসি, গভীর প্রশান্তিতে ভরা। □

মানুষের বরাত

চুনীলাল রায়

মিন্টুদা পারত না। অনেক চেষ্টা করত। কিন্তু হাতের কাছে সলিউসন থাকত না। থাকলেও ফুটবলের ব্লাডারে এত লিক্ বের হত যে সব সারিয়ে ফুটবলে হাওয়া ভরে খেলতে খেলতে মাঠে নামতে নামতেই বিকাল পেরিয়ে সন্ধে হয়ে যাবার জোগাড় হত। এসব ঘটনা যে কেবল একদিন হত তাই নয়। প্রায়ই হত। তখনকার দিনের ফুটবল খেলাটা এখনকার দিনের মতো এত সহজ আর সুবিধার ছিল না। তার ওপর ফুটবলের চামড়া কাটত। সারাতে যেতে হত এক মাইল দূরে। এ সব নিয়ে অনেকেই মিন্টুদার ওপর রাগ করত। গালমন্দ করত।

আমি কিন্তু কখনওই করতাম না। বরঞ্চ আমি আর জয়নাল চোখে চোখে কথা বলতাম। খেলা হবে না জানতে পারলে অন্যরা যখন সরে পড়ত গজগজ করতে করতে আবার কেউবা মাঠে বসে ঘাসের গোড়া তুলে চিবুত আমরা দুই বন্ধু তখন চট্‌পট আমাদের সাইকেল বের করে উড়ে যেতাম নিজেদের খেয়ালখুশির জগতে। কাছে পিঠেই ঘুরতাম আমরা। কখনও যেতাম বাঁশদ্রোণীঘাট ব্রহ্মপুর আবার কখনও বা উল্টোদিকের বৈষ্ণবঘাটা রথতলা হয়ে গড়িয়া। তবে যদি শনিবার কোনও কারণে খেলতে না পারতাম আমরা চলে যেতাম অনেক অ-নে-ক দূর। গড়িয়া মেইন রোড প্রতাপগড় হয়ে আমরা পৌঁছে যেতাম কামালগাজীর মাজারে।

আসলে কামালগাজীর মাজারের পূবদিকে কুমড়োখালিতে ছিল জয়নালের ফুপি মানে পিসির বাড়ি। আয়েশা বিবি জয়নালকে খুব ভালবাসতেন। আর আমি জয়নালের বন্ধু বলে আমারও আদর কম ছিল না। ফুপি আমাদের কোনও দিন ফিরনি খাওয়াতেন আবার কোনও দিনওবা দিতেন সেমাইয়ের পায়েস। আর সময় পেলে মুরগির ডিম মুরগির মাংস দিয়ে গরম গরম ভাত খেতে দিতেন। তা দেবেনই বা না কেন পিসি? একে তো জয়নাল তাঁর ছোট ভায়ের একমাত্র ছেলে তার ওপর তার স্বামী জনাব আলি হোসেন ও তল্লাটের একজন গণ্যমান্য ধনী লোক। তাঁর কাছে দশটা লোকের আনাগোনা।

হোসেন সাহেবও আমাকে পছন্দ করতেন। আমার পড়াশোনার কথা, বাড়িতে ভাইবোনদের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। ওঁকে আমার বেশ ভাল লাগত। ওঁকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধাও করতাম। তাই মিন্টুদা যখন আমাদের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করতে পারত না তখন অন্য সবাই রাগ করলেও আমি আর জয়নাল খুব খুশিই হতাম। যাক্ পিসির কাছে গিয়ে আবার ফিরনি খাওয়া যাবে। হোসেন সাহেব আর আয়েশা বিবিও আমাদের সাইকেলের ঘন্টি শুনে খুব আনন্দ পেতেন। আমরা খুব জোরে জোরে কথা বলতাম। ওঁদের বিরাট বাড়িটা আবারও যেন জেগে উঠত। কেননা তখনই তো ওঁদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। থাকে তারা দিল্লিতে। একমাত্র ছেলে রয়েছে মার্চেন্ট নেভিতে। থার্ড ইনজিনিয়ার। আমরা গেলে তাই সেই নিষ্প্রাণ বাড়ি যেন প্রাণ ফিরে পেত।

কিন্তু মিন্টুদার উপর আমি মাঝে মধ্যে রাগ করতাম। বলতাম যেদিন খেলার ব্যবস্থা করতে পারবে না আগে থেকে জানাতে পারবে না? আমার কথা শুনে মিন্টুদা আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতেন। শেষে বলতেন তা কি করে হবে? আমি শেষ চেষ্টা করব না? সবাই চাঁদা দেয়। কিন্তু খেলা হবে না আগে থেকে জানতে পারলে আমার কত সুবিধা হয় জান?

মিন্টুদা আমার কথা শুনে তবুও হাঁ করে থাকেন। তখন আমি বাধ্য হয়েই বলি, বুঝলে, ওইসব তুমি বুঝবে না। তবে জানো খবরটা আগে থেকে পেলে আমি আরও ভাল করে কুসম্বু কন্দপপুর বোয়ালিয়া করতাবাদ ঘুরে দেখতে পারি। কাদের সর্দার হায়দার মণ্ডলের বাড়িতে যেতে পারি। কোরবানদা

আবদুলদা বা রিয়াজউদ্দিন মোল্লা সাহেবের সঙ্গে ওঁদের কুমড়োখালি মৌজাটা ঘুরে ফিরে দেখতে পারি।

মিন্টুদা আমার কথা শুনে বল সারাতে সারাতে লাফ দিয়ে ওঠেন। বলেন, যা আজই চলে যা। আজ বল সারাব না। খেলা হবে না। আর ঠিক এইভাবেই আমার স্কুল জীবনে কুমড়োখালির সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বন্ধুত্ব আর শ্রদ্ধা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আয়েশা ফুপি আর হোসেন ফুপার সঙ্গে।

আসলে আয়েশা বিবি আর হোসেন সাহেব ছিলেন মেড ফর ইচ আদার। ওঁরা যে দু'জন দু'জনকে ভালবাসতেন ওই ছোট বয়সেই তা খুব বুঝতে পারতাম। মনে হত ওরা বোধহয় কেউ কাউকে ছেড়ে কোনও দিন কোথাও যাননি আর কোথায়ও হয়ত যাবেনও না। নাহলে পিসির বাপের বাড়ি এত কাছে কই সেখানেও তো এক বেলার জন্য বেড়াতে আসেন না? পিসেমশাই বোধহয় আসতে দেন না।

কিন্তু যাক্ ওইসব কথা। ওই দিয়ে আমার দরকার কি? আমি তো কারবালা মাঠে যাব লাঠি খেলা ছোরা খেলা দেখতে। তাজিয়া দেখব। পিসি আর পিসেমশাই-র সঙ্গে গল্প করব। ও মহল্লায় একটু আড্ডা মারব। খাওয়া দাওয়া করব। তারপর এক সময় বাড়ি ফিরে আসব।

জয়নাল কখনওসখনও বাদ পড়ত কুমড়োখালি অভিযানে। আমি একাই যেতাম। কে তখন বলবে যে আমি ও বাড়ির একজন ছেলে নই? হিঁদুর ছেলে। তবে ঈদের সময় জয়নাল অবশ্যই যেত। ওর মা বাবা ভাই বোনরাও যেত। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও নতুন জামাকাপড় পেতাম। আর পেতাম হালিম খেতে। আমাদের বাড়িতে এ খাবারটা হত না। আমি তাই খেতে খেতে অবাক হয়ে তাকাতাম আয়েশা ফুপির মুখের দিকে। পিসি হয়ত বুঝতে পারতেন না। কিন্তু হোসেন সাহেব আমার চোখের ভাষা পড়তে পারতেন। হেসে গিন্নিকে বলতেন হালিম রান্নার কায়দাকানুন ওকে বলে দাও। বাড়িতে করে খেতে পারবে।

আয়েশা পিসি কপট রাগ করে বলতেন, ওমা সে কী কথা। বাড়িতে করে খাবে মানে? আমি তবে আছি কি করতে? এ কথার জবাব দিতে পারেন না হোসেন সাহেব। ওখান থেকে পালিয়ে বাঁচেন। হোসেন সাহেব চলে যেতেই পিসি আমাকে বলেন বুঝলে এ রান্না এমন কিছু নয়। মাংসের টুকরো গমের টুকরো ছোলা বা অড়হরের ডাল বাটা একটু মাখন দিয়ে কষা আর শেষে পেয়াজ আদার কুচি পুদিনা পাতা কুচি কুচি করে কেটে ছড়িয়ে দেওয়া। ব্যাস হয়ে গেল হালিম তৈরি।

কথা শেষ করে ফুপি হাসেন। আর আমিও হাসি। বুঝতে পারি যে উনি চান না আমি অন্য কোথাও হালিম খাই। খেতে ইচ্ছে হলে যেন ওঁর কাছেই বারবার ফিরে আসি।

সত্যি কথা বলতে কী ওঁদের স্নেহের আকর্ষণেই আমি বারবার কুমড়োখালিতে গিয়েছি। স্কুল জীবনে জয়নালের সঙ্গে গিয়েছি। কলেজজীবনেও। জয়নাল না গেলে আমি একাই চলে গিয়েছি। দিন গিয়েছে। বছর গড়িয়ে গিয়েছে। হোসেন সাহেব ছেলের টাকার প্রত্যাশা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। তিনি নিজে একের পর এক তাঁর সম্পত্তি বাড়িয়ে গিয়েছেন। ওঁর বাপ ঠাকুর্দার আমলের বাড়ি ছিল পুকুর ছিল আম বাগান ছিল। সেই সঙ্গে তিনি বাড়ির লাগোয়া জমিতেই ধান ভানাই কল করাতকল বসালেন। সারাদিন পরিশ্রম করতেন।

আমি কত সময় দেখেছি আয়েশা পিসি কত রাগ করছেন। বলছেন নিজের শরীরটা তো দেখবে। ছেলে বিয়ে করে বাইরে। মেয়ে জামাইও কাছে নেই। তবে এ সব খাবে কে? হোসেন সাহেব একগাল হেসে বলতেন আরে এ দুনিয়ায় খাবার লোকের অভাব? ওইসব নিয়ে তুমি ভেব না। শরীরটার দিকে একটু নজর দাও।

হোসেন সাহেবের কথায় আমি পিসির দিকে তাকাতাম। বুঝতে পারতাম পিসির বয়স হচ্ছে। ওঁকে আর সব সময় এসে এমন বিরক্ত করা ঠিক নয়। পিসির কটা কাজের লোক থাকলেও আমাদের জন্য রান্না করা খেতে দেওয়ার সব কাজ উনি নিজ হাতেই করেন।

আমি তাই ধীরে ধীরে কুমড়োখালি যাওয়া কমিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু পিসি রাগ করলেন। বললেন তোমার পিসেমশাই তোমার খোঁজ করছিলেন। তুমি অনেকদিন আসছ না। আমি বললাম, না পিসি। এটা ঠিক কথা নয়। পরশুই আমি এসেছি। তাছাড়া এখন একটু আধটু চাকরির চেষ্টা করতে হচ্ছে। এই দেখুন না জয়নাল তো চাকরি পেয়ে জয়পুরে চলে গেল। আমার কথা শুনে পিসি, বললেন বুঝলাম। তুমিও চলে যেতে চাইবে। পিসির আদর কমে গিয়েছে। কিন্তু উনি বড় দুঃখ পাবেন। দেখছ তো ওঁকে এতদিন। আমি পিসির কথার জবার দিতে পারি না। চুপ করে থাকি।

কিন্তু কপাল মন্দ। আমিও বাইরেই এক চাকরি পাই। চলে যাই রাঁচিতে।

রাঁচির ক্লাব রোডের এক বাড়িতে ভাড়া থাকি। অফিস আর বাড়ি করা ছাড়াও মাঝে মধ্যে যাই বর্ধমান কম্পাউন্ডে আড্ডা মারতে। তাছাড়া কোনও নতুন বন্ধুর পাল্লায় পড়লে তো কথাই নেই। রাঁচি শহরটা কেবল ঘুরে দেখাই নয় তার নামী বিখ্যাত হিলস্ ফলস্ সব দেখে জেনে বুঝে নিতে হবে। চলে যেতে হবে দূরের রামগড় ক্যানটনমেন্ট দেখতে। যেতে হবে ভুরকুণ্ডা, পতরাতু, খেলাড়ি বা ম্যাকল্যাকসিগঞ্জেও।

এভাবে একদিন দেখতে পাই বুঝতেও পারি যে কলকাতা টালিগঞ্জ নাকতলা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বাঁচি এসে জাঁকিয়ে বসেছে তার জায়গায়। কিন্তু বাড়ি এসেছিলাম ক'দিনের ছুটিতে। বাবার অসুখ। তখনই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল জয়নালের সঙ্গে। বলল, আয়েশা ফুপি তোর কথা বলছিলেন। তুই অনেকদিন যাস্ না। আমি কালই গেছিলাম। জয়নাল আর কথা বলে না। চুপ করে যায়। আমি অবাক হয়ে বলি, কি রে? আর কোনও খবর আছে? পিসি পিসেমশাই ভাল আছেন তো? দেখছিস্ তো বাবাকে নিয়ে। ভাবছি কালই যাব কুমড়োখালি। পিসির হাতের ফিরনি খেতে হবে।

জয়নাল বলে, তবে তোর আর যাবার দরকার নেই।

— কেন? পিসি কি আমাকে ফিরনি খাওয়াবেন না? আমি জানতে চাই।

আমার কথার জবাব দিতে পারে না জয়নাল। চুপ করে থাকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে দেয়। আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। বলি, আচ্ছা। থাক্ তবে। যাব না। কিন্তু ব্যাপারটা কি? বলবি তো?

— পিসি হঠাৎই বাথরুমে পড়ে যান। ডাক্তাররা ওঁকে কোনও রকম কাজ করতে মানা করে দিয়েছেন। স্ট্রোক। মাইল্ড। — রান্না? পিসেমশাই তো অন্য কারও হাতে খান না। — ওই তো হয়েছিল এক মুশকিল। পিসেমশাই শুকনো খাবার খেয়ে থাকতেন। ফুপি একদিন খুব কান্নাকাটি করলেন। তখন ফুপির দেখাশোনা আর সেবাযত্ন করার জন্যে ফুপা ভদ্রঘরের এক অল্প বয়সী মেয়েকে আনলেন। সেই এখন ফুপিকে দেখে, সেবাযত্ন করে, ঘরদোর সামলায়। আর পিসি বসে থেকে তদারক করে তাকে দিয়েই ফুপার রান্না করান। তুই খেতে চাইলে ফুপিকে আবার উঠতে হবে।

জয়নালের কাছে আয়েশা পিসির কথা শুনে আমিও হাহাকার করে উঠি। কতদিন কতসময় পিসিকে কত আবদারই না করেছি। হায় তাঁর জীবনে আজ এ কি ঘটল?

আমি বলি, আচ্ছা জয়নাল, পিসির বয়স কত হল এখন?

জয়নাল একটু ভেবে নিয়ে বলে, কত আর হবে? ষাট পয়ষট্টি হবে। ফুপি তো ফুপার থেকে দশ বছরের ছোট। সেই হিসাব করেই বললাম। আমি তখন বললাম, ঠিক আছে। তুই যখন বলছিস্ তখন আর কিছু খেতে চাইব না। কিন্তু পিসিকে সময় করে দেখে আসব। ঠিক সেইরকম হিসাব করে আমি কুমড়োখালিতে হাজির হলাম। আমাকে দেখে হোসেন সাহেব হই হই করে উঠলেন। আমি ওঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। উনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, ও ঘরে যাও। পিসি আছেন।

আয়েশা পিসির খাটে গিয়ে বসলাম। উনি আমার কপালে হাত রাখলেন। বললেন আমি শুনেছি তোর কথা। পারলে মাঝে মধ্যে আসিস। তোর পিসেমশাই আনন্দ পাবেন। আমি তো ওঁর জন্যে এখন আর কিছু করতেই পারি না। উনিই আমার জন্যে সব কিছু করছেন। আমি ঘাড় নেড়ে বলি, পিসি, আপনি ভাল থাকুন। ডাক্তাররা বলেছেন একটু বিশ্রাম নিলেই এসব রোগ সেরে যায়। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপনি আবার পিসেমশাই-র সেবাযত্ন করতে পারবেন।

আমার কথা শুনে আয়েশা পিসিমার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওঁর চোখের কোণে জল আসে। তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্যে বলি, পিসি আজ আমি তবে যাই। আমার কথা শুনে পিসি বলেন, এ কি কথা? যাবি মানে? তোর পিসেমশাই মুরগি কাটতে বললেন। আর তুই পিসির হাতের রান্না না খেয়েই চলে যাবি? জয়নালের কথা আমার মনে পড়ে। আমি বলি, পিসি আজ আমার একটু তাড়া আছে। এখন যাই। পরে আবার আসব। পিসি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান। পরে বলেন, সত্যিই যাবি? আচ্ছা তবে একটু ফিরনি খেয়ে যা। তোর পিসের জন্যে করিয়েছি।

আমি পিসির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই। উনি আমাকে আর কথা বলার সুযোগ দেন না। ডাকেন, মিলি, মিলি। এদিকে এসো। একে একটু ফিরনি দাও। আর একে একটু চিনে রাখ। আমি না থাকলেও ওর যেন আদরযত্ন কম না হয় এ বাড়িতে। দেখো। আমি মিলিকে দেখি। বছর তিরিশের মেয়ে। হয়ত অভাবি ঘরের। তাই এখনও বিয়ে হয়নি। এখন এ বাড়িতে বেশ আনন্দেই আছে। মিলি আমাকে সালাম দেয়। আমিও হাত তুলি। ফিরনি খাওয়ার সময়ই হোসেন সাহেব এসে হাজির। বললেন, কি? পিসিকে কেমন দেখলে? ভাল তো?

আমি ওঁর কথার জবাবে হেসে ঘাড় নেড়ে জানাই, ভাল। হোসেন সাহেবও খাবার জন্য বলেন। কিন্তু আমি যে পিসিকে আগেই না করেছি। এখন হ্যাঁ বলি কি করে?

সারাটা পথ আমি ওঁদের কথাই চিন্তা করি। কিন্তু আমার ছুটি শেষ। তাই আবার ফিরে যাই কর্মস্থলে। আবার শুরু হয় সেই পুরনো কটিন। পুরনো জীবন। হারিয়ে যায় টালিগঞ্জ নাকতলা কুমড়োখালি। হাহাকার করে তারা। কিন্তু হেসে দেয় বাঁচির জীবন। তরতর করে দিন মাস বছর গড়িয়ে যায়। আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। প্রথম, বাবা মারা যাওয়া। আমার বিয়ে করা। তৃতীয়ত, আমার মা মারা যাওয়া। ভালবেসে বিয়ে করা। দাদাদের সঙ্গে বাড়ির ভাগ নিয়ে গণ্ডগোল। আর আপাতত শেষ খবর স্কুলজীবনের বন্ধু বাবু দত্তর উৎসাহে কলকাতার কাছেপিঠে কোথাও জমি কেনা

যায় কি না তারই খোঁজ করা। কেননা আমার নেকস্ট প্রোমোশনে কলকাতায় পোস্টিং।

আমরা কলকাতায় এসে নিজেদের বাড়িতেই উঠি। ছেলেকে নরেন্দ্রপুরের নিচু ক্লাসেই ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। আর আমার কাজ হল কাছেপিঠের বাড়ি জমি দেখে বেড়ানো। বাবুর সঙ্গে রাজারহাট থেকে শুরু করে সাঁকরাইল কোনও জায়গাই বাদ দেইনি। কিন্তু কোথাও পছন্দসই হয় না।

শেষে বাবু-ই বলল, চল না দাম যদিও একটু বেশি চাইছে কিন্তু বাইপাসের কাছে পিঠেই। দালাল ছেলেটা ভাল। অনেক খবর রাখে। হবিনাভি সোনারপুর। তাছাড়া কামালগাজীর ওখান থেকে বাইপাস বের হয়ে সোজা চলে যাবে আমতলা। ডায়মন্ডহারবার রোড।

বাবু আরও অনেক কথা বলে চলে। আমার কানে কিছু ঢোকে না। শুধু কানে বাজে কামালগাজী।

সেই কামালগাজীর মাজার। কুমড়োখালি। আয়েশা পিসি। হোসেন পিসেমশাই। আর ওই মেয়েটা। কি যেন নাম তার? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। মিলি। মিলিই তো নাম। জানি না আজ এখন এতদিন পরে কে কেমন আছেন?

আমাদের জমি দেখা শেষ হয় রাজপুরের রথতলায় এসে। বাবু আরও দেখতে চাইছিল। আমি রাজি হলাম না। কেননা আমাকে কুমড়োখালি যেতে হবে। আমি আয়েশা পিসির বাড়িতে এসে হাজির হই। ডাকি, পিসি। হোসেন সাহেব। পিসেমশাই। কিন্তু কোনও সাড়া পাই না। আমি আবারও ডাকি। এবার ঘর থেকে যিনি বের হয়ে আসেন তাঁকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। হোসেন সাহেব। কিন্তু কনুই থেকে তাঁর দুটি হাতই কাটা। আরও অবাক কাণ্ড। হোসেন সাহেবের পেছন পেছন এসে হাজির সেই মিলি মেয়েটা। কিন্তু তার মাথায় এক বিরাট ঘোমটা দেওয়া।

সমস্ত বিষয়টা বুঝে উঠতে আমার সময় লাগছিল। হোসেন সাহেব আমার মনের অবস্থাটা বোধ হয় বুঝতে পারলেন। বললেন, ঘরে এসো। সব বলব। সব জানতে পারবে। আমি বললাম, কিন্তু পিসি? আমার আয়েশা পিসি? আমার কথা শুনে হোসেন সাহেব ম্লানহাসি হাসলেন। বললেন — তোমার পিসির জন্যেই তো আজ আমার এই অবস্থা। নাহলে কি আমি?

আমি হোসেন সাহেবের কথা ধরতেই পারি না। এমন সময় মিলি বলে ওঠে, আপনি ঘরে এসে বসুন। আপনার পিসি ওই ও পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছেন। পিসির কথা জেনে আমি একটু আশ্বস্ত হই। কিন্তু মিলি। বাড়ির বৌ? তা হয় কি করে? পিসি বেঁচে?

হোসেন সাহেবই আমাকে বোঝাতে বসেন তখন। করাতকলের এক দুর্ঘটনায় একে লেবারকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর হাত কাটা পড়ল। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিল কাটা হাত জোড়া দিতে। কিন্তু পারেনি। টাকার শ্রাদ্ধ। শরীর আর মনের উপর আঘাতও চাপ। আমি বাস্তব অবস্থাটা মেনে নিলাম। কিন্তু খাওয়া থাকা? গোসল করা? নিত্যকর্ম করা? দুটো হাতই তো নেই আমার। এসব কাজ কে করিয়ে দেবে আমায়? তোমার পিসি সুস্থ থাকলে কোনও সমস্যাই ছিল না। ছেলে বলল, আমাদের সঙ্গে চলো। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু যার দুহাত নেই তার আর কি ব্যবস্থা হবে? বললাম, না ভিটে ছেড়ে এ বয়সে আর কোথাও নড়ব না। তখন তোমার পিসিমা কাঁদলেন। অনেক কাঁদলেন। বললেন আমি এখনও কেন বেঁচে আছি? আমি মরলে তো তুমি আর একটা বিয়ে করতে পারবে। আমি ওঁর কথা শুনে কেঁদেছি। খুব রাগ করেছি। এদিকে মিলি ধীরে ধীরে আমার সব কাজ করে দেওয়া শুরু করল। আমি কি করব? আমার লজ্জা লাগত। কিন্তু আমি না করব কি করে? মিলি বলত আপনি আমার অন্নদাতা। আমি আপনার সেবিকা। আমি আপনার সেবা করব না তো কার করব?

আমি অবাক হয়ে হোসেন সাহেবের কথা শুনছিলাম। বললাম, তারপর?

— তারপর? তারপর আবার কি? গাঁয়ের মাতব্বররা আমার পেছনে লাগলেন। বললেন আমি মহাপাপী। আমি পাপ কাজ করছি। মিলি কি আমার বিয়ে করা বৌ? তাকে দিয়ে কেন আমি ও সব কাজ করাচ্ছি?

— আপনি বললেন না কারণটা? আমি জানতে চাই।

— বলেছিলাম। কিন্তু ওঁরা বুঝতে চাইলেন না। ওঁরা বলতে চাইলেন আমার উচিত মিলিকে বিয়ে করা। অথচ তাইবা কি করে হয়? আমি কি আমার দুটো বৌকে সমানভাবে দেখতে পারব? সমান যত্ন করব? তোমার পিসি অসুস্থ। মিলি সুস্থ। সক্ষম। আমি তো মানুষ! নয়?

— হুঁ। — আমি আর কি বলব? আমি কি সব নিয়মকানুন জানি না কি যে কথা বলব?

— তখন তোমার পিসিই বললেন তাঁকে তালাক দিতে। বললেন এভাবে তালাক দেওয়া যায় না। জানি তা অন্যায়। কিন্তু মানুষের বিচার যেখানে শেষ সেখানেই খোদাতালার বিচার শুরু।

— তারপর?

— আমি সেই ওপরওয়ালার বিচারের জন্যে অপেক্ষা করে আছি। হোসেন সাহেব তাঁর কথা শেষ করেন। □

আমি কি ওঁকে বুঝেছি ?

অম্লান দত্ত

সন্তোষ ঘোষের মৃত্যুর পর বারো বছর কেটে গেছে, চলতি ভাষায়, যাকে বলা হয় এক যুগ। অনাসক্তভাবে তাকাবার পক্ষে অনুপযুক্ত নয় এই সময়, কালের দুঃখাপহারী ব্যবধানে।

আমাদের ভিতর প্রধান সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের। আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করতেই সন্তোষ ঘোষ ভালবাসতেন। তবু ভাবি, আমি কি ওঁকে বুঝেছি? কাউকেই তো বোঝা সহজ নয়। যাঁরা কাছে আসেন, তাঁরাও দুর্জ্ঞেয় থেকে যান।

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই জীবনের লক্ষ্য, অন্তত মানববাদীরা অনেকেই এইরকম বলে থাকেন। সন্তোষও সম্ভবত তাই ভাবতেন। এর ভিতর কিন্তু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক, সম্ভবনা বিচিত্র, প্রায়শ পরস্পর মেলে না। সৃষ্টিশীল হৃদয়বান মানুষের একটা মূল দ্বন্দ্ব সন্তোষের ভিতর মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সৃষ্টিশীলতা একটা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের উত্তরণ। এই দ্বন্দ্বে সবাই জয়ী হন না। যাঁরা জেতেন তাঁরাও অক্ষত থাকেন না। কে-ই বা অক্ষত!

ওঁকে বাদ দিয়েই প্রথমে সমস্যার চরিত্রটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। ব্যক্তির বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর শান্তিস্থাপন করা কঠিন। অগভীর অস্থায়ী বাসনার কথা বলছি না। আরও গভীর সমস্যার কথাই তুলছি। আমরা কিছু করতে চাই, সদর্থে কিছু হয়ে উঠতে চাই। এ দুয়ের ভিতর — করা আর হওয়ার মধ্যে — সামঞ্জস্য আনা কিন্তু সহজ নয়। করাটা বাইরের জিনিস হওয়াটা ভিতরের। কিন্তু করতে গিয়ে মানুষ এমন সব উপায় মেনে নেয়, মানতে "বাধ্য" হয়, যাতে কাজটা সম্পন্ন হল, কিন্তু বিবেকের সমগ্রতা তাতে রক্ষা পেল না। কাজটা করা না গেলে আমরা ব্যর্থ, কাজটা হলেও কিন্তু আমরা সার্থক নই। যা আমরা হতে চেয়েছি তা হয়ে ওঠা হল না। এ যেন এমন এক যুদ্ধ যাতে পরাজিত হবারই নানা পথ আছে, জয়ী হবার পথ নেই।

প্রশ্নের শেষ নেই এরপর। আমরা কাছের মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। কিন্তু শুধু কিছু কাছের মানুষকে সন্তুষ্ট করাই কি জীবনের লক্ষ্য? আরও বড় কিছুর জন্য আমরা বাঁচতে চাই। বড় কিছুর জন্য বাঁচতে গিয়ে কাছের মানুষকে সন্তুষ্ট করে ওঠা হয় না। হয়ত বা কাছের মানুষের প্রতি অন্যায়ও করা হয়। তা হলে এর শেষ কোথায়?

কিছু মানুষের প্রতিভা বহুমুখী। অনেকেরই একাধিক দিকে কমবেশি যোগ্যতা থাকে। বহুর প্রতি বিমুখ হয়ে ব্যক্তি কি নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে? তবু একের কাছে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাও অদম্য। বহুর ভিতর একের অন্বেষণ মানুষের অন্তরের ধর্ম। অতিসাধারণ মানুষের এই অন্বেষণটা নিস্তেজ, তাই সমস্যা সেখানে কঠিন নয়। অসাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু আত্মখণ্ডনের পীড়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কোন দেবীর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন?

আমাদের সময় এবং সম্পদ তো অসীম নয়। নানা দিকে নিজেকেও ছড়িয়ে দিলে কোনও দেবীকেই তুষ্ট করা হয় না, কোনও কাজই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। দেবী অসন্তুষ্ট হলে তাতে শেষ অবধি ব্যক্তি নিজেই নিজের ভিতর খণ্ডিত। সেই আত্মখণ্ডনকে জোড়া দিতে দিতে সে ক্লান্ত। শেষ অবধি যতটুকু করা সম্ভব ছিল তাও করে ওঠা হয় না। আর তাইতে ভিতরে ভিতরে ব্যক্তিটি আরও হতাশ, নিজের প্রতি নিজেই আরও ক্রুদ্ধ। "আমায় যে সব দিতে হবে...।" কিন্তু কাকে?

সন্তোষ ঘোষ কথা ভালবাসতেন, শব্দের শরীরকে ভালবাসতেন। সাপুড়ে যেমন বাঁশি বাজিয়ে সাপকে হেলায় দোলায়, সন্তোষও তেমনই শব্দ নিয়ে খেলা করতেন। বাগ্‌দেবীর কাছে নিজেকে নিবেদন ও সমর্পণ করবার একটা ঐকান্তিক ব্যগ্রতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি হয়ে উঠলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর ভূমিকা গৌণ হলে সমস্যা থাকত না। কিন্তু তা তো হল না। বরং তার বিপরীত। এই সমস্যা ছিল না নরেন্দ্রনাথ মিত্রর। নেই সুনীলের। ওঁরা তো প্রধানত সাহিত্যিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু সন্তোষ ঘোষ? একটি শক্তিশালী সংবাদপত্রকে দাঁড় করাবার কাজে তাঁর ভূমিকা হল প্রকাণ্ড। এ কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। এটাই হয়ে উঠল সংসারে তাঁর প্রতিপত্তির স্তম্ভ।

এইখানেই হয়ত একটা বিষম দ্বন্দ্বের শুরু, অতিসচেতন স্পর্শকাতর মানুষের মর্মপীড়া। লোকে তাঁর কাছে কেন আসে? তিনি সাহিত্যিক বলে? বন্ধু ভেবে? না কি তিনি সংবাদপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাবান বলে? সেই ক্ষমতার জগতেও তিনি কি সত্যি স্বাধীন? স্বাধীন হলে কি তিনি ক্ষমতাবান হতে পারতেন? খণ্ডিত এক আত্মপরিচয় সন্তোষ ঘোষের মনের ভিতর কাঁটার মতো বিঁধে রইল। ওঁর আয়ত্তে ছিল না কোনও ক্ষতনিবারক প্রলেপ, ছিল শুধু কিছু উত্তেজক প্রতিদ্বন্দ্বী। আত্মপরিচয়ের এই সংকটের আঘাতে সন্তোষ ঘোষের ব্যক্তিত্বে হয়ত বেড়ে উঠেছিল একটা মেজাজি আতিশয্য।

মদ্যের প্রতি একসময় তিনি একটু বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষী কোনও কোনও বন্ধু তাঁকে সতর্ক করে দিতে চাইতেন। সন্তোষ বিরক্ত হতেন: আমাকে ওরা বোঝে না, আমার ভিতরটা ওরা দেখতে পায় না। বন্ধুরা হয়ত বলতেন, হতাশা কি আমাদের মধ্যেও নেই? তবু মাত্রা রক্ষা করা উচিত। এইসব সদুপদেশে বা সৎপরামর্শে সন্তোষ সহানুভূতির অভাবই দেখতেন। যতদূর মনে পড়ে, আমি পরামর্শ দিতে যাইনি। দ্রষ্টা হয়েই থেকেছি। চিকিৎসক হতে চেষ্টা করিনি।

মৃত্যুশয্যায় সন্তোষ হয়ে উঠেছিলেন অনুপম। কর্কটরোগে যখন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তখন কিন্তু তাঁর হৃদয় অক্ষত। পাশে গিয়ে বসলে আগের মতোই "আড্ডা" জমাতে চাইতেন। কথা বলতে না পারলে, টুকরো টুকরো কাগজে লিখে লিখে চলত বাক্যবিনিময়ের খেলা। আসন্ন মৃত্যু তাঁকে বিন্দুমাত্র ভীত করতে পারেনি। হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে ক'দিনের জন্য নিজের নতুন বাড়িতে এসেছেন শুনে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। ছুটি ফুরোলেই আবার হাসাতালে ফিরতে হবে, এই রকম ঠিক ছিল। বাড়িতে পা রাখতে পেরেছেন, তাতেই বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। আমাকে বললেন, অন্তত পনেরো দিন তো আছি। পরের দিনই তিনি নেই।

তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। বিদায়ের আগে তাঁকে প্রফুল্ল দেখেছি। আসন্ন মৃত্যু তাঁর মন থেকে আশা আকাঙ্ক্ষার সব বৈপরীত্য কেড়ে নিয়েছিল, হতাশার ক্ষত মুছে দিয়েছিল। মৃত্যুর পটেই চিত্রিত দেখেছিলাম সন্তোষ ঘোষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, সব দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। সবাই এমনভাবে চলে যেতে পারেন না। তবে সন্তোষই একমাত্র নন। একই আদিম প্রশ্ন অনেকের ভিতর উত্তর খুঁজছে, উত্তর খুঁজেছে। মাঝে মাঝে দেখেছি মৃত্যুর পটে উদ্ভাসিত সেই উত্তর, জীবনে যার সন্ধান মেলেনি। একেএকে কাছের মানুষেরা দূরে সরে গেছেন। সন্তোষের স্মৃতির প্রতি এই তর্পণ মনে হয় যেন অনেকের উদ্দেশেই তর্পণ। □

সন্তোষকুমার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার ঘোষকে প্রায় দেখি ছবিতে। মহাবীরোজ্যোতি প্রকাশন থেকে তাঁর একখানি গল্পগ্রন্থ বেরোয়। মলাটে সন্তোষকুমারের মুখের ছবি ছিল। সম্ভবত তিন চার বন্ধুর নামের মুখটুকু নিয়ে মহাবীরোজ্যোতি — যাদের ভেতর একজনকে চিনতাম — বীরেশ্বর সরকার — যিনি এম সি সরকারদের বাড়ির ছেলে — পরে সিনেমার গান লিখে সুর দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন — বোধহয় সিনেমাও তুলতেন। এসব অন্তত ৪৫/৪৬ বছর আগের কথা।

সেই ছবিতে সন্তোষকুমারের নাকের নীচে পুরু সরু করে গোঁফ আঁটা। বড় বড় চোখ। মুখখানি তৃপ্ত। মাথায় কালো চুল। ঠোঁটে চাপা হাসি। এই গোঁফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেতর যাঁরা যুবক হয়ে ওঠেন তাঁদের অনেকেই রাখতেন। ঠিক আমাদের চেয়ে দশ বারো বছর আগেরকার যুবকের দল।

ওঁর লেখার কথা আমরা শুনতে পাই কিন্তু তারও বেশ আগে। উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সন থেকেই সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকি। পরে ফিরে তাকিয়ে বুঝেছি — ওই সময়টায় সন্তোষকুমারের বয়স ছিল ২৯।৩০। আমাদের ছিল ১৭।১৮।১৯।

তখন পড়া সন্তোষকুমারের লেখার নাম আজ মনে নেই। কিন্তু এটুকু মনে আছে — আমি তো বটেই — আমাদের ভেতর যারা গল্প, উপন্যাস পড়তাম — লেখার কথা ভাবতাম — তারা সবাই সন্তোষকুমারের লেখায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতাম — তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে লেখক ভাবতাম। তখন অব্দি উপন্যাস বলতে শুধুই কিনু গোয়ালার গলি বেরিয়েছে। এই উপন্যাসটি নিয়ে আমরা নিজেদের ভেতর একসময় তর্ক করেছি — বুঁদ হয়ে আলোচনা করেছি। পরে, অনেক পরে তিনি চারু অ্যাভিনু দিয়ে টালিগঞ্জ রোড ক্রশ করে নিউ আলিপুর থেকে ঠিক আদি গঙ্গা পার হওয়ার রাস্তায় একটি বাড়ি দেখিয়ে বলেছিলেন, এখানেই কিনু গোয়ালার গলির বীজ মাথায় এসেছিল।

মাঝে মাঝে শুনতাম — সন্তোষকুমার দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেন — এই তো সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন। ওঁর বন্ধুমহলের ভেতর পড়ি না। দেখা হওয়ার কথা নয়। আলাপ হওয়ার কথা তো দূর। কিন্তু শারদীয় সংখ্যায় ওঁর লেখা গল্প পড়ি আর গুম হয়ে থাকি। কী করে এমন

লেখেন তাই ভাবি। ভাষায় বিশিষ্ট। দেখায় বিশিষ্ট। কোনওদিনই গোল গল্প তিনি লিখতে বসেননি। বরং জীবনকে দেখার একটি দার্শনিক সত্যের দিকে তিনি সব সময় যাত্রা করতেন। পড়ে আমার মনের ভেতরকার গল্প লেখার জায়গাটা — মনে হত — কাল রাতে ঘুমোবার পর কে এসে খুঁড়ে রেখে গেছে। এবার বীজ ফেললেই চারা বেরুবে। ওঁর লেখা এতটাই উসকে দিত আমাকে।

তখন বিশেষ করে পড়ছি সন্তোষকুমার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। এর আগে পড়েছি তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ে যাচ্ছি। পড়ছি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, মনোজ বসু। সন্তোষকুমারদের কয়েক বছর পরে পড়লাম — সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর। এঁরা সবাই কোনও না কোনও ভাবে আমাদের মনোভূমিতে মাটি দিয়েছেন। কিন্তু সন্তোষকুমারকে যখন পড়তাম বারবার মনে হত — এইসব অবস্থার ভেতর দিয়ে তো যাই — কিন্তু আমি তো লিখতে পারি না। দুর্ভাগ্য, হাতের কাছে ওঁর গল্পগ্রন্থ নেই। তাহলে গল্পগুলোকে নাম দিয়ে বলতে পারতাম। তা পারছি না। কিন্তু সেই বোধের স্মৃতি আজও আমার আছে। সাহিত্যে কেউ কারও মতো নয়। যে যার মতো। তবু এক একজন তাঁর লেখা দিয়ে আমাদের এক এক বয়সে মনের ভেতরকার মাটি কুপিয়ে দিয়ে গেছেন। সন্তোষকুমার সেই কাজটি করেছিলেন। বিশেষ করে আমরা যারা ১৯৫১–৫২ সন থেকে ১৯৫৯–৬০ অব্দি জুড়ে যুবক হচ্ছিলাম — তাদের বেলায় — যাদের স্মৃতির পেটিতে ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধভরা বালক বয়স, কৈশোর জুড়ে দেশ ভাগ — যার পরিণাম যৌবন জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেও তো প্রায় উনচল্লিশ বছর। হরিশ চ্যাটার্জী রোডে প্রেমেন্দ্র মিত্রর বাড়ি গেছি। আমার একটি গল্প ভাল লাগায় তিনি কাকে দিয়ে খবর দিয়েছিলেন। যেতে সংকোচ ছিল। খবর পাওয়ার অনেক পরে গেছি। একতলায় উঠোনের গায়ের ঘরটিতে দেখি একজন ঝকঝকে মানুষ বসে। ধুতি পাঞ্জাবি। চনমনে হাসিহাসি। এর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেখেছি। পড়েছি। আমার নাম বলতে তিনি সেই ঝকঝকে মানুষটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সন্তোষকুমার ঘোষ। তখন কী জানতাম এই মানুষটির সঙ্গে আমার জীবন, জীবিকা, লেখালিখি জড়িয়ে যাবে! তখন কি জানি — ওঁকে ভালবাসব, ওঁর ওপর রাগ হবে, ঝগড়া করব, আবার ভাব হবে, ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাব! তখনও জানিনা — সন্তোষকুমার আমাকে ভালবাসবেন, ঝগড়া করবেন, অপমান করবেন, দোষ স্বীকার করতে লজ্জা পাবেন! আবারও ভালবাসবেন, একদিন এমন সময় আসবে যখন দু'জন দু'জনের কোনও মানে করতে পারব না — কোনও থই পাব না।

সে বড় সুখের সময়। সে বড় দুঃখের সময়। আমার পঁচিশ প্লাস। ওঁর সাঁইত্রিশ প্লাস। আমায় বললেন, আপনি কোথাও কাজ করছেন?

বললাম, কয়েকদিন হল আনন্দবাজারে কাজ করছি।

আমিও তো দিল্লি অফিস থেকে বদলি হয়ে এলাম। আনন্দবাজারে কাজ করব বলে — দেখা হবে অফিসে।

দেখা হয়ে গেল অল্পদিনের ভেতর। তখনও আনন্দবাজারে বার্তা বিভাগে এমন অনেকেই কাজ করতেন — যাঁরা পরাধীন আমলে কেউ কেউ জেলও খেটেছেন—সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, গান্ধীজির খুব কাছে গেছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে মোটে বছর দশেক। খুব কম মানুষই সময়ের পরিবর্তন সহজভাবে মেনে নিতে পারেন। আনন্দবাজারেও আশু পরিবর্তন সেদিন জরুরি ছিল। দেশভাগ, উদ্বাস্তু শিবির, কংগ্রেস ছাড়াও অন্য সব রাজনৈতিক দলের উঠে আসা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, ছবি আঁকার জগতে যেমন অনেক কিছু ঘটছিল — তেমনই বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র — নানান দিকে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিল। আমি তখন সামান্য কাজে ডুবেছিলাম। সন্তোষকুমার ঘোষ নামে বাঙলা ভাষার গল্পলেখক একজন লেখককে এই সময় বদলের ঢল আনন্দবাজারের পাতায় নামিয়ে আনার জন্য দিল্লি থেকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই এই ঢল নামানো যায় না। এটা একটা বড় রকমের ঝুঁকি। পরীক্ষা।

আমি আজও তখনকার সন্তোষকুমারকে দেখতে পাই। ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলি। খুব চেষ্টা করছেন। নিজের গল্প লেখার সময় পাচ্ছেন না উদয়াস্ত। বেলা দশটায় অফিসে চলে আসতেন। যদি কাগজটা বদলায়। একদিকে তাঁকে তখন আগেকার সাংবাদিকতায় অভ্যস্ত প্রবীণ সহকর্মীদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে — আবার অন্যদিকে তিনি যেভাবে সাংবাদিকতার ছবিটি মনে মনে গড়ে তুলছেন — সেরকম সহকর্মী তাঁকে আনকোরা অনভিজ্ঞ কর্মীদের ভেতর থেকে বানিয়ে নিতে হচ্ছে। কতদিন তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফিরেছি রাত আড়াইটায়।

দেশের রাজনীতি তখন খুব কুচুটে হয়ে উঠেছে। আনন্দবাজারে গল্প লিখলে তা দেখতে শিয়াখালা যেতে হত। কলকাতায় তাকে তখন দেখা যেত না।

এই সময় সন্তোষকুমার রাস্তা খুঁজছেন। দশটা ঢিল ছোড়েন তো দু'টো ঠিক জায়গায় লাগে। ওঁর তখনকার চেহারার কথা আমি বলতে চাই। চওড়া কাঁধ। ধুতি পাঞ্জাবি। লম্বা ছিলেন না। নাকের নীচে মোটা গোঁফ। পেছনে তাঁর নেশন, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, স্টেটসম্যানে কাজ করার অভিজ্ঞতা। ধুতির কোচা লুটোচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে এলেন। নিজেই নিউজে বসে কপি স্পাইক করতে বসলেন। আধঘণ্টার ভেতর টেবিল থেকে টেলিপ্রিন্টারের জমা কপি বেছেবুছে বাকিটা ফেলে দিলেন। আমাদের লেখা কপি একটু আধটু বদলে দিয়ে একদম অন্যরকম

করে দিলেন। হেডিং কেটে ছোট আর ধারালো করে তুললেন। সে সময় একটি কথা তিনি একদিন বলেছিলেন — যা আমি আজও ভুলিনি। কোনও পরিচিত প্রবাদকে সামান্য ভেঙে তাকে নতুন এক অর্থ দেওয়া। এ কাজ তিনি হামেশাই করতেন। লক্ষ করেছি — এরকম করলে সামান্য একটি হেডিং সারাদিন পাঠকের মনে বিঁধে থাকত।

সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের বাঁধানো প্রবাসীতে পড়েছিলাম — কৃষ্ণকুমার মিত্র মারা গেলে রবীন্দ্রনাথ বড় করে লিখেছিলেন — কৃষ্ণকুমার কত বড় সাংবাদিক ছিলেন। কৃষ্ণকুমারের সময়কাল আমরা জানি না। ১৯৫৮ থেকে প্রায় ১৯৭৬ অব্দি আমি সন্তোষকুমারের কনিষ্ঠ সাংবাদিক সহকর্মী ছিলাম। আজও আমি তাঁর অনুজ গল্পলেখক। সবার উপরে আমি তাঁর একজন অনুজ সমসাময়িক মানুষও বটে। সন্তোষকুমারকে আমি সাংবাদিক, লেখক তো বটেই — মাথার ওপরে একজন দিশারী স্নেহময় মানুষ হিসাবেও পেয়েছি।

এই প্রাণচঞ্চল, গভীর মেধার পথে হেঁটে চলা মানুষটি আমাদের বারবার বিস্মিত করেছে। স্নেহময় মানুষ হিসাবে তাঁর কাছ থেকে গভীর ভালবাসা পেয়েছি। আবার রূঢ় অপমানও তিনি করেছেন। কখনও কখনও মনে হয়েছে — এমন কেন? এ কি তাঁর ভেসে বেড়ানো ছেলেবেলা কিংবা অনিশ্চিত যৌবনযাপনের পরিণাম — যেখানে নিরাপত্তার অভাব ছিল? সম্পর্কগুলো ছিল না যথেষ্ট মজবুত?

বহু ব্যাপারে তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী — অনুসন্ধানী। সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলো, দেশের ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ, মানবসম্পর্ক — সব কিছুতেই তিনি ডুব দিতে পারতেন। গভীরে চলে যেতেন। মননে ছিলেন ক্ষিপ্র। কিন্তু লক্ষ করেছি তাঁর মনোভূমি ছিল বিক্ষিপ্ত — অস্থির। এসব সত্ত্বেও আমি বলব এমন আশ্চর্য মানুষ কমই দেখেছি। সময়ের দূরত্বে বসে এমন একজন মানুষের মৃত্যুর বারো বছর পরে তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখে তাঁর চুলচেরা বিচার করার চেয়ে তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি সেজন্যে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করা — তাঁকে ভালবাসা — তাঁর ভালাবাসার কথা মনে করা আমার কাছে অনেক শ্রেয়।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পেছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি — শুধুই আনন্দবাজারে কিছু কৃতী সাংবাদিক তৈরি করা নয় — তাঁর সমসাময়িকদের ভেতরে যেমন — তেমনই আমাদের মতো অনুজদের ভেতর থেকেও তিনি লেখক হয়ে ওঠার মতো কয়েকজনকে বেছে নিয়েছিলেন। লেখার সঙ্গে তিনি জাগিয়ে দিতেন আমাদের লেখা পড়ে — সে লেখা বিচার করে — তার প্রশংসা করে — তার সমালোচনা করে। এজন্যে তাঁকে কোনও চেষ্টা করতে হত না। তাঁর স্বভাবের ভেতরেই এটা ছিল।

কারও একটি লেখা ভাল লাগলে তিনি সে লেখার চারগুণ তারিফ করতেন। এক দোলের সকালে দেখি সারা গায়ে রং মেখে হাতে টানা রিক্সায় চড়ে আমার বাড়ি চলে এসেছেন। ১৯৬২-র অক্টোবর মাসে তাঁকে আমার যে বই দিয়েছি — ১৯৬৩-র মার্চে একরাতে বইটি পড়ে ফেলে সকালবেলা দোলের রং ভ্রূক্ষেপ না করে নানা রঙের সন্তোষকুমার এসে হাজির। এটা শুধু আমার বেলায় নয়। এটা শুধু আমাদের বেলায় নয়। আমাদের চেয়ে যারা ১০/১২ বছরের ছোট ছিলেন — তাঁদের বেলাতেও এমনটি ঘটেছে। অনেকবার।

শুধু কি লেখার মানুষ? গানের জগৎ। কতদিন ওঁর সঙ্গে কত গায়কগায়িকার কাছে গেছি। ওঁর উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত সঙ্গীতের ভেতরকার কথাটিতে ওঁর সমঝদারি। বাণীর মর্ম। গায়কীর বিশেষত্ব। মনে আছে — একদিন সন্ধ্যায় — তখন ইডেনে আকাশবাণীর বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। সে সময় লাইভ ব্রডকাস্ট হত। এই বর্ষা আসছে। যাচ্ছে। দু'খানি গান গেয়ে কণিকা এসে আমাদের সঙ্গে ইডেনের ভিজে মাঠে বসলেন। একটু আগে ওঁর গান আকাশবাণীর বসবার ঘরে বসে সন্তোষকুমারের সঙ্গে শুনেছি। এখন কণিকাকে সেই শোনার কথা বললেন তিনি। গান যেমন ভাল লেগেছিল তেমনই লেগেছিল সন্তোষকুমারের বলা কথাগুলো। গান ছিল ওঁর আরেক জীবন। প্যাশন। ফাঁক দিয়ে আবার গান ছিল কণিকার। যে-গানটি গাইবেন সেটি তিনি আমাদের খালি গলায় আগাম শোনালেন।

আমাদের সামাজিক জীবনে — পারিবারিক জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে — পরিচিতির পরিধি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছবিটা বড় হয়ে ওঠে। লোকে যেভাবে আমাদের দেখতে অভ্যস্ত — বাড়ির সবাই, পাঠকরা, অফিসের সহকর্মীরা যেভাবে আমাদের দেখতে অভ্যস্ত — নিজের সেই ছবির সমান সমান থাকার জন্যে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই। আমাদের জীবনটাই যেন এই তাল রাখতে গিয়ে — নিজের নিজের ছবির উপযুক্ত করে তুলতে গিয়ে আমরা মরে যায়। সন্তোষকুমার মাঝেমধ্যে এই দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে তাঁর স্বরূপে বেরিয়ে পড়তেন। তখন জীবন জগৎ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতেন। তাঁরও একটা খোলাখুলি ভালবাসার জগৎ ছিল। বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হিসাবে তিনি মধ্যবয়সের নতুন ভালবাসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেননি। পারেননি মানবিক কারণেই। তিনি যে কয়েকজন নতুন মানুষকে পৃথিবীতে এনে ফেলেছেন। মধ্যবয়সে পৌঁছে একই দশায় নিজেকে ফেলে আমি সেদিনকার সন্তোষকুমারকে বুঝতে পারি। সেদিন স্বীকারোক্তির মতো নিজের কথা নিজেকে শোনাতে গিয়ে আমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছিলেন। কুশীলব সবাইকে জানি। সবার গণ্ডী জানি। পরিচয় আমিই তো করিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ বলা যায় সাংবাদিকতার সঙ্গে তিনি সাহিত্য চেয়েছিলেন। পুরনোরা ব্যাপারটা ঠাট্টা করতেন। নতুনরা সাবধানে পা ফেলতাম। এত লোকের রুজিরোজগার নিয়ে একজন ৩৭ বছর বয়স্ক লোক কোনও ভুল করছেন না তো? সন্তোষকুমারের সেদিনকার সব আয়োজন — চেষ্টা বিফলে যায়নি। বরং বলা যায় তাঁর অনেক কিছুই এখন সাংবাদিকতায় চলে এসেছে। কোনও কোনও দিন তো সকালবেলা কাগজ পড়ে মনে হয় তিনজন সন্তোষকুমার এখনও কাজ করছেন। একজন আনন্দবাজারে। অন্যজন বর্তমানে। আরেকজন আজকালে। আমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু আজকের চার চারজন বিশিষ্ট বাঙালি লেখককে তাদের যৌবনকালে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনিই। সুনীল, মতি, সিরাজ, শীর্ষেন্দুর কথা বলছি। তাঁর তো ভুল হয়নি। এরা তো খারাপ লেখেনি। ওরা বন্ধু বলে আর চন্দ্রবিন্দু দিলাম না।

শীতকালে কখনওসখনও সুট পরতেন। নয়ত বেশির ভাগ দিনেই ধুতি পাঞ্জাবি। ফার্স্ট আওয়ারে সুবিন্যস্ত। সন্ধ্যায় অবিন্যস্ত। তবুও ভাল লাগত। শীতকালে গরম শাল নয়ত পাঞ্জাবির ওপর জওহর কোট। কথাটা পোশাকের নয়। কথাটা হল তাঁর হাসিহাসি আনন্দময় উপস্থিতি নিয়ে। শুধুই তাই নয়। নিজের ভেতরকার জিজ্ঞাসাটা তিনি এমন করেই তুলে ধরতেন — যা কিনা অন্যেরও জিজ্ঞাসা হয়ে পড়ত। তখন আর পোশাকের সন্তোষকুমার নয় — জিজ্ঞাসার সন্তোষকুমারের দৃষ্টিই মনে বিঁধে থাকত। সেদিন এসব জিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্য নিয়ে, জীবন নিয়ে, মানবসম্পর্ক নিয়ে।

তাঁর পরে তো আর একটি লোক পেলাম না — যিনি নিজেই বলেন, কাকে বিয়ে করছ শ্যামল? — চলো তো দেখে আসি —।

সন্ধ্যেবেলায় শালকিয়ার বাসাবাড়িতে চারদিককার কয়লার উনুনের দমবন্ধ ধোঁয়া। তার ভেতর মাদুর পেতে ক্রাম্পড্ হয়ে বসে শ্যামলের স্থির করে ফেলা কনে দেখা। কথা ছিল সন্তোষদা আমার বিয়েতে সাক্ষী দেবেন। কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি। তাড়া ছিল। রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে শুনে খুব চটলেন। ঝগড়া করলেন। আমি রিজাইন দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। মন খারাপ। পরদিন খবরের কাগজের সঙ্গে একটি মুখবন্ধ পেলাম। অফিস থেকে কাগজের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে। খুলে দেখি — আমার পদোন্নতি হয়েছে। এই ছিলেন সন্তোষদা।

শ্যামল কলকাতার বাইরে এক খালপাড়ে কোম্পানি বাঁধের গায়ে বাড়ি করেছে। নতুন গাড়ি কিনেছেন সন্তোষকুমার। নতুন চালাতে শিখেছেন। ডিকিতে এক কাঁদি ডাব নিয়ে দুপুর রোদে শ্যামলের বাড়ি আসছেন। শ্যামল দেখতে পাচ্ছে গাড়িটি যদি এক হাত ডাইনে যায় তো গড়িয়ে দশ ফুট নীচে খালে গিয়ে পড়বে। গাড়িটা ডাইনে বাঁয়ে টলতে টলতে আসছে। বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে সন্তোষকুমার নামলেন। নিজেই চালাচ্ছিলেন। দুপুর রোদ। চড়া গরম। ঘেমে গেছেন। বেশ খানিকটা খেয়েছেন। একমুখ হাসি। বললেন, পেছন থেকে ডাবের কাঁদিটা নামাও। গলা শুকিয়ে গেছে। তোমাকে দেখতে এলাম।

ভাল করে চালাতে শেখেননি। এই কাঠফাটা রোদে ২৫/৩০ কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে এলেন কি করে?

খেলাঘরের বাড়ি শিশু বারবার ভাঙতে পারে। গড়তে পারে। শ্যামলকে বললেন, আমাকে একটা বাড়ি করে দাও। তখন ইটের হাজার একশো টাকা। সিমেন্টের বস্তা দশ টাকা চার আনা। বাড়ি আরম্ভ করলাম। দু'খানা ঘরের ছাদ ঢালাই হয়ে গেল। সামনে সিমেন্টের একটি মোটিফ। একদিন এসে শ্যামলকে বললেন, বদলাও। এই জায়গাটা পাল্টাও।

কিন্তু বাড়ি যে বালি সিমেন্টের। জমে একবার শক্ত হয়ে গেলে তো বদলানো যায় না। এ তো খবরের হেডিং নয়। কেটে পালটে দেব! এই নিয়ে শ্যামলের সঙ্গে মতের অমিল। ক্ষোভ। দু'জনেরই কিন্তু সেসবে কিছু আসে যায়নি। কারণ শ্যামলের সঙ্গে সন্তোষকুমারের ভালবাসা সিমেন্টে বালিতে স্টোনচিপে জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তা আর বদলানো যায় না।

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে সন্তোষকুমার ভালবাসার গ্রেডেশন করতেন। ফিস নয়তো ব্রেস্ট্ কাটলেট আনিয়েছেন। আজ অমুকের লেখাটি ভাল হয়েছে। ওকে কাটলেট কেটে বড় টুকরো দিলেন। আজ তমুকের লেখাটি মাঝারি ভাল হয়েছে। তাকে দিলেন কিছু ছোট টুকরো। কারও লেখা খারাপ হয়েছে। সে আজ কিছুই পাবে না। অথচ গতকালই ভাল লেখার জন্য সে পেয়েছিল সবচেয়ে বড় টুকরো। এই ভাবেই কাটলেটের পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ হত।

সপ্তাহের সাতটি দিনে রকমারি জিনিস দিয়ে পাতা ভরিয়ে দিতেন। খেলাধুলো, দেশেদেশে কী ঘটছে, সাহিত্য, যাত্রা-নাটক (সেজন্যে তো যাত্রা এসে গেল বড় বিজ্ঞাপনে) কত কি। তার আগে কি যাত্রা নিয়ে এই মাতামাতি ছিল? সম্ভবত নয়। নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবের সূচনা। সেজন্যে আমাদের বন্ধু প্রবোধবন্ধু হয়ে গেলেন যাত্রাবন্ধু। তারপর সবচেয়ে বড় কাণ্ড — চলিত বাঙলায় চলে এল বাঙলা কাগজ। আনন্দবাজারকে দিয়ে শুরু। তাতে অমিতদারও (অমিতাভ চৌধুরী) ভূমিকা ছিল।

কাগজ যত বড় হচ্ছিল — ওঁর সাহিত্যের কলম ততই সময় কম পাচ্ছিল — ভেতরে ভেতরে তিনি প্রতিভার উসকানি

ততই হারাচ্ছিলেন। আর সেজন্যেই ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। না লিখতে পারার। লিখতে না পারার। কিন্তু সেই সময়েও তিনি অন্যের লেখার তারিফদারিতে কারও চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। সমসাময়িকদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক আগেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গেও শিথিল হতে থাকল। তবু ওঁর সম্পর্কের পরিধি কোনও দিন ছোট হয়নি। বরং আরও বড় হয়েছে। লেখকদের অবিরাম ধারার সঙ্গে সব সময়েই তিনি যুক্ত থাকতে পেরেছেন। যাঁরা ওঁর চেয়ে তিরিশ বছরেরও বেশি ছোট ছিল — তাদের সঙ্গেও সন্তোষকুমার যুক্ত থাকতে পেরেছেন। তাদের লেখায় স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পেরেছেন। এ এক অতি বড় ক্ষমতা।

সফল সাংবাদিক হয়েও তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল — বাঙলা সাহিত্য আমাকে স্বীকার করুক। অনেকদিন আগেই তিনি সেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সন্তোষকুমার এই ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগতেন। অনিশ্চিত ছিলেন। যে কোনও বিবেকী শিল্পীই এই দ্বিধায় ভুগে থাকেন। 'জল দাও' সবার চেয়ে ভিন্ন — সন্তোষকুমারের নিজের ছাপ দেওয়া লেখা। সেদিনও পড়ে দেখি একটুও পুরনো হয়নি। আমাদের হৃদয়ে তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন বহু আগে। অসম্ভব ভাল সব গল্প লিখে। এইসব গল্পে ধরা রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিককার বাঙালি জীবন। নারী যখন জানতে পারে সে তত সুন্দরী নয় — তার তখনকার মন তিনি একটি গল্পে এঁকেছিলেন। পাইকপাড়ায় থাকতে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পটির নাম — শোক। সেখানে যেন নিজের মৃত্যুর সামনেই পাঠককে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতার পরেকার যেসব মানুষকে 'সাফারার অব ইনসিগনিফিকান্স' বলা যায় — তাদের অসামান্য হয়ে ওঠার কথা তিনি গল্পে গল্পে বারবার এঁকেছেন। কখনও মনে হয়েছে একই জীবনের একদিক ধরা পড়েছে তাঁর চোখে — আরেকটি দিক ধরা দিয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চোখে।

এখন আর সন্তোষকুমারকে নিয়ে কোনও কোলাহল নেই। এই নিভৃতিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মানুষ। লেখক। সাংবাদিক। সবটা যেন এবার দেখতে পাচ্ছি। প্রেমিক। মেধার অলৌকিক বনবীথি ধরে তিনি হেঁটে চলেছেন। হাসি হাসি মুখ। সর্বদাই অন্বেষার অভিযানে মগ্ন। স্নেহশীল। আবার বিক্ষিপ্ত। রূঢ়। সঙ্গীতে সাহিত্যে অনন্য তারিফদারি। একটি সংবাদপত্রকে ওপরের দিকে তুলে আনছেন। অনেকটা এই ধরনের আরেক জনকে দেখছি কিছুদিন। আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। তার কথা এখন নয়। এখানে নয়।

মতির 'বেহুলার ভেলা' গল্পটি ভাল লাগল। তাকে নিয়ে দীঘা চলে গেলেন। সুনীল আমেরিকা থেকে ইনল্যান্ডে চিঠি লিখেছে। সে-চিঠি বারবার সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছেন। দোলের সকালে হাত-রিক্সায় করে বলতে চলে আসা — দারুণ লিখেছ উপন্যাসটা শ্যামল!

ওঁর সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনায় অফিসে যেতে পারছি না। অথচ তখন তিনি আমারই বাড়িতে। খাবেন সেদিন। আমার স্ত্রীকে বলছেন, কি কি কীভাবে রাঁধতে হবে। আমি ওঁর পছন্দের রেকর্ড বাজাচ্ছি।

আমার রাগ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোনও বিদ্বেষ ছিল না। সব তিনি মুছিয়ে দিয়েছিলেন। বরং বলা উচিত — বুঝতে পারতাম না — সন্তোষদাকে নিয়ে কি করব? ফেলতে পারি না। কষ্ট হয়। কোথায় যাবেন? রাখতে পারি না। কষ্ট হয়। সে এক অসহ্য ভালবাসা। কোথায়? এমন লোক তো আর দেখি না।

অনেকদিন আগে। তখনও লাইনো কম্পোজ ছিল। একদিন খুব খবরের চাপ। সে সময় রাত তিনটে সওয়া তিনটে অব্দি খবর ধরানো হত। সন্তোষদা রাত একটা দেড়টা নাগাদ খানিকটা রিলিফের জন্যে গাড়িতে আমাকে নিয়ে রেড রোডে চক্কর দিচ্ছেন। সেই সময় ওঁর পা মচকে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে। একটু খেয়েছেনও। কী নিয়ে যেন আমার ওপর রেগে উঠলেন। কারণটা একদম জানি না। গাড়ি থেকে রাত দু'টো আড়াইটে নাগাদ অফিসের সামনে নামলেন। হাঁটতে পারেন না ঠিকমতো। আমার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অত রাতে লিফট্ নেই। তেতলায় উঠতে হবে সিঁড়ি ভেঙে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। এক ধাপ উঠছেন আমার কাঁধে ভর দিয়ে। একটু থামছেন। আর আমাকেই গালাগাল করছেন।

সরে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি চললাম।

দেওয়াল ধরে সন্তোষদা দাঁড়ালেন। তখনও আমরা দোতলায় উঠিনি। বললেন, তা হবে না শ্যামল। দিস ইজ গ্রস ইনসাবোর্ডিনেশন!

এমন লোকাকে কি বলব। এক পা মচকানো। দুই পাই-ই একটু টালমাটাল। তেতলায় নিউজরুমে উঠে শেষ খবর অনুযায়ী পয়লা পাতা কিছু পালটাতে হতে পারে। ফের কাঁধ এগিয়ে দিলাম। সন্তোষদা আমার কাঁধে ভর দিয়ে ফের ওপরে উঠতে লাগলেন। গালাগালিও দিতে লাগলেন। আমাকে। আবার নিজেকেও। নিজের অসমর্থ দশার জন্য।

প্রায় তিরিশ বছর আগে। কলকাতার বাইরে থাকি। আমার বাড়িতে সপরিবারে বেড়াতে এসেছেন। পুকুরে অল্প জলে ঘাটলায় বসে বললেন, পিঠে সাবান লাগিয়ে দাও। দিলাম। সাঁতার জানেন না। সেকথা বলেননি। আগে থেকেই অল্প তরফে ছিলেন। তারপর এক সিঁড়ি আর নামতেই দিব্যি একটা আধুলির মতো তলিয়ে যেতে লাগলেন। আমি ভাবছি এখুনি হাত তুলে সাঁতার কাটবেন। ঘাটের পেছনে বৌদি, ওঁর

মেয়েরা আমার বাড়িতে। রান্না প্রায় শেষ। খেতে বসার যোগাড়যন্ত্র চলছে। সাঁতার আর কাটেন না সন্তোষদা। কোনও হুস নেই। কী সর্বনাশ! পাগলের মতো ডুব দিয়ে টেনে তুলি। খানিকটা জল খেয়েছেন। সেটা বের করে দিয়ে হেসে উঠলেন। তুলতে গিয়ে দেখি পিছলে যাচ্ছেন। গায়ে যে সাবান মাখানো ছিল। তুলতে কী পারি! ভাগ্যিস পেরেছিলাম। এই ছিলেন সন্তোষদা। পাগল। এবং বালক। আদেশ করতেন। গালাগালি করতেন। কারণ তিনি মনে করতেন—আমি তো ভালবেসেছি। তারপর যা ইচ্ছে তাই করব।

পঁচিশ বছর আগে মতি, সুনীল, শীর্ষেন্দু আর আমার—আমাদের চারজনের একটি করে গল্পসংগ্রহ এক প্রকাশক বের করেছিলেন। সেই চারটি গল্প সংগ্রহেরই ভূমিকা লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। আমার গল্পগুলির ওপর তাঁর সেই ভূমিকা আজও আমার পক্ষে সবচেয়ে অভ্রান্ত। পরে আমার কোনও একটি গল্পসমগ্রে সেই ভূমিকাটি দিয়েছি।

সন্তোষদা সাহিত্যের ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল চিনতেন বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন। এই জীবন থেকে তিনি উঠে এসেছেন। আমরাও এসেছি। অনেকেই। এই জীবনের কথা তিনি এত নিপুণ ভাবে লিখে গেছেন যার তুলনা মেলা ভার। সম্প্রতি সন্তোষকুমারের তেমন একটি গল্প মাসিক কথাসাহিত্য ছেপেছিল। পড়ে আমি মুগ্ধ। একটি অধিক কথা নেই। ব্যথায় সারা গল্পটি টন টন করছে। দারিদ্র্য, দুর্দশা, নিরুপায় দশা, আর কোনও পথ নেই, মূল্যবোধ হারানোর যন্ত্রণা সারা গল্পটিতে ছেয়ে আছে।

রূঢ় অপমানকর ব্যবহার অবশ্যই করেছেন। সিরাজ যে লিখেছে—একজন মেয়ের হাত ভেঙে দিয়েছিল—কথাটা ঠিক নয়। একজনকে সোয়াইন বলেছিলেন। আরেকজন পরে রেগে গিয়ে একটি চড় মেরেছিল। তাতে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়। তখন সেই আরেকজন সাবধানে তুলে নিয়ে গিয়ে ইজিচেয়ারে তাকে শুইয়ে দিয়েছিল। জল এনে খাইয়ে দিয়েছিল। আয়োডেক্স এনে ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর সে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এসব কথা সিরাজের জানার কথা নয়। তখনও সিরাজ সেই অফিসে যোগ দেয়নি। অপ্রীতিকর ঘটনার সময় সেখানে সুনীল ছিল। সুনীলের তখন করার কিছু ছিল না। তবু আমি বলব—দোষ আমারই। তাঁর কাছে আমি কাজ শিখেছি। ভালবাসাও পেয়েছি।

অফিসে, আইনের ভাষায়, একটি domestic enquiry হয়েছিল। সারা প্রতিষ্ঠানের কেউ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেননি। আমাকে সাসপেন্ড করা হয়। সাসপেনসনের নিয়ম ছ'মাস হাফ পে। তারপর নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি আমাকে চাকরির মেয়াদ আরও প্রায় ১৮ বছর শতকরা ৭৫ ভাগ মাইনে দিয়ে যেতে হত। বসিয়ে বসিয়ে। ইনক্রিমেন্ট সমেত। ডোমেস্টিক এনকোয়ারিতে আমাকে দোষী প্রমাণ করা গেল না। এই সময় সমরেশ বসু আমার খোঁজ নিয়েছেন। অন্যত্র আমার লেখা প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সম্পাদক হিসাবে মধুসূদন মজুমদার, মণীন্দ্র রায় লেখা চেয়েছেন। এই প্রকাশই তখন আমার একমাত্র ভরসা ছিল। অভীকবাবু অনুরোধ করেন আমাকে। ফিরে আসুন। সন্তোষদা বললেন, তুমি কষ্ট পাও তা আমি চাই না। প্রতিষ্ঠান বলল, আপনি আর সন্তোষবাবু letter of regret নিজেদের ভেতর বিনিময় করুন।

আমি আর সন্তোষদা এলফিনে গেলাম। উনি নিলেন জিন। আমি নিলাম হুইস্কি। দুপুরবেলা। ভেতরটা ঠাণ্ডা বাইরে কড়া রোদ্দুর। আমার তেতাল্লিশ। ওঁর পঞ্চান্ন। খাওয়া দাওয়া হল। চিঠি বিনিময় হল। দু'জন দুঃখ প্রকাশ করে দু'জনকে চিঠি লিখলাম। আমার চিঠি ওঁকে দিলাম। ওঁর চিঠি উনি আমাকে দিলেন। সেদিন বোধহয় আমরা সিজিনিং চিকেন খেয়েছিলাম সঙ্গে। শব্দ তোলা—ধোঁয়া ওড়ানো।

ওঠার সময় সন্তোষদা বললেন, আমার চিঠিখানা দাও শ্যামল। সব তো মিটে গেল। আর ও চিঠি রেখে কী করবে!

মিটেই যখন গেছে—তখন ও চিঠি দিয়ে আর কি করব। সন্তোষদার চিঠি সন্তোষদাকে দিয়ে দিলাম। আমার দুঃখ প্রকাশ করে লেখা চিঠিখানি সন্তোষদার কাছ থেকে নেবার দরকার মনে হয়নি সেদিন।

ওঃ! একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ওই অপ্রীতিকর ঘটনার মাসখানেক আগে সন্তোষদার কথায় শরৎচন্দ্র ও পতিতাদের বিষয়ে তিন কিস্তিতে একটি লেখা লেখি আনন্দবাজারে। সে বছর সম্ভবত শরৎ শতবার্ষিকী ছিল। সন্তোষদা লেখাগুলোর ল্যাজামুড়ো কেটে ছেপেছিলেন। সেখানেই ক্ষোভের শুরু। তার ২০।২২ দিন পরে—যতদূর মনে পড়ছে জানুয়ারির শেষদিকে—ভুবনেশ্বরে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল। সন্তোষদা গিয়েছিলেন। আমি সে সভা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাই। এবং কিছু লিখি না। আমি কোনারকে চলে যাই। সেখানেই রাগারাগির কারণ আরও জোরালো হয়েছিল। তার কয়েকদিন পরেই তো ওই ঘটনা।

যাক গিয়ে। সন্তোষদার চিঠি সন্তোষদা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। আমার দুঃখ প্রকাশের চিঠি সন্তোষদার কাছে থেকে গেল। প্রতিষ্ঠান আমাকে চিঠি দিল : আপনি সন্তোষবাবুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সে চিঠি আমরা পেয়েছি। আপনাকে ক্ষমা করে শাস্তি তুলে নেওয়া হল। আপনার কাটা বেতন ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে। আপনি কাজে যোগ দিন। অবিলম্বে। প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে আমাকে 'ক্ষমা' করার কথাটি আমার ভাল লাগল না। অপমানকর মনে হল। তাছাড়া সন্তোষদা

যে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—সে কথা তো প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে নেই।

সন্তোষদাকে বললাম, কি ব্যাপার? এরকম হল কেন? আমাকে লেখা আপনার দুঃখপ্রকাশের চিঠি অফিসকে দেননি? যে-চিঠি আমার কাছ থেকে চেয়ে সন্তোষদা বলেছিলেন, ভুলে যাও শ্যামল।

অভীকবাবুকে বললাম। তিনিও বললেন, ভুলে যান। কয়েকটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে আমাকে প্রোমোশন দেওয়া হল। এর কয়েকমাস আগে শীর্ষেন্দু ও সিরাজ কাজে যোগ দিয়েছিল।

আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি। 'ক্ষমা' কথাটি আমার ভাল লাগেনি। এই সময় আমার বাবা মারা যান। শ্রাদ্ধে অভীকবাবু এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। এর কিছুদিন পরে আমি পদত্যাগের চিঠি দিই। আমার পরের ভাই তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে। তাকে অভীকবাবু বলেছিলেন, আপনার দাদাকে আটকান। পদত্যাগের চিঠি বেশ কিছুদিন ওঁরা রেখে দিয়েছিলেন। যাতে আমি না যাই। অভীকবাবুকে আমার আগাগোড়াই আন্তরিক লেগেছিল।

কিন্তু তখন আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। 'ক্ষমা' কথাটির জন্যে। আর নিজের দুঃখ প্রকাশের চিঠি সন্তোষদা অফিসকে না দেওয়ায়। কিংবা, অফিস সে চিঠির কথা উল্লেখ না করায়।

চাকরি ছেড়ে আমি একটি সাহিত্য-সাপ্তাহিকে যাই। সেখানে কয়েকমাসের ভেতর সন্তোষদার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার যত্ন করে ছেপেছিলাম। সন্তোষদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটগল্পের ওপর তিনটি বক্তৃতা দেন। তাতে আমার এতই প্রশংসা করেন যে আমি খুব লজ্জা পাই।

. এরপর সন্তোষদা এসেছেন। আমি গেছি। সব মুছে গেছে। সন্তোষদার ছোট মেয়ে এখন সম্পাদক হিসাবে আমার লেখা চায়। আসে। বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে সে আমার সঙ্গে নিজের কাকার মতো ব্যবহার করে। আমি যে ওদের ছোট থাকতে স্কুলে ভর্তি করেছিলাম।

যে বয়সে সন্তোষদা চলে গেছেন—সেই বয়সে আমি এখন পৌঁছে গেছি। রোগভোগের সময় ওঁর কষ্টের কথা শুনে ভীষণ কষ্ট বোধ হয়েছে। ২১।২২ বছর আগের একটি ঘটনার জন্যে আমাদের ভেতরকার ভালবাসা কোনও দিন নষ্ট হয়নি। এতকথা লিখলাম—এ জন্যে যে অনেকে না জেনে অনেক ভুল কথা লেখেন।

কিছুকাল আগে শ্রীমতী কাকলী চক্রবর্তীর (সন্তোষদার ছোট মেয়ে মিনু—বিশিষ্ট অধ্যাপক সমালোচক শ্রী কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর স্ত্রী) হাতে শারদীয় বর্তমানের পুজোর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতে গেছি। শ্রীমতী কাকলী কথায় কথায় বলল, বাবা যে নেই—বিশ্বাসই হয় না।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে মিনুর কথাটিই বললাম—সন্তোষদা যে নেই—বিশ্বাস হয় না। এখুনি হয়ত বলে উঠবেন—চলো শ্যামল—দেখে আসি কাকে তুমি বিয়ে করছ। কিংবা খুব রূঢ় ভাষায় হয়ত কোনও কঠিন অপমান করবেন। ভালবাসবেন। ঝগড়া করবেন। কাজ শেখাবেন। লেখার প্রশংসা করবেন। সমালোচনা করবেন।

আমরা সবাই মিলে এরকমই ছিলাম। সে কথা নীরেনদা জানেন। গৌরদা জানেন। অমিতদা জানেন। সুনীল জানে। মতি জানে। সিরাজ জানে। শরৎ ঠিক বুঝতে পারেনি। □

সন্তোষকুমার ঘোষ— শ্রীচরণেষু

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (চিরঞ্জীব)

তাঁর কথা মতো রোজই অফিসে ঢুকে দেখা করতাম। বিশেষ কোনও খবর লেখার ব্যাপার থাকলে বলে দিতেন। ১৯৬৭ বা ১৯৬৮-র কথা। ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলেন : ছয়ের পৃষ্ঠায় ভবানীপুরে জলে ডোবার খবরটা পড়েছ? চার লাইনের খবর—ভবানীপুরের এক পুকুরে পাঁচ বছরের একটি বালক জলে ডুবে মারা গিয়েছে। মৃতের নাম জানা যায়নি, ঠিকানাও মেলেনি।

পরের প্রশ্ন : ভবানীপুরে কটা পুকুর আছে? বলি : একটিই, ওটি পদ্মপুকুর।

যাও, আজ একটাই কাজ তোমার। নির্দেশ সন্তোষকুমার ঘোষের। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা বিভাগের সর্বেসর্বা তিনি। সপ্তাহে একটি করে খেলার ফিচার লিখি আর লিখি প্রতিদিন তাঁর ও অমিতাভ চৌধুরীর নির্দেশে ফরমায়েসি খবর।

ভবানীপুর থানায় যেতেই ও সি বললেন, আরে ভাই ওই জলে ডোবার খবরের কিনারা করতে পারছি না। অথচ আপনাদের কাগজে লেখা হয়েছে খবরটি ভবানীপুর থানা সূত্রের। মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোনও গণ্ডগোল রয়েছে। ডায়েরিতে কিছুই নেই, দমকলও জানে না। কোনও হাসপাতালও জানে না।

ও সি বললেন, জিপ রেডি, যাবেন আমার সঙ্গে? চন্দননগর যাচ্ছি। কিছু খবর হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ওখানকার থানায় বসিয়ে রেখে কয়েকঘণ্টা ঘুরলেন তিনি। তারপর বললেন,

কাল আবার আসতে হবে। আপনার আসার দরকার নেই। রাতে ফোন করবেন। পরদিনও কিনারা করতে পারেননি। তৃতীয় দিন যা বললেন, সত্যিই 'গণ্ডগোল'। পুরো কেসটাই সাজানো। চন্দননগরের এক বিত্তবান পরিবারের তিন ভাইয়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ওই বালকটি। ওকে খুন করেছে দুই জ্যাঠা। খুন গোপন করার জন্যই ভবানীপুরে জলে ডোবার গল্প। এবং ভবানীপুর থানা মারফৎই ওটি আনন্দবাজারকে দেওয়া হয়।

তদন্তের পর সন্তোষদা সবচেয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় সেকেন্ড লিড করেছিলেন। একটি 'সামান্য' খবর কেমন করে অসামান্য হতে পারে শেখালেন তিনি।

১৯৭৬-এর ১ জানুয়ারির ইডেনে ক্রিকেট টেস্টের কথা হয়ত অনেকেই ভোলেননি। মাঠে অতিরিক্ত দর্শক ঢুকেছেন। গ্যালারিতে জায়গা নেই। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে। তখন তো ইডেনে এখনকার মতো এমন ফেন্সিং ছিল না। দর্শকরা বাউন্ডারি লাইনের ধারে। তবুও কুলোচ্ছে না। খেলা আরম্ভ করা মুশকিল। এদিকে পুলিশ বেশ তৎপর বাউন্ডারির ধার থেকে দর্শক সরাতে। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করছিলেন অতিরিক্ত দর্শক ঢোকা নিয়ে। পুলিশ তাঁর ওপর বেদম লাঠিপেটা শুরু করলেন। বাস, গোটা ইডেন গর্জে উঠল। লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। আগুন লাগানো হল ছাউনিতে। বেতের চেয়ারগুলো ছলছে। ভাঙচুর শুরু হয়েছে। খেলোয়াড়রা আতঙ্কিত। ক্লাইভ লয়েড ভুল করে ছুটতে ছুটতে গঙ্গার দিকে গিয়ে ফিরে আসেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। বাইরে বাসে ট্রামে আগুন। পুড়িয়ে দেওয়া হল স্পোর্টস ইউনিয়ন তাঁবু। খেলা হল না। কোনও রকমে বেড়া টপকে ফিরলাম অফিসে। দেখি ওই সাতসকালে অনেকেই হাজির। নিউজরুমে বসে সন্তোষদা, গৌরকিশোর ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, বরুণ সেনগুপ্ত, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু কুমার বসুও।

গৌরদা, বরুণবাবু, সুধাংশুবাবু, আমি কেউই খবর লেখার জন্য ইডেনে যাইনি। ছিলাম কেবল দর্শক। কিন্তু টেঁকি স্বর্গে গেলেও বোধহয় ধানভানে।

স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের লেখা ইডেনের রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন সন্তোষদা। দুটি ডাবল কলম রিপোর্ট ছিল। পড়েই ওর মেজাজ চড়ে গেল। আমরা যারা মাঠে গিয়েছিলাম সকলকে ডাকলেন। বললেন, যে যা দেখেছ লেখ। লালবাজার ও হাসপাতালে পাঠালেন জনা চারেক রিপোর্টার, দমকলেও দুজনকে। বললেন, কাল প্রথম পাতায় ইডেন সংক্রান্ত খবর যাবে। ফোটো বিভাগকে বললেন, সব রকমের ছবি চাই। ইডেনের ভেতরের, ট্রাম-বাস পোড়ানোর, তাঁবু ধ্বংসের ছবি। ইন্টারভিউ চাই দুই ক্যাপ্টেন-গ্যারি সোবার্স ও মনসুর আলি খান পতৌদির।

সন্তোষদা আমাদের প্রত্যেকের লেখা এডিট করলেন, হেডিং করলেন, ছবির ক্যাপসানও নিজ হাতে, প্রথম পৃষ্ঠার লে আউটও করলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম ব্যানার হেডিং। সম্পাদকীয়ও এই ঘটনা নিয়ে। পরিসংখ্যান দেওয়া হল ক্রিকেট মাঠে কবে এমন ঘটনা হয়েছে।

কলকাতার কোনও খবরের কাগজ সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকার মতো গুরুত্ব দেয়নি ইডেনের লঙ্কাকাণ্ডকে। পরদিন আমরা উপলব্ধি করি সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে অনাদের পার্থক্যটা কোথায়!

এক সপ্তাহ পরে যখন লন্ডন থেকে 'দা টাইমস,' 'দা ডেইলি টেলিগ্রাফ', 'দা গার্ডিয়ান' প্রভৃতি এল, তারাও দেখি আনন্দবাজারের মতোই গুরুত্ব দিয়ে ইডেনের খবর ছেপেছে। সোবার্সের বন্ধুর 'বারবাডোজ টাইমসে'ও আট কলম হেডিং প্রথম পৃষ্ঠায়।

এখন খেলা নিয়ে আকছারই প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে যে খবর হচ্ছে— ৩০ বছর আগে সন্তোষকুমার ঘোষ যে তার পথিকৃৎ, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। ১৯৬৭-তে প্রবীণদের কেউ কেউ কিন্তু বক্রোক্তি করেছিলেন সন্তোষদার সিদ্ধান্ত নিয়ে। পরে বোঝেন উনি কতটা অভ্রান্ত ছিলেন।

একজন বার্তা সম্পাদককে যে অলরাউন্ডার হতে হয়, বাংলা সংবাদপত্রে তার নজির তিনি যে কত রেখে গিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর শিষ্যরা তা জানেন।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সিনেমার জন্য পৃথক ফিচার পেজ হতে পারে। কিন্তু যাত্রা বা খেলার জন্য? ওই পাঁচ বা ছয়-এর দশকে একথা কেউ ভাবেননি। প্রবোধচন্দ্র অধিকারীকে দায়িত্ব দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার যাত্রাপাড়ার খবর, ছবি, যাত্রাশিল্পীদের সম্পর্কে নিবন্ধ— এসব ছিল তাঁরই পরিকল্পনা।

প্রতিদিনের খেলার খবরের জন্য পুরো পৃষ্ঠা তো থাকেই। কিন্তু তার জন্যই আবার পৃথক ফিচার পেজ? ১৯৬৫ তে বের হয় 'মাঠ ময়দান' প্রতি মঙ্গলবার। এর দায়িত্ব দেন নন্দীকে। সাহিত্যিক মতি নন্দী 'কালকেতু' ছদ্মনামে খেলার ফিচার লেখা আরম্ভ করলেন। আর এই আমার ওই পাতাতেই হাতেখড়ি হল খেলার লেখার। সাধারণ রিপোর্ট-এর ফাঁকে খেলা নিয়ে সপ্তাহে একটি করে লেখা। সেদিন থেকেই চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস হয়ে গেল 'চিরঞ্জীব'। মতি নন্দী খেলাকে বসোত্তীর্ণ করে তুললেন।

'কিনু গোয়ালার গলি,' 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে'র লেখক খেলাধুলা নিয়ে এত আগ্রহী? একদিন জিজ্ঞাসা করলাম খুব হোসমেজাজে পেয়ে, খেলাকে এত গুরুত্ব দেন কেন?

বললেন: অরণ্যদেবের পরেই লোকে খেলার খবর পড়ে। কাগজ চালাতে গেলে অনেক দিক দেখতে হয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে দিয়ে ক্রিকেট লেখান সন্তোষবাবুই। ওঁদের মিষ্টি লেখায় আনন্দবাজারের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল পাঠকদের।

১৯৬৯। সাঁতারু মিহির সেনের এয়ক্সপ্লোরার্স ক্লাবের দাঁড়ের নৌকো আনাদান অভিযানে যাবে। দুই অভিযাত্রী দাঁড় বেয়ে যাবে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার। ব্যাপারটা দুঃসাহসের। একদিন ডেকে বললেন, ওদের ব্যাপারটা দেখ তো। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। লেগে গেলাম ওর পিছনে। 'কানোজি আংরে' নৌকো তৈরি, অভিযাত্রী বাছাই। কলকাতা থেকে যাত্রা এবং আমিও হাফ অভিযাত্রী। কখনও ওদের পিছু পিছু, মাঝ দরিয়ায় হাজির যাওয়ায় বিমান বাহিনীর বিমানে চড়ে অনুসন্ধান। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের মাঝেও প্রতিদিন প্রথম পৃষ্ঠায় ডিউক-পিনাকীর খবর ফলাও করে। আনন্দবাজারে অনেকেই এর বিরুদ্ধে। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে অ্যাডভেঞ্চার? অন্যান্য কাগজ ছোট করে দু/একদিন পর ভিতরের পৃষ্ঠায় ওদের খবর লিখছে। গুঞ্জন শুনে তিনি সার্কুলেশন ম্যানেজারকে ডাকলেন। ডাক পড়ল তাঁর ঘরে আমারও। 'এই শোনো আর কিসসু না, আরও বিস্তারিত লিখবে অভিযানের খবর। যেভাবে হোক রোজ খবর চাই। খরচ নিয়ে ভাববে না।'

সার্কুলেশন ম্যানেজারকে ভয়ে ভয়ে পরে জিজ্ঞাসা করি, দাদা ব্যাপারটা কী? ওর উত্তর— তোমার গাঁজাখুরি খবরে আমার মিটার উঠছে, চালিয়ে যাও। মিটার-এ ঠিক হয়েছে, তোমার জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ থাকবে রোজ।

১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট ধ্বসে এনেছিল কংগ্রেসে। কিন্তু তা ছাপিয়ে যেতে পারে আ্যাডভেঞ্চারের খবর, বুঝি যেদিন আন্দামানে পৌঁছয় ডিউক-পিনাকী এবং যেদিন আন্দামান থেকে ওদের সঙ্গে দমদমে ফিরি রানওয়েতে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ ঢুকে পড়েছিলেন।

সন্তোষকুমার ঘোষের সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল সকলেই বুঝেছিলেন।

ওই আন্দামান অভিযানের পরে সারা পশ্চিমবঙ্গে পর্বত অভিযান, সাইকেলে ভারত পর্যটনে ঢেউ এল। এমনকী বিশ্বপরিক্রমায়ও বেরিয়ে পড়েন কেউ কেউ। আর ওই সব খবর ছাপার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় লাইন পড়ে যেত।

সিদ্ধান্তটা কার? সাগরময় ঘোষের, না সন্তোষকুমার ঘোষের কখনও জানার চেষ্টা করিনি। 'দেশ' পত্রিকার 'বিনোদন' সংখ্যায় নাটক নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। এমন কিছু জ্ঞানগর্ভ ব্যাপার নয়। কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকার বাংলা নাটক সম্পর্কে। সন্তোষদা বেছে বেছে আমাকে দায়িত্ব দিলেন। আমি তো থ। নাটক নিয়ে আমি? 'অনেক লেগ ওয়ার্ক আছে। শম্ভু মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ, নিবেদিতা দাস, মমতা চ্যাটার্জির কাছে যাবে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। ওঁরা যা বলবেন লিখবে।'

শম্ভু মিত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সন্তোষবাবুর। তবুও শম্ভু মিত্র বললেন, 'না কোনও কথা নয়। কথা বললেও লেখা চলবে না। যদি লেখ অস্বীকার করব।' কিন্তু তাহলে একজনকে তো নিতে হবে ওঁর বদলে। গেলাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সন্তোষ দা'র সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা ভাল ছিল না। অনেক লেখাতেই তিনি অজিতেশের কড়া সমালোচনা করেন। তবে নাটক সম্পর্কে ওঁর প্রজ্ঞাকে মর্যাদা দিতেন। অজিতেশবাবু যেদিন তাঁর বক্তব্যের প্রুফ দেখতে আনন্দবাজারে গিয়ে একটি ডায়ালগ বিভিন্ন ভঙ্গিতে শোনাচ্ছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে সন্তোষদা চলে এসে ক্ষমা চাইলেন। এবং একই ডায়ালগ বিভিন্ন স্বরে ও ভঙ্গিমায় বলা নিয়ে একটি লেখা ছাপলেন। সন্তোষদা তারপর সময় পেলেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। বলতেন শম্ভু মিত্র গ্রেট, অজিতেশ অতুলনীয়।

কখনও কখনও দেখতাম কি বার্তা বিভাগে এসে একে ওকে টাকা দিচ্ছেন পাঞ্জাবির বাঁ বা ডান পকেট থেকে মুঠো করে। বেশ কয়েকবার পেলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্যামলদাকে জিজ্ঞাসা করি — হঠাৎ টাকা কেন? জানান, ভাল হেডিং করলেই পুরস্কার দেন। তুইও ভাল কিছু কর, ইনাম পাবি। বকাঝকা করলেও ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়াতেও তিনি ছিলেন সবার উপরে।

উনি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রতি সপ্তাহে একটি কলাম লিখতেন —'সন্তোষকুমার ঘোষের কলম'। তাঁর সঙ্গে হেডিং, ঝরঝরে ও মুচমুচে ইঙ্গ্রো-র সঙ্গে ওই কলামের আসমান জমিন ফারাক। বড্ড প্যাচালো লেখা। বুঝতে হলে একাধিকবার পড়তে হত। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন: আমার লেখা পড়েছ। পড়তাম এই জন্যই, যদি ঠ্যাং জিজ্ঞাসা করেন।

অকপটে জানালাম, পড়েছি, তবে বড় কষ্ট হয় বুঝতে। 'আরও একজন একই কথা বলেছেন' ওঁর উক্তি। পরের সপ্তাহে দেখি ওঁর 'কলম' বের হল না। তারপরেও না।

এই-ই ছিলেন সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ। থামতে জানতেন।

ওঁর সবচেয়ে দুর্বলতা ছিল রবীন্দ্রনাথে। একদিন খুব চড়া মেজাজে বললেন, তুমি কমিউনিস্ট, তুমি কে জি বি-র এজেন্ট।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে। এরপর জিজ্ঞাসা, কিছু বলবে?

আমি, 'দেশ' পত্রিকায় রাশিয়ার লেখা সম্পর্কে বলছেন কী?

সন্তোষদা: হ্যাঁ, তাই। উত্তর আছে? অত প্রশংসা কেন?

একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন বুঝে বলি: এমন কিছু প্রশংসা করিনি। ওরা খেলাধুলায় ভাল, তাই-ই লিখছি। আর কে জি বি-র এজেন্ট? আমার আগে আরও একজন বাঙালি বড় এজেন্ট ছিলেন।

ওঁর কৌতূহলী প্রশ্ন: কে? কে? বিনীতভাবে বললাম, যিনি রাশিয়ার চিঠি লিখেছিলেন! রবীন্দ্রনাথ।

উনি এবার পিঠ চাপড়ে বললেন, যাও, নিজের কাজে যাও তো! আজকাল বড়দের সঙ্গে তর্ক করছ। □

বিশেষ নিবন্ধ

মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে পরিবেশসমস্যা

দেবকুমার বসু

মানব সভ্যতার আদি থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহার করে আসছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে মানুষ যেমন প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে তেমনই প্রকৃতি সম্পর্কে তার নিজের চেতনাও পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের পর্যায়ক্রমে পুনর্বিন্যাস তারই বহিঃপ্রকাশ। আদিতে প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের অবস্থা থেকে বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি তাকে উদ্ধত করেছে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তার অনেকটাই ছিল দৃষ্টির অগোচরে। আজকের পরিবেশসমস্যা বাস্তবিক পক্ষে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্বের পরিণতি। এই বিষয়ে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আদিম মানবসমাজে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ ব্যবহার করত পশুর চামড়া ও গাছের ছাল থেকে তৈরি পোষাক। দলবদ্ধভাবে তারা শিকার করত বন্যজন্তু। আগুন জ্বালাতে ব্যবহার করত প্রথমে পাথরের চকমকি। সম্ভবত প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বনের দাবানল থেকে তারা শিখেছিল কাঠে ঘর্ষণের সাহায্যে আগুন জ্বালাতে। জ্বালানী হিসাবে কাঠ সহজেই পাওয়া যেত বন থেকে। আদিম যুগ থেকে মধ্যযুগ পেরিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগতিতে শক্তির উৎস ছিল গাছের কাঠ। আদিম যুগে মানুষ যখন রৌদ্র, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মধ্যে প্রকৃতির বিধ্বংসী প্রকাশকে বুঝতে পারত না, তখন সে এগুলিকে দৈবীশক্তির প্রকাশ মনে করে বিভিন্ন রূপে প্রকৃতিকেই আরাধনা করত। কালক্রমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য যখন কিছু কিছু করে ভেদ করতে পারল, সেই অনুযায়ী তার জীবনযাত্রার ধরনও বদলাতে থাকল।

যুগের হিসাবে বেশিদিনের কথা নয়। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন মানুষের পূর্বপুরুষের প্রথম আবির্ভাব ২০ লক্ষ বছর আগে মাত্র। শিকার ও পশুপালননির্ভর যাযাবর জীবনের পরিবর্তে এবার পত্তন হল গ্রাম ও পরবর্তীকালে নগরভিত্তিক সভ্যতার। প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুসরণ করে প্রতিকূল অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ক্রমশই মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এল। এক নতুন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মানুষ প্রকৃতির সম্মুখীন হল।

সভ্যতার এই পর্যায়ে পৃথিবীতে জনসংখ্যার চাপ ছিল কম, পক্ষান্তরে প্রকৃতির সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপর্যাপ্ত। প্রকৃতির সম্পদের বৈশিষ্ট্য ছিল একবার ব্যবহার হলে সেগুলি আবার নতুন করে সৃষ্টি হত প্রকৃতির কল্যাণে। গাছের কাঠ বা ফল, ক্ষেতের ফসল, শিকার বা পালনের পশু সবই প্রকৃতি উদারভাবে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করে ফিরিয়ে দিত প্রতি বছর। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা সামঞ্জস্যমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই ভাবে কিন্তু দীর্ঘকাল এই সামঞ্জস্যের সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হল না। বিভিন্ন কারণে বনের উপর মানুষের চাপ বাড়তে থাকল। প্রথমত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে চাষের জন্য বনজঙ্গল কেটে নতুন নতুন জমি তৈরি করা দরকার হল। দ্বিতীয়ত, সভ্যতার উন্নত পর্যায়ে যখন তামা, ব্রোঞ্জ এবং লোহার ব্যবহার প্রচলন হল, তখন ধাতু গলানোর জন্য জ্বালানীর উপাদান হিসাবে অনেক বেশি কাঠের প্রয়োজন হল। এর পর যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন কাঠের চাহিদাকে তুলে দিল আর এক ধাপ ওপরে। শেষ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে জ্বালানী কাঠের অভাবে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ কষ্টকর হয়ে উঠল। মানুষ বাধ্য হল বিকল্প জ্বালানীর সন্ধান করতে। মানবসভ্যতায় এই হল প্রথম জ্বালানীর সংকট।

এই সময় মানুষ জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করতে শিখল মাটির ওপরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়লা। কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার ক্রমশই বাড়তে থাকল। লোহা গলিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য কাঠের বদলে ব্যবহৃত হল কয়লা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে কয়লার চাহিদা বেড়ে গেল বিপুলভাবে। মাটির ওপরে সহজলভ্য কয়লা শেষ হলে প্রয়োজন হল মাটির নীচ থেকে কয়লা সংগ্রহের। এইখানে একটা বড় রকমের বাধা উপস্থিত হল। কিছু দূর মাটি খোঁড়া হলেই চারদিক থেকে মাটির নিচের জল এসে কাজের জায়গা ভরে দিত। আর কাজ চালানো যেত না। তখনকার দিনের প্রযুক্তির পক্ষে মাটির বেশি নিচের জল ওপরে তোলা সম্ভব ছিল না। অথচ ক্রমবর্ধমান কয়লার চাহিদা না মেটাতে পারলে শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে অতিক্রম করে জল পাম্পের সাহায্যে ওপরে তোলার ব্যবস্থা তখনও আয়ত্ত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়লা সংগ্রহের পথে এই বাধাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা ঘিরেই শুরু হল আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে নিউকমেন্স আবিষ্কৃত পাম্প মাটির নীচের জল দরকার মতন উচ্চতায় তুলে আনতে পারল। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মেনস্ ওয়াট শুধু নিউকমেন্সের পাম্পের উন্নতি নয় বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করে বাষ্পীয় শক্তির ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সূচনা এইখান থেকে। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে পরিণত করল অফুরন্ত শক্তির উৎসে।

জ্বালানী কাঠ থেকে কয়লায় উত্তরণ সভ্যতার ইতিহাসে একটি নতুন যুগের উত্তরণ। কয়লার শক্তিকে অবলম্বন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে। কয়লা এখনও পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস। একদিকে কয়লার ব্যবহার যেমন মানুষকে প্রকৃতির শক্তিকে নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিল অপরদিকে এর মধ্য দিয়েই মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটল যার তাৎপর্য দীর্ঘকাল দৃষ্টির অগোচরে ছিল।

কয়লা আসলে কোটি কোটি বছর মাটির নীচে চাপা পড়া গাছেরই প্রস্তরিভূত রূপ। কয়লার উপাদান কার্বন, যা গাছ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আহরণ করে সঞ্চয় করে রাখে তার কোষে। প্রায় ৩৫ কোটি বছর ধরে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীন যুগের গাছকে প্রকৃতি রূপান্তরিত করেছে কয়লায়। কয়েক কোটি বছরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে কয়লা তৈরি হয় তা পুড়িয়ে শেষ করতে মানুষ সময় নেয় কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এর ফলে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পদের মধ্যে শুরু হল এক অসম প্রতিযোগিতা। গাছের কাঠ যখন জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হত, বৎসরান্তে প্রকৃতি গাছের ডালপালা ও নতুন গাছের সৃষ্টি করে তা পূরণ করে দিতেন। যতদিন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এই ধরনের সহাবস্থান ছিল ততদিন পরিবেশে ভারসাম্যের অবস্থা বজায় ছিল। কয়লার প্রবর্তন এই ব্যবস্থার একেবারে পরিপন্থী। যে হারে মানুষ কয়লার ব্যবহার করে সেই হারে প্রকৃতি তা পূরণ করতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধের এই মূল সূত্রটি মানুষের দৃষ্টিতে ছিল না কয়েক শতাব্দী যাবৎ।

বিশ্বের সমস্ত দেশ আজ শিল্পবিকাশের জন্য সচেষ্ট। কারখানা, রেলগাড়ি, যে কোনও ধরনের যন্ত্রপাতি যা বাষ্পের শক্তিতে চলে এবং সবার উপর বিদ্যুৎ উৎপাদন, সবেরই মূলে আছে কয়লার কার্বনজনিত তাপশক্তি। তার জন্য কয়লার ব্যবহার বাড়ছে সব দেশেই। ভূতাত্ত্বিকদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর কয়লা সম্পদ শেষ হতে লাগবে কমবেশি একশো বছর। সভ্যতার ইতিহাসে কয়লার ব্যাপকভাবে প্রয়োগ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধরলে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই কয়লার যোগান শেষ হতে পারে। তাই কয়লার বিকল্প অন্য ধরনের জ্বালানীর কথা বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই চিন্তা করছেন যাতে মানুষকে গুরুতর জ্বালানী সংকটের মধ্যে পড়তে না হয়। ইতিমধ্যে কয়লার সঞ্চয় শেষ হবার আশঙ্কাকে অতিক্রম করে সূত্রপাত হয়েছে নতুন ধরনের সঙ্কটের চিন্তা। পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক কালে প্রকাশ করেছেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী ঘিরে আকাশে মেঘের মতন এক নতুন আস্তরনের সৃষ্টি হয়েছে যার প্রধান উপাদান কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্যাস। এই গ্যাসীয় আস্তরনের ঘনত্ব বেড়েই চলেছে এবং তার উৎস পৃথিবীর কলকারখানার চিমনি, গাড়ির ধোঁয়া, উনুনের ধোঁয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কয়লা পোড়ানোর ব্যবস্থা। এই গ্যাসীয় মেঘে মিথেন, ওজোন, সালফারজাত এবং নাইট্রোজেনজাত গ্যাস। এই গ্যাসীয় মেঘকে নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাস। বিজ্ঞানীরা গাছ নিয়ে গবেষণা করার জন্য স্বচ্ছ কাঁচ বা প্লাস্টিকের আবরণে ঘেরা ঘর তৈরি করেন যার মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করলেও ভিতরে জল ও তাপকে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আকাশের ওপরের স্তরে ক্রমশ ঘনায়মান আস্তরণ এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করছে পৃথিবীকে ঘিরে। পৃথিবীতে সূর্যের রশ্মি যতটা আসে তার সবটাই যদি পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকত তা হল পৃথিবীর অবস্থা দাঁড়াত অন্যান্য গ্রহের মতন যেখানে কোনও প্রাণের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু কার্যত তা হয় না বলেই পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালার জীবন সম্ভব হয়েছে। সূর্যের উত্তাপের একটা বড় অংশ পৃথিবীর থেকে

প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় মহাকাশে। এই ভাবে প্রকৃতি পৃথিবীতে উত্তাপের ভারসাম্য বজায় রেখে এসেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে উত্তাপের এই ভারসাম্য আর বজায় থাকবে না। গ্রীনহাউস গ্যাসজনিত সমস্যার কার্যকারণ এবং সুদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত, যদি পৃথিবীতে গ্রীনহাউস গ্যাস সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ এখনকার মতন চলতেই থাকে তাহলে বেশ কিছুদিন, সম্ভবত একাধিক শতাব্দী ধরে, পৃথিবীর উত্তাপ বাড়তেই থাকবে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে ১৮৮০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর উত্তাপ বেড়েছে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (বা সেন্টিগ্রেড)। আবহাওয়া তত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অনুমান আগামী ২১০০ সালে এই উত্তাপ বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১.৫ থেকে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীতে কয়েকবারই উত্তাপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ওঠা নামা করেছে। ফলে পৃথিবী যেমন উত্তপ্ত হয়েছিল তেমনই আবার শীতল হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বরফের পাহাড় জমেছিল। এই সময়কে আইস্ এজ বা হিমযুগ বলা হয়। শেষ হিমযুগের হিসাব ১৮,০০০ বছর আগে, যখন এখনকার পৃথিবীর গড় তাপাঙ্ক ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের তুলনায় ছিল ৫ ডিগ্রি কম। অর্থাৎ তাপাঙ্কের মাত্র কয়েক ডিগ্রির তফাৎ প্রকৃতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলাফল কি ধরনের হতে পারে তা এখনও বিচারসাপেক্ষ। তবে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশেরই অভিমত, এর ফলে মেরুপ্রদেশ ও পর্বতাঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের জল বাড়বে। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা ২১০০ সালে প্রায় ১৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার, অধিকাংশের মতে ৫০ সেন্টিমিটার বেড়ে যেতে পারে। তার প্রভাবে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বাড়বে, জলপ্লাবিত হবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। মহাসাগরের দ্বীপগুলির অনেকগুলিই, যেমন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে, ভারত মহাসাগরে, দ্বীপগুলি জলের নীচে তলিয়ে যাবে। এ ছাড়া সম্ভাবনা আছে বহু অঞ্চলের অরণ্যের বিনাশ এবং উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে নতুন মরুভূমি সৃষ্টির। এর প্রভাব ইতিমধ্যেই দেখা গেছে কয়েকটি অঞ্চলে। উত্তরমেরুর তুষার অঞ্চল থেকে একটি দ্বীপের সমান এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বরফ গলে। ইউরোপে ভূ-মধ্য সাগরের তীরে ভেনিস শহরে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ায় বিপন্ন হয়েছে বিখ্যাত ওই প্রমোদকেন্দ্র। বিস্তর খরচ করে চেষ্টা করা হচ্ছে সমুদ্রের ধারে দেওয়াল তুলে রক্ষা করতে ভেনিসকে। ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার জুড়ে সমুদ্রের ওপর। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে বড় বড় নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে সৃষ্টি হয়েছে ব-দ্বীপগুলি সমুদ্রতলের থেকে সামান্য উচুতে। সমুদ্রে জলের উচ্চতা বাড়লে এইসব অঞ্চলে জলপ্লাবন এবং জোয়ার ভাঁটার প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কলকাতায় গঙ্গার জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। সুন্দরবন ও সংলগ্ন বাংলাদেশের অরণ্যাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের নীচে চলে যাবে।

গ্রীনহাউস গ্যাসজনিত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সমস্যার উপশম সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করছেন বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা। একটা বিষয়ে সকলেই একমত, আধুনিক সমাজে কয়লার ব্যবহার অনেকটাই কমানো যায়। একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে কম কয়লার সাহায্যে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং অন্যদিকে শিল্পে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কম বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন অব্যাহত রেখে কয়লার ব্যবহার কমানো যায়। এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলিতে সাম্প্রতিককালে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো গেছে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে এখন থেকেই আমাদের চিন্তা করতে হবে কীভাবে কয়লার মতন সীমিত সম্পদের বিকল্প অন্য কোনও শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সৌভাগ্য, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা এদিক থেকে অনেক দূর এগিয়েছেন। জল, হাওয়া, সূর্যরশ্মি, সমুদ্রের ঢেউ, পৃথিবীর গভীরের তাপ, সব কিছু নিয়েই এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এই ধরনের অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার জন্য। অনেকেই মনে করেন একবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে এই ধরনের বিকল্প শক্তির ব্যবহার ব্যাপকতর হবে। ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সৌরশক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। ভারতবর্ষ ও চিন দেশগুলিতে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ছে। দুই দেশেই গোবর গ্যাসের চুল্লির ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়েছে। সৌরশক্তির ব্যবহারও দুই দেশে বাড়ছে। চিন দেশে ছোট ছোট জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহার হচ্ছে।

এছাড়াও আছে পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তির কথা। পরমাণু শক্তির সাহায্যে ১ কেজি ইউরেনিয়াম থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লার প্রয়োজন হয় ৩৫,০০০ কেজি। কিন্তু ইউরেনিয়ামও খনিজ পদার্থ, তারও সম্পদ সীমিত। তাই বিজ্ঞানীরা এর বিকল্প পদার্থ থেকে পরমাণুর শক্তি সংগ্রহ করার চিন্তা করছেন। পারমাণবিক বিদ্যুতের কতগুলি বিশেষ ধরনের অসুবিধা, এমনকী ক্ষতিকারক সম্ভাবনা থাকার ফলে ওর প্রয়োগ ব্যাপক হয়নি। একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যেসব বর্জ্যপদার্থ অবশিষ্ট হিসাবে পড়ে থাকে সেগুলো এত বেশি তেজস্ক্রিয় অবস্থায় থাকে যা যে কোনও প্রাণীর পক্ষে বিপজ্জনক। এই তেজস্ক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য বর্জ্যপদার্থগুলিকে দীর্ঘকাল, বিশেষ ক্ষেত্রে শতাধিক বৎসর, মোটা আচ্ছাদনে ঢাকা দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার হয়। কোনও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ু শেষ হয়ে গেলে তাকে অন্য সাধারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতন ফেলে রাখা যায় না। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ, ভিতরের দেয়াল সবই তেজস্ক্রিয় হয়ে যায়। পরে ক্রমশ বাইরের দেয়াল পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যকরী সময় শেষ হলে সেগুলি পুরু কংক্রীটের আবরণে ঢাকার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তেজস্ক্রিয়তা বাইরে না বেরতে পারে।

বিশ্বের পরিবেশ সমস্যা আজ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমাদের প্রচলিত ধারণা ও চিন্তা নিয়ে তার সমাধান হওয়া যাচ্ছে না। কাঠ, কয়লা, তেল এই সমস্ত প্রকৃতিদত্ত সম্পদকে অবলম্বন করে মানবসভ্যতা এতকাল ধরে অগ্রসর হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রীনহাউস গ্যাসের মতন যে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে তা প্রায় আকস্মিকভাবে প্রকৃতির পরিহাসের মতন প্রকট হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্যের যে অবনতি ঘটেছে তার প্রতিকার করতে গেলে গ্রীনহাউস গ্যাস সৃষ্টিকারী উপাদানগুলির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এর বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে মানুষকে ক্রমশই বেশি করে নির্ভর করতে হবে সেই সব উপাদানের ওপর যা প্রকৃতি বারবার নতুন করে সৃষ্টি করে যেমন জল, হাওয়া, সমুদ্রের ঢেউ সূর্যের আলো এবং ভূগর্ভের তাপ যা পাওয়া যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। এগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরীক্ষা এখন আর শুধু গবেষণার বিষয় নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ চলছে বিশ্বজুড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুদেশে সবরকম অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার হচ্ছে এবং তা ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। সৌরশক্তি ও গোবর গ্যাসের ব্যবহার সমস্ত রাজ্যেই শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এখানেও এর ব্যবহার ক্রমশই বাড়বে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের মধ্যে গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রতিবিধানে গাছের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। গাছ বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বাতাস পরিশোধন করে। তাই ব্যাপক বনসৃজন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে। গাছের আর একটি ব্যবহার হয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাঠ পুড়িয়ে গ্যাস উৎপন্ন করতে। এই গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলায় গোসাবা দ্বীপে এই রকম ব্যবস্থা করে স্থানীয় বাজার এবং আবাসিকদের বাড়িতে আলোর সুযোগ করা হয়েছে।

আলোচনার উপসংহারে বলা যায় আদিম যুগ থেকে মানব সমাজ দীর্ঘকাল ধরে শক্তির উৎস হিসাবে নির্ভর করে এসেছিল প্রকৃতির পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের উপর যা পাওয়া যেত প্রকৃতির ক্ষুদ্রচক্রের আবর্তনের নিয়ম অনুসারে। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক সহাবস্থানের সম্পর্ক। প্রয়োজনের তাগিদে একদিন বনের সম্পদ, প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হল শক্তির সন্ধানে নতুন পথে যাত্রা। পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের জায়গায় এবার নির্ভর হল প্রকৃতির নিঃশেষযোগ্য সম্পদ খনির কয়লা ও তেল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি যখন মানুষকে প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছে মনে করা হচ্ছিল তখন প্রায় আকস্মিকভাবেই আবির্ভাব হল পরপর পরিবেশের বিচ্ছিন্ন সমস্যা যার মূলে রয়েছে সেই কয়লা ও তেল। বিশ্বজুড়ে তখন নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কয়লা ও তেলের ব্যবহার সংযত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই সাহায্যে আবার পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদকে শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে কি করে ফিরে পাওয়া যায়। ফিরে পাওয়া যায় প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ। এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠবে একবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে।*

* গ্রীনহাউস গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর উত্তাপ ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে Inter Governmental Panel for climate changes-এর ১৯৯৫ সালের রিপোর্ট থেকে। ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ কিয়োটোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শীর্ষ নেতাদের সম্মেলনে এই সব তথ্য আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ সমালোচনা নিবন্ধ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : সাহিত্য ও সমাজভাবনা

উৎপল ঝা

এইসব ভেজা হাত অঙ্গুলিকে শক্ত করে দিতে চাই। অনন্তকালের সব প্রথা ভেঙে ফেলি। উত্তরে আসাদ। ধারালো কলমে জিভে যত হাঁকো ডাকো— সংঘাত স্থগিত থাক। জীবন তো একবারই। কিছুই তো করা হল নাকো।

যিনি অনন্তকালের সব প্রথা ভেঙে ফেলে, জীবনকে মহার্ঘ মেনে সাহিত্যে তাকেই উপজীব্য করে সাহিত্যকীর্তির মধ্যগগনে দাঁড়িয়েও 'কিছুই তো করা হল নাকো' বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি আজ দুই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী অথচ প্রবল প্রতাপশালী কথাশিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মানুষের বিশেষত নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনের ভেতরকার কোনও গভীর সত্য বা প্রশ্নের উন্মোচনকে আজকের কথাসাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আজকের মানুষ তাঁর কাছে সরলরৈখিক একমাত্রার সহজবোধ্য মানুষ নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা জটিলতার ফাঁসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষকে, তার স্বপ্ন, সাধ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, বেদনা ও প্রতিরোধের টানাপোড়েনে বহিস্থ ও অভ্যন্তরীণ সত্তার তথা লৌকিক-অলৌকিক, স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘর্ষের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াসে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র, অন্য ঘরে অন্য স্বরের স্রষ্টা হিসাবে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর লিখনশৈলী, মুখের ভাষার তীক্ষ্ম-তির্যক ব্যবহার, ক্ষোভ ও ব্যঙ্গের নিপুণ মিশ্রণ, উপভাষার তীক্ষ্ণ মোচড়ে রসবোধ ও ব্যঞ্জনার বিস্তার, কাব্যিক প্রতিবেশ নির্মাণ তাঁর লেখায় ভিন্নতর মাত্রা সংযোজন করেছে। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান প্রবণতা যাঁর কাছে 'একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে একটি মাত্র কাহিনী বয়ন করে চলেছে' বলে প্রতিভাত হয় তিনি স্বীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন থেকে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নেবেন এই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উত্তরসূরি হিসাবে তিনি গ্রামীণ মানুষের তথা গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগ্রাসী বিস্তার গ্রামীণ জীবনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট গল্পে যে ছোট দুঃখ, ছোট প্রাণ-এর কথা বলেছিলেন ইলিয়াস দেখেছেন এমন ছোট প্রাণ বা ছোট দুঃখ বলে আজ আর কিছু নেই —'প্রতিটি ছোট দুঃখের অন্তরালে রয়েছে বিরাট প্রেক্ষাপট তার জটিল চেহারা ও কুটিল উৎস।' টেলিভিসন কিংবা কমপিউটার ইন্টারনেটের প্রযুক্তিকে আজ যেভাবে মধ্যবিত্ত এমনকী নিম্নবিত্ত মানুষের নাগালের মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে তাতে করে একদিকে তা যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক ধরনের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিচ্ছে অন্য দিকে তা বিত্তহীন মানুষের মনে অলীক অভীপ্সা ও স্বপ্নের বীজ বপন করছে, এক চেষ্টায় সে নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে, রুজি-রোজগারের প্রয়াসের মধ্যেও যে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে সংযোগ সূত্রও আজ বিচ্ছিন্ন, তাই 'মধ্যবিত্তের জন্য মধ্যবিত্তের দ্বারা অধীত, সংস্কৃতির প্রাণরস মাটির সংস্রব হারিয়ে শুকিয়ে এসেছে। সংখ্যাধিক্য মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ না ঘটলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংস্কৃতি বিপন্ন হতে বাধ্য।

সাধারণ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে রাজনৈতিক শক্তি আজ অমোঘ হয়ে উঠেছে। ইলিয়াস এই ধারণা পোষণ করতেন যে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ তাদের উপর সংঘটিত শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিরোধে যখনই কোনও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, উচ্চকোটির মানুষ নিজস্বার্থে সে আন্দোলনের অভিমুখ পাল্টে দেওয়ার জন্য কৌশল হিসাবে গৌণ কোনও আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তিনি দেখেছেন কীভাবে তেভাগা আন্দোলনের অভিঘাত পাকিস্তান দাবির আন্দোলনের নীচে চাপা পড়ে গেছে।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী ইলিয়াস মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিভূতিভূষণের কালে যে-ব্যক্তিমানুষকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি

আজ পুঁজিবাদের মুমূর্ষু ক্ষয়ের যুগে সেই ব্যক্তির পচন ও ক্ষত থেকে অনবরত পুঁজ রক্ত ঝরছে। এই সমাজটাকে, সমাজের এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে, তার বিকৃতিকে যথার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে, প্রয়োজনে তীব্র কষাঘাতে চিত্রিত করা প্রয়োজন যাতে করে পচা-গলা সমাজের প্রতি ঘৃণার উদ্রেকের মাধ্যমে সমাজে, মানুষের মধ্যে জীবনের, সুস্থ সংস্কৃতির আকুতি তথা আর্তি সৃষ্টি করা যায়।

যৌনতা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাষ্য রয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনে, মুখের ভাষায় যে তথাকথিত অশ্লীল শব্দ অহরহ অনুরণিত হয়, তাকে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের আলোকে বিচার করলে ভুল হবে এবং নিষ্ফল মধ্যবিত্তজীবন যে যৌনতার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি করবেই এমনতর বিশ্বাসে তিনি স্থিত ছিলেন। নীতিবাগীশতা বিষয়টি মার্কসবাদের সঙ্গে খাপ খায় না তাঁর এমনতর ঘোষণা বিতর্কেরও সূচনা করেছে। এ ক্ষেত্রে লেখকের বিশ্বাসের ভূমির সংলগ্ন হওয়া একান্ত জরুরি। তিনি মনে করতেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রে কমিউনিস্টদের জন্য আলাদা কোনও নৈতিকতা থাকতে পারে না, কারণ সেও এই বুর্জোয়া সমাজেরই অংশবিশেষ। কমিউনিস্টদের যে দর্শন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, তার অভীষ্ট লক্ষ্য এবং তার নিজস্ব ভাল-মন্দ-দুর্বলতা সবটা নিয়েই রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই তাকে সমাজের অসাম্য ঘোচানোর লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। লোভ-হিংসাসহ মানবিক দুর্বলতাগুলি তার মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকতেই পারে, সেই সব নিয়েই সে বাস্তব মানুষ। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের দুর্বলতা, দোষ যদি কিছু থাকে তাকে অস্বীকার করে সংগ্রামী মানুষ হিসাবে, শুধুই গুণের আধার হিসাবে চিত্রিত করার মধ্যে বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে ফাঁকিবাজি শুচিবায়ুগ্রস্ততাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ক্ষয়ের ভূমিকে সংগোপনে ব্যাপ্ত হতে দেওয়া হয়।

নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতির মূল আধার হল তার জীবিকা। শুধু বিনোদনের জন্য নয়, শ্রমকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও যার সংস্কৃতি তাকে প্রেরণা দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে, প্রকৃতির কোলে নানা সংঘর্ষের মধ্যে যে সংস্কৃতির উদ্ভব তার সঙ্গে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতির যোগসূত্র আজ ছিন্ন হতে বসেছে। অথচ শহরের শিকড়হীন সংস্কৃতির মূলে সংখ্যাধিক্য দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতির প্রাণরস সঞ্চার করার কথা—তা যদি না হয় এই দুই শ্রেণীর মানুষের সংযোগ স্থাপনের সব প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বঞ্চনা অবসানের ক্ষেত্রে অগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্বপ্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়াসও কোনওই অভিমত সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না বরং বিত্তহীন মানুষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচারের ক্ষেত্রে সামান্যতম ভ্রান্তি ঘটলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনে যে অবজ্ঞার জন্ম দেবে তাতে উভয়েই উভয়ের প্রতি আস্থা হারাতে বাধ্য হবে। ইলিয়াস এই সব বিশ্বাসের কথাই তার নিবন্ধগুলিতে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দরিদ্র মানুষকে শুধুই ভোটার হিসাবে চিহ্নিত করার সঙ্কীর্ণ প্রবণতা আজ সর্বব্যাপ্ত।

শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে যথার্থ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার জন্য, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তার জীবনকে যেমন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জানতে হবে, তেমনই তার মুখের ভাষা, ভাষার অলঙ্কার, প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, তার কবিসত্তার প্রকাশ, লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় আবেষ্টনীর সামগ্রিক বাতাবরণের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন তা তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সুতরাং ভাষাকে পারিপার্শ্বিকতা থেকে ছিন্ন করে নিয়ে আলাদা বিচার করতে বসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনেক সময় তা শালীনতার পরিপন্থী বলে পরিগণিত হতে পারে। এই আশঙ্কার কথাও ইলিয়াস তুলে ধরেছেন।

আমরা জানি লেখকের জীবনবোধ, তার দর্শন তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ, তাঁর পঠন-পাঠন, পারিবারিক জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলিত প্রভাবে গড়ে ওঠে। কখনও কখনও এই উপাদানগুলির কোনও একটির বিশেষ প্রভাব যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে অধিকতর প্রাধান্য পেলে, আবেগ যুক্তিকে অতিক্রম করে গেলে বিশেষ ঝোঁক বা অবসেশনের জন্ম দিতে পারে।

বোধের নেপথ্যে লেখকের যে ইতিহাসচেতনার উন্মেষ ঘটে তার জটিল প্রক্রিয়ার সবটা দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষমতাবান লেখক হিসাবে যাঁরা স্বীকৃতি পান তাঁদের লেখায় ব্যক্তিনির্ভর কাহিনীকাঠামোর মধ্যেও ব্যক্তিকে অতিক্রম করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদাম-হতাশা, স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের আনন্দ-বেদনা সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। ইলিয়াস তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং সমাজের বর্তমান অবস্থানবিন্দুতে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের দু-দুটি উথালপাতাল করা আন্দোলনের অব্যবহিত আগের অবস্থার নিরিখে জাতির মনে সঞ্চারিত খোয়াব কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে সমগ্র জাতির জীবনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছে, তিনি তাকে নিপুণতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন।

দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ চরম হতাশার মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে পাথেয় হিসাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। এই ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে মৌলবাদের বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই। সাধারণ মানুষ ধর্মকে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার কথা ভাবতেই পারেন না।

বরং মৌলবাদীরা দুর্বল মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও প্রবণতাগুলিকে 'সুচালো' করে নিয়ে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। ইলিয়াস মনে করতেন, মৌলবাদকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশবিশেষ। দরিদ্র মানুষের অধিকার অর্জনের লড়াইকে অবদমিত করার জন্য তাদের প্রয়োজন মৌলবাদকে উস্কে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব। বাঙালি জাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ইলিয়াস বুঝেছেন যে উভয়শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিকাশধারার উন্মেষ — বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের তুলনায় প্রায় একশ বছর পরে ঘটেছে। ১৯২৬-এ মৌলানা আজাদ (ইসলামিয়া) কলেজের প্রতিষ্ঠার আগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে আত্মঅন্বেষণের কোনও প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। মৌলবাদীরা ঠিক এই সুযোগটুকুকেই কাজে লাগিয়ে চলেছেন।

(৩)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখায় বাস্তব ও ফ্যান্টাসির ভেদরেখা অনেক ক্ষেত্রেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে — এ ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব কিছু ভাষা রয়েছে। ইলিয়াস মনে করতেন অনেক আশাভঙ্গের পরেও মানুষ স্বপ্ন দেখে — কারণ এই স্বপ্নই নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকতে প্রেরণা যোগায়। নতুন পরিস্থিতি ও আন্দোলনের মধ্যে যে-স্বপ্নের উদ্ভব হয়, সে-স্বপ্নের সমাধি ঘটলেও নতুন এক স্বপ্নের জন্মও অলক্ষ্যে ঘটে যায়। ব্যক্তিমানুষের স্বপ্ন যখন জাতির জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে যায় তখন সমগ্র জাতির প্রত্যাশার সঙ্গে সেই ব্যক্তিস্বপ্নের একটি সমীকরণ ঘটে।

নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা, নিজস্ব অভ্যাস ও সংকোচ বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে-কোনও লেখক সাধারণভাবে নিজের পরিচিত, ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত রীতির বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন না, কারণ নিজের খ্যাতি বজায় রাখার একটা দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন না। বিশেষত বাণিজ্যিক পত্রিকাগুলি নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, ঝুঁকিহীন মসৃণ পথে মুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য। এহেন অবস্থায় সৃষ্টিশীল লেখকের ভাবনার প্রকাশ, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিনগুলি পাশে দাঁড়াতে পারে। কারণ বাণিজ্যিক কোনও প্রতিশ্রুতির কাছে সে বাঁধা নয়। শুধু নিটোল গল্প উপন্যাসের আশায় নয়, প্রথা ভেঙে, ঝুকি নিয়ে জীবনের সমস্ত সংকট, ক্ষয় ও রক্তপাতের কঠিন পথ অনুসরণ করাই লিটল ম্যাগাজিনগুলির কাছে গৌরবময় বলে প্রতিভাত হয়। লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে আজীবন সৃষ্টিশীল রেখেছে, প্রথা ভেঙে নতুন পথের অন্বেষণে সতত সক্রিয় রেখেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকীর্তি বিচার করার ক্ষেত্রে স্বভাবতই লেখকের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তাঁর জীবনবোধ, দর্শন, মানসিকতা তথা অভ্যন্তরীণ আকুতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যদিও এ কথা ঠিক মানুষের অন্তর ও বাহিরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য, তার দ্বন্দ্ব, তার আলোআঁধারিসহ সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন কাজ এবং সৃষ্টিশীল মানুষ তথা শিল্পীর ক্ষেত্রে সে কাজ কঠিনতর। তবুও শুধু তত্ত্ব দিয়ে লেখকের লেখাকে বিশ্লেষণ না করে, বাস্তব অবস্থার নিরিখে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকের কোন সাহিত্যভাবনা চারিত হয়েছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে কি না, পাঠকের মনে প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও অভীপ্সা তৈরি করেছে কি না সেই বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই তত্ত্বকে খুঁজতে হবে, আরোপিত তত্ত্বের আধারে নয়।

ইলিয়াস রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবশ্যপাঠ্য বলে মনে করতেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনও বাঁধা ধরা ছক মেনে চলেননি এবং অমোঘ কোনও কিছুকে স্পর্শ করার ফতোয়াও দেননি। রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তিনি নিজের মতো করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এবং কখনও কখনও তাঁদের সেই আখ্যানকে তিনি বিনির্মাণ করে নিয়েছেন।

লেখক-ইলিয়াসের মধ্যে কিছু জটিলতা, দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধিতা ছিল এবং তা একান্তই স্বাভাবিক, তাঁর লেখায় সে ছাপ প্রত্যক্ষ কিন্তু বিত্তহীন মানুষের জীবনের প্রতি, তার দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি তার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ তাঁর লেখায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। বয়সের হিসাবে মধ্যযৌবনেই তাঁর জীবনসূর্য-অস্তমিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। শিল্পীর গভীর অতৃপ্তিবোধ, মৃত্যুর আগাম অতিচেতনাও তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। এত অল্প সময়কালে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে অভিঘাত ও তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন ওপার বাংলার কূল ছাপিয়ে আজ তা এপার বাংলাকেও প্লাবিত করতে ছুটে এসেছে।

'চিলেকোঠার সেপাই' প্রসঙ্গ

এই বাংলার মানুষের কাছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরিচয় 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের মাধ্যমে। বাংলাদেশের উনসত্তরের গণজাগরণের উত্তেজনা-সংঘর্ষে ঠাসা সময়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। তিনি সেই সময়ের মানুষের আন্দোলনের স্বরূপকে তার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় কার্যকারণকে, বিদ্রোহী সত্তাকে নির্মল নৈর্ব্যক্তিকতায় মহাকাব্যিক

মেজাজে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের বিস্তৃত জীবনের সমগ্রতাকে এই উপন্যাসে শরীরী প্রতিমা দেবার চেষ্টা করেছেন।

এই উপন্যাসে যেমন হাড্ডি খিজিরের মতো লুম্পেন ধরনের চরিত্রকে আন্দোলনের পুরোভাগে আনা হয়েছে তেমনই এসেছে দেশভাগের পরে ভারত থেকে উৎপাটিত নিঃসঙ্গ মধ্যবিত্ত চরিত্র ওসমান। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসনা অনেক কিন্তু লক্ষ্য পূরণের জন্য সক্রিয় সংযোগের অভাব। মধ্যবিত্তরা যদি তাদের সংকীর্ণতাকে, আবেগানুভূতিকে কখনও কখনও প্রচলিত মূল্যবোধগুলিকে বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসতে পারে তবেই সমাজের যথার্থ পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবস্থায় ওসমানের সেই প্রয়াস অনিকেত পরিণতি লাভ করে। 'আনোয়ার' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপর একটি অংশ যারা জীবন ও জগৎকে রাজনৈতিক তত্ত্বের আধারে ফেলে বিচার করার প্রয়াস করে। ফলে জনগণের সঙ্গে একটি অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব সূচিত করে। আসলে আনোয়ার ও ওসমান সম্মিলিত ভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীকেই বোঝায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে দোদুল্যমানতা রয়েছে তাতে একজন যখন এগিয়ে যায়, অন্যজন তখন পিছিয়ে পড়ে। এই দুজনের অবস্থানবিন্দুই নির্ধারণ করে অগ্রগতি বা পশ্চাৎপদতার পরিমাপকে। আলীবক্স বা চেংটুর মতো চরিত্ররা গ্রামের 'জেনুইন মানুষ' যদিও তারা সংগঠিত নয়, নেতৃত্বও তাদের হাতে নেই। সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে আলী বক্সের মতো মানুষের ওপরেই আস্থা রাখা যেতে পারে। লেখক 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর বিভিন্ন চরিত্র প্রসঙ্গে এমনতর বিশ্বাসের কথাই তুলে ধরেছেন।

তবে একথা ঠিক যে প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'চিলেকোঠার সেপাই' এর বিভিন্ন চরিত্র কিছুটা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় — তারা যেন বিকশিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

পৃথ্বীশ সাহা সম্পাদিত 'আখরুজ্জামান ইলিয়াস: সাহিত্য ও সমাজভাবনা' শীর্ষক গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই শিবের গীত গাওয়া। ১২৮ পাতার একটা রোগা অথচ সমৃদ্ধ বই এতটাই উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করে যে গতানুগতিক সমালোচনার ধারায় তার আলোচনা সীমায়িত করা যায় না। বইটির তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়: ইলিয়াস রচনা। এখানে কয়েকটি কবিতা, দুটি নিবন্ধ, একটি গল্প ঠাঁই পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়: ইলিয়াস আলোচনা। এখানে ইলিয়াসের দুটি উপন্যাস এবং গল্পগুলি সম্পর্কে সমালোচনা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় পর্যায়: ইলিয়াসের উদ্দেশে। এতে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সম্পাদক শ্রীসাহা জানিয়েছেন, 'মনস্ক বাঙালী পাঠকবর্গের কাছে ইলিয়াসরচনার বৈশিষ্ট্য, তাঁর সমাজ ও সাহিত্যভাবনার গভীরতা অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি প্রাথমিক পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই সংকলন প্রকাশ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রন্থটি প্রকাশের পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার আগেই ইলিয়াস লোকান্তরিত হয়েছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে মহাশ্বেতা দেবী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য, সৈকত রক্ষিতের ইলিয়াস সম্পর্কে মূল্যায়ন রয়েছে। রয়েছে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর দুটি কবিতায় ইলিয়াসকে স্মরণ। এখানে সকলেই ইলিয়াসকে বিরল ও শক্তিশালী লেখক হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন — তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রথম পর্যায় সম্পর্কে এই নিবন্ধের প্রথমাংশে লেখকের নিজস্ব ভাবনার উপর ভিত্তি করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ইলিয়াসের উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্পর্কে বিভিন্ন জনের সমালোচনাগুলি ও ইলিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে পুনরালোচনা করা যেতে পারে। পৃথ্বীশবাবু এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেছেন, বাহান্নর ভাষা আন্দোলন সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বাঙালি জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে তা ক্রমশ আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্যের কারণে ঘনীভূত হয়। এই উপন্যাসে বাঙালি জাতীয় সত্তার — এই উন্মেষ ও বিস্ফোরণের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আন্তঃসম্পর্ক ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, সংশয় ও পিছুটানের কথাও আশ্চর্য নিপুণতায় ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের বহির্বাস্তবের সঙ্গে অন্তর্জগতের বিস্তার উপন্যাসটিকে ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই উপন্যাসে নৈরাশ্যের বাতাবরণকে তিনি দুর্বলতার দিক বলে চিহ্নিত করেছেন এবং ইলিয়াস একজন সমাজ সচেতন লেখক হওয়া সত্ত্বেও কেন এমনটা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে বলেছেন, এই গণআন্দোলনের প্রায় আঠারো বছর পরে উপন্যাসটি রচিত হওয়ায় উত্তরপর্বের জাতীয় জীবনের নৈরাশ্য হয়ত বা লেখকের অগোচরেই উপন্যাসদেহে সঞ্চারিত হয়েছে। সামরিক শাসনপিষ্ট জনগণ জাতীয়তাবাদী আবেগে পাকিস্তানের শাসনপাশ থেকে মুক্তি কামনায় এতটাই উদ্দীপিত হয়েছিল যে গণজাগরণের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু এই গণবিক্ষোভ ক্রমে শুধু 'ধূসর বিবর্ণতাই' লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ড. বিষ্ণু বসুর সঙ্গে ইলিয়াসের সাক্ষাৎকার স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে ইলিয়াস বলেছেন — 'বাংলাদেশ আন্দোলনে তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেল। তার পরিণতি এক বছরে সব শেষ।'

কিন্তু পৃথ্বীশবাবু লেখককে, 'সমাজসচেতন লেখক,' 'দ্বান্দ্বিকতা ও শ্রেণী সম্পর্ক বিষয়ক তাঁর ধারণাও অস্বচ্ছ নয় উপন্যাসে' এমন মন্তব্য করার পরই যখন, 'অনুপুঙ্খ বিচারে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু স্ববিরোধিতা, অস্বচ্ছতা,

শ্রেণীশোষণ প্রক্রিয়া বিষয়ে রয়েছে ভাসা-ভাসা ও ছকবদ্ধ ধারণা' এমন মন্তব্য করেন তখন আর একটি স্ববিরোধিতার জন্ম হয়। একথা ঠিক এই উপন্যাসে কিছু দুর্বলতা, ভাবনাগত অস্বচ্ছতা চোখে পড়ে। এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যখন লেখক লিরিক পত্রিকার শাহাদুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, আনোয়ারের তুলনায় ওসমানের জীবনকে দেখার ভঙ্গিটা সঠিক কারণ আনোয়ার তত্ত্ব দিয়ে জীবনের বিচার করে কিন্তু ওসমান জীবনকে দেখে তার অনুভূতি আর আবেগ থেকে। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও লেখক বলেন 'কাণ্ডজ্ঞান থেকেই মানুষ তত্ত্বে পৌঁছাতে পারে, কম্যুনিজিম বোঝার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন নেই।' যুক্তি অপেক্ষা আবেগ তথা অনুভূতিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেই 'ধারণাগত অস্বচ্ছতার' বীজ রোপিত হয়।

আনোয়ার যখন কৃষকফ্রন্টের কাজে গ্রামে যায়, সে গ্রামের অনুপুঙ্খ বিবরণে, প্রতীক ও সংকেতের সূক্ষ্ম ব্যবহারে কাব্যময় চিত্রকল্প রচনায় ইলিয়াস যে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেও পৃথ্বীশবাবু অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেন যে, 'শৈল্পিক পরিমণ্ডল রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্য সত্ত্বেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এই অংশে অবিন্যস্ত' এবং 'কিছুটা বৈপ্লবিক কল্পকাহিনী হয়ে গেছে এই গ্রামীণ অধ্যায়টি।'

ইলিয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন, মধ্যবিত্তের নানা হতাশা ও নিষ্ফলতাই যৌন বিকৃতির জন্ম দেয়। মধ্যবিত্তের মানসিক বৈকল্য বোঝাতে তিনি যৌনবিকৃতির প্রসঙ্গকে প্রতীক আকারে উপস্থাপন করেছেন। পৃথ্বীশবাবু যখন চিলেকোঠার সেপাইতে যৌনবিকৃতি ও আত্মরতিকে মাত্রাতিরিক্ত বলে গণ্য করে তার বাস্তবতাতে এবং 'লেখকের অব্‌সেশন' রয়েছে বলে সংশয় প্রকাশ করেন তখন 'বাস্তবতাকে বাস্তবতার নেশায়' দেখতে চাওয়ার তাঁর নিষ্ঠার মধ্যেও মাত্রাতিরিক্তের অতিরেক ঠাঁই করে নেয় কি না এমন সংশয় সৃষ্টি হয়। লক্ষণীয় যে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের জীবন চিত্রণে তিনি কখনওই যৌন বিকৃতির কোনও প্রসঙ্গকে প্রশ্রয় দেননি। দ্বিতীয়ত সমস্ত প্রথা ভেঙে ফেলার একটা অস্থিরতাও লেখককে তাড়িত করেছে।

যাই হোক, 'বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, দ্রুত পরিবর্তমান ও ঘূর্ণাবর্ত সময়, অসংখ্য বিচিত্র চরিত্রের উপস্থাপনায় চিলেকোঠার সেপাই-এর বহির্বাস্তবটি যেমন নিপুণ দক্ষতায় নির্মিত তেমনই তার অন্তর্জগতের বিস্তারটি অনুভবের তলদেশকে উষ্ণতায় স্পর্শ করে', পৃথ্বীশবাবুর এই মূল্যায়ন ও দৃষ্টিকোণ এই ব্যতিক্রমী উপন্যাসটিকে নতুনতর ভাষ্যে বিবৃত করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস এই আশ্বাস বহন করে আনে যে, মধ্যবিত্তেরা তাদের আত্মকেন্দ্রিকতার 'চিলেকোঠা' থেকে বেরিয়ে এলে হয়ত বা মিললেও মিলতে পারে মুক্তির বহুধা বিস্তৃত পথ।

প্রসঙ্গ : খোয়াবনামা

'চিলেকোঠার সেপাই' থেকে 'খোয়াবনামা'য় পৌঁছাতে ইলিয়াস প্রায় একদশক সময় নিয়েছেন। এই এক দশক লেখককে যেমন পরিণত ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে তেমনই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও অনেক অস্বচ্ছতা দূরীভূত করেছে।

ড. বিষ্ণু বসু এই দুই উপন্যাসের চারিত্রধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'চিলেকোঠার সেপাই'তে ফ্যানটাসিকে বাস্তবতায় এবং 'খোয়াবনামা'য় বাস্তবতাকে ফ্যানটাসিতে রূপ দেওয়া হয়েছে।' ইলিয়াস সে কথা স্বীকার করে নিয়েই বলেছেন, 'খোয়াবনামায় ফ্যানটাসিটা অনেক বেশি,' একটা গোটা কমিউনিটি এই খোয়াব দেখছে। যদিও 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর মতোই 'খোয়াবনামা'ও শেষ হয় চরম হতাশা ও নৈরাজ্যে। মুন্সির এতকালের অধিষ্ঠান, সমস্ত মিথ যাকে ঘিরে বিকশিত হয়েছে সেই পাকুড়গাছটি কাটা পড়েছে, 'খোয়াবনামা' কুলসুমের বেহাত হয়েছে, স্বপ্ন যারা দেখত তারা সকলে আহত বা মৃত, বিদ্রোহীরাও ফেরারী।

পৃথ্বীশবাবু সম্পাদকীয়তে যথার্থই বলেছেন 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর উৎফুল্ল পাঠকের পক্ষেও খোয়াবনামার জটিল ও বিচিত্র জগৎ 'ঝটিতি পাঠে রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।' আবার এও সত্য যে, 'প্রতিটি বাক্য যেখানে গভীর ব্যঞ্জনাময়, প্রতিটি খোয়াব যেখানে রূপকথার জিজ্ঞাসা, প্রতিটি গান ও শোলক যেখানে ইতিহাসনির্ভর, প্রতিটি উপমা যেখানে কাব্যিক — যেখানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলে তৈরি হয় এক অখণ্ড কালপর্ব, সেই উপন্যাসের জগতে প্রবেশ তো এক অন্য অভিজ্ঞতা ও আনন্দ।'

ড. বিষ্ণু বসু খোয়াবনামা প্রসঙ্গে ইলিয়াসের সাক্ষাৎকারের সূচনায় আর একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন —'চিলেকোঠার সেপাই' এবং 'খোয়াবনামা' দু' দুটি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার প্রেক্ষাপটে রচিত।

খোয়াবনামার সময়সীমা ১৯৪৪-৪৮। এর ফলে আবির্ভাব ঘটল ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের। আর চিলেকোঠার সেপাই উনসত্তরের অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে। এর ফলে পাকিস্তান ভেঙে আবার দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম — পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। সে দিক থেকে উপন্যাস দুটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

'খোয়াবনামা' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় খালিকুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন, 'কৃষক ও ধীবর জীবনের নানা মিল ও অমিল, পেশা নিয়ে রেষারেষি, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, নানা বিশ্বাস,

ব্যক্তিক, বিকার, সংস্কার ইত্যাদির সূক্ষ্ম, বিস্তৃত এবং একই সঙ্গে রসাত্মক ও নৈর্ব্যক্তিক নির্মাণ দেখতে পাই এই উপন্যাসে।' তবে যখন তিনি বলেন দূর অতীতের কোনও ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ কম, চেনা সুরের প্রতিই মানুষের আগ্রহ বেশি, তখন অনায়াসে সে অভিমত মেনে নিতে দ্বিধা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রশ্নটা চেনা বা অচেনার নয়, প্রেক্ষাপট যাই হোক লেখক কোথায় স্বচ্ছন্দ, কোথায় উত্তীর্ণ সে বিচারই মুখ্য হওয়ার কথা।

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস প্রশ্ন তুলেছেন, 'কিন্তু এই নৈরাজিক বাস্তবতায় কি আছে কোনও সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত?' লেখকের ভাবনার অনুসারী হয়ে বলা যায়, সাম্প্রতিক কথা সাহিত্য পাঠকের মনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাসার উদ্রেক করতে পারছে না। তিনি তাঁর উপন্যাসে সেই জিজ্ঞাসার উদ্রেক করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের শেষে 'ভাতের প্রতি মনোযোগের দুর্বোধ্য ইঙ্গিত' প্রসঙ্গে ফুলজানের ভাবনার অনুসারী হওয়া যায়, 'এ কি (সখিনা) আর শোলক গাঁথতে পারবে? কে জানে কী শোলক গাঁথে!' সে কি নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার কচি 'কুশি' বের হওয়ার আশ্বাস বহন করে আনে না!

এই উপন্যাসটি পড়তে বসে এপার বাংলার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটির কথা কেন যেন মনে ভেসে ওঠে। 'খোয়াবনামা' ও 'অলীক মানুষ'-এ দুস্তর ফারাক। দু'জনের দু' উপন্যাসের কোনওভাবেই প্রতিতুলনা চলে না। দুটিই অসামান্য উপন্যাস। তবু যখন 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়, 'দীর্ঘ প্রায় একশ বছরের বিস্তার। বর্ণনা, মিথ ও কিংবদন্তীর সমাহার।' 'হিন্দু-মুসলমান জীবনের এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটি সত্যিকার সনদ' 'লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার পরস্পর বিপরীত গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয় এবং কীভাবে মিথের বিষয় হয়ে ওঠে... বঙ্গভূমির ইতিহাসের এক সন্ধিকালের প্রামাণ্য দলিল' তখন অজ্ঞাতসারেই 'খোয়াবনামা' ও 'অলীকমানুষ' এক ক্ষীণ সংযোগসূত্রে বাঁধা পড়ে। দুটিই অনন্য। দুটি উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যকে গৌরবের শিখরে স্থাপন করেছে।

মহাশ্বেতা দেবীকে লেখা চিঠি এবং শাহাদুজ্জমান সাহেবকে দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জেনেছি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় ইলিয়াস একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'বহু প্ল্যান' করা সেই উপন্যাস রচনার রসদও তিনি সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সে উপন্যাস, তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর স্বপ্ন ও বিকাশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা আমাদের সংক্রামিত করে। অবশ্য বার্ধক্যকে তিনি চিরকাল এড়াতে চেয়েছেন, বার্ধক্য তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। হাতের তালুতে মৃত্যুর অগ্রিম উত্তাপ ভিন্ন বার্ধক্যকে এড়ানোর উপায় কী!

ছোটগল্প

এপার বাংলার খুব অল্পসংখ্যক পাঠকের কাছেই ইলিয়াসের গল্পগ্রন্থগুলি পৌঁচেছে। তাঁর উপন্যাসদুটির মতো, স্বভাবতই, গল্পগুলির পরিচয় এপার বাংলায় ততটা বিস্তৃতি পায়নি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে ইলিয়াসের সাহিত্যের পথে চলা শুরু। তার প্রায় এক দশক পরে ১৯৭৬-এ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' প্রকাশিত হয়। শেষ গল্পগ্রন্থ 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় 'খোয়াড়ি', 'দুধভাতে উৎপাত', 'দোজখের ওম'। প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশের এক দশক পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' এবং তার একদশক পরে তাঁর দ্বিতীয় তথা শেষ উপন্যাস 'খোয়াবনামা' প্রকাশিত হয়েছে।

ইলিয়াসের ছোটগল্প সম্বন্ধে সুশান্ত মজুমদার এবং হিমিত পাল দুটি নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হিমিত পাল গল্পকার ইলিয়াসের মধ্যে কবি ইলিয়াসকে আবিষ্কার করেছেন, তাঁর আপাত রুক্ষ গদ্যের অন্তরালে কবিতার নরম জমি খুঁজে পেয়েছেন, যে নরম জমির আভাস ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দ, সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ কবির কবিতায়।

সুশান্তবাবু তাঁর নিবন্ধে ইলিয়াসের গল্পে ব্যক্তিবাদের প্রাধান্যে বীট ও হাংরি আন্দোলনের প্রতি ইলিয়াসের এক সময়ের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করছেন। ইলিয়াস ব্যক্তিমানুষের অন্তর্লীন সত্তার ময়নাতদন্তে তার পতন, স্খলন, তার দারিদ্র, তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, তার সংগ্রামী মানসিকতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। সুশান্তবাবু ইলিয়াসের গল্পের নানা বৈশিষ্ট্য যেমন ডিটেলস-এর কাজ, ব্যক্তিবিশেষকে আলাদা করে নিয়ে চরিত্রের ভেতরে সামাজিক বা শ্রেণীর 'অন্দর সংবাদ' বের করে আনার প্রয়াস, গল্পের মধ্যে অনেকগুলি উপগল্পের আশ্চর্য অবিচ্ছেদ্য বুনন, চরিত্রকে শুরুতে নেতির দৃষ্টিতে বর্ণনা করে মানুষের দুর্বলতা, আশা ও অনুমোদন চারিয়ে দিয়ে তাকে ইতির ভূমিতে স্থাপন প্রভৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সচেতন বা মনস্ক পাঠক ছাড়া অন্য কারও পক্ষে ইলিয়াসের রুক্ষ, কঠিন, তীব্র শ্লেষবাহী এবং দীর্ঘ বাক্যবন্ধ বিশিষ্ট গল্পগুলি থেকে রস আহরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

একই সঙ্গে ইলিয়াসের গল্পে মৃত্যুচেতনা ও রোগভোগের প্রতি সংবেদনশীলতা অনুভব করা যায়। তাঁর মা বেগম মরিয়ম ইলিয়াসের দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকা এবং অসুখ-বিসুখের প্রতি প্রকাণ্ড উদ্বেগ কোনওভাবে ইলিয়াসের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

তাই তাঁর অনেক গল্পে সে প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। নিরুদ্দেশ যাত্রায় 'রঞ্জু', প্রতিশোধে 'আবদুল গণি', যোগাযোগে 'রোকেয়ার মামা', ফেরারীতে 'হানিফের বাবা', অন্য ঘরে, অন্য স্বর গল্পে 'প্রদীপের বাবা,' অসুখ-বিসুখে 'আতমন্নেসা' তারাবিবির মরদপোলায় 'রমজান আলী'... মিছিল করে অসুস্থ মানুষের নানা প্রসঙ্গ ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে উঠে এসেছে। একই অনুষঙ্গ এসেছে 'দুধভাতে উৎপাত', 'কান্না', 'দোজখের ওম' এবং 'ফোঁড়া' গল্পে।

ত্রিশটিরও কম গল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ, পায়ের নিচে জল, তারাবিবির মরদপোলা, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, অপঘাত, যুগলবন্দি, দখল প্রভৃতি গল্প বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ বলে চিহ্নিত হওয়ার দাবি রাখে।

দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও তাঁর অনেক গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর অনেক গল্পের চরিত্র পরবর্তীকালে উপন্যাসে বিস্তৃতিলাভ করেছে। ইলিয়াস জানিয়েছেন এ ক্ষেত্রে তিনি গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের অনুসারী। অনেক পাঠক ইলিয়াসের গল্পে দীর্ঘ বাক্যবন্ধের মধ্যে অযথা জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস খুঁজে পান। কিন্তু ইলিয়াস মনের অন্ধকার জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণের কাজে এই বাক্যবন্ধের ব্যবহারকে অনিবার্য বলে মনে করেছেন। এই জটিলতার বেড়া ভেঙে মনস্ক পাঠক যখন ইলিয়াসের গল্পের চরিত্রের অন্তঃস্থলকে আবিষ্কার করেন তখন তাঁর সাহিত্যপাঠে তাঁর মন অনির্বচনীয় আনন্দ ও অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। ইলিয়াস আবারও প্রমাণ করেন 'সৃষ্টির প্রাচুর্য নয় 'সৃষ্টির মান' সাহিত্য বিচারের বড় মাপকাঠি।

(৪)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকৃতি ও সমাজভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। সম্পাদক পৃথ্বীশ সাহা নান্দীমুখ, মুক্তাক্ষর, পর্বান্তর, বাগর্থ, দিবারাত্রির কাব্য, অপর, অমৃতলোক, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা—এদের সমবেত প্রয়াসে বাঙালি পাঠকের হাতে যে পরিশ্রমের ফল অমূল্য উপহার হিসাবে তুলে দিয়েছেন সেজন্য উভয় বাংলার মনস্ক পাঠক তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। এই প্রয়াস আগামী দিনে ইলিয়াসের সাহিত্যকে আরও অনুপুঙ্খ বিচারের ক্ষেত্রে যেমন সহায়ক হবে, তেমনই বাংলা সাহিত্যে ইলিয়াসের অবস্থানকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রকেও সমৃদ্ধ করবে। ইলিয়াসের লৌকিক-অলৌকিক, স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘর্ষে মথিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের গাঙে নব নব আবিষ্কারে নতুনতর ব্যঞ্জনা ও নতুনতর তাৎপর্য বহন করে আনবে। □

'খোয়াবনামা' প্রসঙ্গে

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' এপ্রিল ১৯৯৬-এ প্রকাশিত। ঠিক এক বছর পর বইটি পড়ার সুযোগ হয়। বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলের ভাষা, অন্ত্যজ বা পিছড়ে বর্গের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, মিথ-প্রবাদ-ইতিহাস, জাদু বাস্তব বা magic reality সহ ফর্মের পরীক্ষা ইত্যাদি আমার মতো পাঠককে ঘাবড়ে দেয় বা পড়ায় নিরুৎসাহিত করে। বেশ কিছু উপন্যাস পড়েছি যেখানে এই সব উপাদান (এক বা একাধিক বা সবক'টি) উপস্থিত। দুঃখের কথা এই যে, আমার পড়া এই জাতীয় প্রায় সবক'টি বাংলা উপন্যাস হতাশ করেছে আমাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যেন শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর আয়োজন। 'খোয়াবনামা' পাঠের শুরুতে আমি এই সংশয়ে আচ্ছন্ন ছিলাম। ওই উপন্যাসটি পড়া শেষ হয় মাস তিনেক আগে। আমার ভাললাগাটুকু এখনও অমলিন। আমার বিশ্বাস এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য। আমার বিশ্বাসের ভিত্তি কী সে কথা পাঠককে জানাতে চাই।

(২)

পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) ভাষার সঙ্গে সামান্য পরিচয় থাকলেও তার গ্রামাঞ্চলের ভাষা, মাঝি, কামার ইত্যাদি শ্রেণীর ভাষার সঙ্গে কোনও পরিচয় নেই।

'তুই আমার ভাতে পাও দিস। এই নাপাক ভাত হামি এখন মুখত তুলি কাংকা কর্যা।' (পৃ. ১৮-১৯)...

'এ মাঝির বেটা, ইংকা করা লাঙল ধরলে মাটির মদো ঠেলতে কষ্ট হয় গো। গোরু কাংকা হাপস্যা যাচ্ছে দ্যাখো না? (পৃ: ৫৪)

এই ভাষা আমাদের কাছে একটু খটমট। কিন্তু এই ভাষার জোরেই, বর্ণিত দেশ ও কাল কাঁধে নিয়ে, উপন্যাসের চরিত্রগুলি পাঠকের দরবারে হাজির হয়; তাদের সঙ্গে চলতে চলতে ভাষাটা রপ্ত হয় এবং চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে ওঠে। ইলিয়াসের ভাষা একই সঙ্গে ফর্ম নিয়ে তাঁর পরীক্ষার অপরিহার্য বাহন হয়ে উঠেছে।

বাঙালি নদীর পথভোলা রোগা একটি স্রোত এসে মিশেছে সেখানে, কাৎলাহার বিলে। বিলের শিওরে পাকুড়গাছে বসে সকাল থেকে শকুনের চোখে মণি হয়ে ঢুকে মুনসি সূর্যের আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রোদে মিশে গিয়ে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে ওম দেবে বিলের গজার আর শোল আর রুই আর কাৎলা আর পাবদা আর ট্যাংরা খলসে আর পুঁটির হিম শরীরে। আর হয়রান হয়ে পড়লে পাকুড়গাছের ঘন পাতার আড়ালে কোনও হরিয়াল পাখির ডানার নিচে ছোটো একটি লোম হয়ে নরম মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে সারাটা বিকাল ধরে। [পৃ: ১০-১১]

এখানে গদ্য অনায়াসে সরে এসেছে কবিতার কাছাকাছি আর অবাস্তবের এক বাস্তব ছবি আঁকা হয়ে আছে।

'আরে না। খবর সিটা লয়। সব্বোনাশ হয়ে গেছে।'

'বৈকুণ্ঠদার হাতের আঙুল....'

'আরে দূর। সব্বোনাশ হচ্ছে। বিলের উত্তর সিথানত পাকুড়গাছ খুঁজ্যা পাই না।'

'নাই। গাছ কাটিছে'।....

'মুনসির গাছ কাটা অতই সোজা? কার হাতোত এক্কা জোর আছে। রে'?

'মুনসি গাছেত চড়্যা উড়াল দিছে'। [পৃ: ২৫৩]

কত বড় বড় সর্বনাশের ঘটনা ঘটল, কিন্তু তমিজের বাপের কাছে সে সব ঘটনা নয়। কারণ এই সব তো তার নিত্য অভিজ্ঞতা, তাই গা-সহা। তার গা ছমছম করে পাকুড়গাছ খুঁজে পায় না বলে। এখানে সংস্কার বা প্রবাদ বাস্তবের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করে জাদু-বাস্তবতা।

(৩)

ইলিয়াসের কৃতিত্বের আর একটা দিক হল স্ল্যাং বা খিস্তির প্রয়োগ। অশ্লীল অশ্রাব্য শব্দগুলি শহুরে শিক্ষিত মানুষ সমাজে উচ্চারণে লজ্জা পায়, লিখতে সংকোচ বোধ করে। ইলিয়াস অসংকোচে অনায়াসে তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখে এমন সব শব্দ বসিয়েছেন যার একটিও অসঙ্গত বা অশ্লীল মনে হয় না।

জমি চায় লাঙলের ফলা, বুঝলু? জমি হল শালার মাগী মানুষের অধম, শালী বড়ো লটিমাগী রে, ছিনালের একশ্যাষ'। [পৃ. ৫৪]

'আরে ঐ মাঝিই তো তোর লাঙ রে মাগী। মাঝির গায়ের আঁশটা গন্ধ না পালে তোর ঘ্যাগখান খালি চুলকায়। মাঝির জামাতে নামাজ পড়লে হামার বলে জাত যায়, আর মাঝির চাটটা ঘ্যাগর মধ্যে সান্দায়া লিয়া নিন্দ পাড়লে দোষ হয় না, না? জাউরা মাগী, হামি খবর রাখি না, না'? [পৃ: ২০১]

যে পরিস্থিতিতে চাষি হুরমতুল্লা মাঝির বেটা তমিজকে এই উপদেশ দেয় অথবা বাউণ্ডুলে কবি কেরামত নিজের অপদার্থতা আড়াল করতে বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চিহ্ন চাপা দিতে তার বিবি ফুলজানকে কথাগুলি বলে সেই পরিস্থিতিতে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ অপরিহার্য। এমন অব্যর্থ নির্ভুল প্রয়োগের খুব বেশি উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োগ যে অব্যর্থ ও অপরিহার্য উপন্যাসটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে যে ওই পরিস্থিতিতে স্ল্যাং চরিত্রগুলিকে সজীব করে তোলে। স্ল্যাং-এর প্রয়োগে ইলিয়াসের মুন্সীয়ানার প্রমাণ 'খোয়াবনামা'র পাতায় পাতায়, কিন্তু যে দু'টি মাত্র উদাহরণ পেশ করেছি সেই দু'টি চয়নেই আমার অস্বস্তির শেষ নেই। এর প্রধান কারণ এই যে, উদাহরণগুলি এখানে এভাবে পেশ করার সময় মনে হচ্ছে তারা বেআব্রু হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে বুঝিবা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করছি। অথচ, পড়ার সময় তো এমন মনে হয়নি। তাহলে, পাঠক বুঝুন, যে বাক্য বা বাক্যাংশ উপন্যাসের শরীরে স্বাভাবিক বা যথাযথ কিন্তু কেটে তুলে আনলে অশ্লীল মনে হয় সেই বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ কতখানি অনিবার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে মাগী, পাছা, ছিনাল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালের লেখকদের রুচি, শিক্ষা ও পরিবেশ এমনই যে তাঁরা প্রায় সকলেই স্ল্যাং-এর ব্যবহার যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন। আজ যা স্ল্যাং গতকাল তা হয়ত স্ল্যাং ছিল না এমন হতেই পারে। তাছাড়াও, একথা মানতেই হয় যে, স্ল্যাং এর নির্ভুল প্রয়োগের জন্য যে অভিজ্ঞতা ও সাহসের প্রয়োজন, যে দক্ষতার প্রয়োজন তা অধিকাংশ লেখকের মধ্যেই অনুপস্থিত।

(৪)

সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্নে বহুবার বিশ্বের নানা প্রান্তে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বাংলায় সম্ভবত 'প্রজাপতি' উপন্যাসের ভাষা নিয়ে শেষবার এই বিতর্ক ওঠে। প্রধানত নারী পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ ও মিলনদৃশ্যের বর্ণনা যেখানে সেখানেই প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্নটা হল এই যে, ওই বর্ণনা কী শিল্পের স্বার্থে অবশ্যপ্রয়োজনীয় না কি অরোপিত? শিল্পের স্বার্থ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। পাঠকের সুস্থ মনে কোনও বর্ণনা যে-ছবি আঁকে তা যদি রসসৃষ্টি করে তবে সে-বর্ণনা সার্থক। যে-বর্ণনায় সুস্থ স্বাভাবিক মনেও যৌনকামনার ভাব প্রবল হয় তা সাহিত্য নয়। বহুশত মিলনদৃশ্য, রতিক্রিয়ার বর্ণনা সত্ত্বেও আমাদের রামায়ণ বা মহাভারতকে কেউ বলেনি অশ্লীল। জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এ রাধাকৃষ্ণের দৈহিক মিলনের যে বর্ণনা আছে তা নিখুঁত। অথচ গীতগোবিন্দম শুনে চোখ জলে ভাসে এমন রসিক মানুষের অভাব নেই। নারী-পুরুষের মিলনদৃশ্য প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় নয় আবার ফরমান জারি করেও সে আলোচনা নিষিদ্ধ করা যায় না। পৃথিবীর বহু নিষিদ্ধ উপন্যাসই মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু অভিযোগমুক্ত হয়েছে বলেই 'প্রজাপতি' রসোত্তীর্ণ বা মহৎ সাহিত্য এমন দাবি করা যায় না।

এত লম্বা ভূমিকার কারণ এই যে, আলোচ্য উপন্যাসে একাধিক মিলনদৃশ্য বর্ণিত। কিন্তু তা কি শ্লীলতার গণ্ডি ডিঙিয়েছে?

পেটুক বাপের আধপেটা খাওয়া গতরের তাপ নিতে তমিজ হাত বাড়ে কুলসুমের পিঠে, তমিজের বাপের তাপ পোয়াতে তাকে নিবিড় করে টেনে নেয় নিজের শরীরে। পাযের দুটো ঘা থেকে তার আধপেটা গতরের গন্ধ নিতে কুলসুম হাত বোলায় তমিজের হাঁটুতে আর উরুতে। আর তমিজের বাপ অনেক দূরে কাৎলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয় তমিজের তখন আর কুলসুমের শাড়ি। গরহাজির মানুষটার গায়ের গন্ধ পেতে আর গায়ের গন্ধ শুঁকতে দুজনে ঢুকে পড়ে দুজনের ভেতরে। [পৃ: ২৬৩]

তমিজ আর তার 'বাপের বৌ' কুলসুমের এই মিলনদৃশ্যে তমিজের মৃত বাপ তার দারিদ্র নিয়ে উপস্থিত থাকায় এই দৃশ্য পাঠকের মনে কামোত্তেজনার পরিবর্তে মানবিক সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে, বর্ণনা রসোত্তীর্ণ হয়। 'সোয়াবনামা'র প্রতিটি মিলনদৃশ্যই শিল্পের শর্ত পূরণ করে।

(৫)

'সোয়াবনামা' কি ঐতিহাসিক উপন্যাস? কাকে বলে ঐতিহাসিক উপন্যাস তা নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্য যে উপন্যাসের অনাতম উপাদান তাকে এককথায় ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনও দলিল নয়, তথ্যের বিবরণ বা ব্যাখ্যা নয়। সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু ইতিহাসাশ্রিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা ঐতিহাসিক তথ্যে বোঝাই, তথাপণ্ডিও আছে। কিন্তু তা আদৌ সাহিত্যপদবাচ্য কি না তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। 'সোয়াবনামা' উপন্যাসেও প্রচুর ইতিহাসের উপাদান। সেই সঙ্গে আছে গুজব, প্রবাদ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করেননি, 'মিথ' ব্যবহারে কুণ্ঠিত হননি। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম লিগের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, দেশভাগ ইত্যাদি এই উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। ওই সময়ের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উল্লেখ থাকলেও তাঁদের ভূমিকা এই উপন্যাসে অতি গৌণ, কিন্তু সাধারণ মানুষের যে ছবি পাই তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। উপন্যাসের কোথাও দেখি প্রবাদ সত্যের আসনে, ঐতিহাসিক সত্য কি না কেউ জানে না, সংস্কার এমনই দৃঢ় যে জানার প্রয়োজনও বোধ করে না। কিন্তু জমিদারের নায়েব যখন প্রয়োজন বোধ করে, প্রবাদের অর্থ বদলে দিতে চায় তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আতঙ্কিত হয়, তাদের বিশ্বাস আহত হয়। ভবানী যে মা ভবানী তা তারা জানত না, জেনেও মানতে চায় না। তাদের ভবানী — ভবানী পাঠক, যে গোরাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, যার সঙ্গী ছিল মজনু শাহ। খুব তুচ্ছ একটা প্রবাদের ব্যাখ্যা বদলে গেলে কী প্রতিক্রিয়া হয় লেখক তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। অন্যদিকে, তেভাগা আন্দোলনের সত্যকাহিনী গিরিরডাঙ্গা, নিজাগিরিরডাঙ্গার ছোটলোক চাষির বুকে প্রায় অবিশ্বাস্য, প্রায় গুজব বা স্বপ্ন হয়ে গান করে। ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ তো দূর, আধাভাগও পায় না তারা, জোতদার নানা অছিলায় কেড়ে নেয়। তারা নিজেরা যে লড়াইটা করতে পারেনি সে লড়াই-এর গুজব তাদের অন্তরে, তাদের চেতনায় ঢেউ তোলে। মিথ্যা আশ্বাসে (পাকিস্তান হলে তেভাগাও হবে) তারা ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু তমিজ ছোটে তেভাগা স্বপ্নের দেশে। তমিজের বাপ যদি মিথ-এর শিকার, তো এই উপন্যাসে তেভাগা স্বপ্নের শিকার তমিজ। □

গ্রন্থ সমালোচনা

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর প্রবন্ধ

সুধীর চক্রবর্তী

পণ্ডিত ও স্মৃতিশাস্ত্রী দক্ষিণারঞ্জনের নাম আমজনতার কাছে আজ অপরিচিত ও অজ্ঞাত। তার কারণ আমাদের জনপ্রিয় পত্রপত্রিকার আর প্রচার মাধ্যম তাঁকে কখনও গুরুত্ব দেযনি। মানুষটি এ কালের নন। ১৮৯৪ সালে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার আমতলি গ্রামে। বছর সাতেক বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হলে মাতামহের বাগবাজারের বাড়িতে আশ্রয় পান। সেই থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী। তাঁর লেখাপড়া, অধ্যাপনা, যাপন ও প্রয়াণ গাঙ্গেয় সমভূমিতে। ১৯২২ সালে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি পান। ১৯৬১ সালের বর্ষশেষে প্রয়াত হন। বহু কৃতী ছাত্রদের মধ্যে বিষ্ণু দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, চিফ জাস্টিস বিজন মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম অগ্রগণ্য। চার্বাকদর্শন ও হিন্দু শাস্ত্রের আচারমার্গ বিষয়ে তাঁর লেখা ইংরাজি বইগুলি প্রসিদ্ধ। তুলনায় বাংলাভাষায় লেখালেখি তাঁর ছিল কম। তবু 'চার্বাক দর্শন' বইটির কয়েকটি সংস্করণপ্রাপ্তি প্রমাণ করে তাঁর গ্রহণীয়তা। দে'জ পাবলিশিং দক্ষিণারঞ্জনের বেশ কটি নিবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত করে বাঙালি পাঠকদের কৃতজ্ঞ করলেন। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' নিঃসন্দেহে জিজ্ঞাসু পাঠকের সংগ্রহযোগ্য সম্পদ।

১৮০ পৃষ্ঠার পরিসরে এঁটে গেছে দক্ষিণারঞ্জনের ২১ টি নিবন্ধ অর্থাৎ লেখাগুলি সংযত ও সংহত। অতিকথন বা বাগ্‌বিস্তার, পাদটিকার ভার বা উদ্ধৃতিবাহুল্য তাঁর লেখাকে পীড়িত করেনি। নির্মেদ গদ্য, স্পষ্টোক্তি ও নির্ধিধ সিদ্ধান্তপ্রবণতা দক্ষিণারঞ্জনের রচনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুণ। অথচ ভেতরে ভেতরে অনুস্যূত হয়ে আছে প্রখর শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির সতর্ক বিন্যাস। পড়তে পড়তে আনন্দ হয়, পদে পদে শিক্ষিত হওয়া যায় আবার একরকম শোচনাও জাগে। শোচনা এই কারণে যে, এমনতর আময্য পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানী কত বিরল হয়ে আসছে আমাদের সমাজে। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বা দক্ষিণারঞ্জনের মতো শতকান্তি জ্ঞানী ও বহুমুখী কৌতূহলীরা ছিলেন যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁদের উপদেশনা ও নির্দেশ আমাদের বহুতর সংকট নিরশন করত। নানা কূট জিজ্ঞাসার সমাধান করত। অথচ জড়বৎ সমাজপরিবেশ এঁদের তেমন কোনও পারিতোষিক দেয়নি। শুধু ছাত্রদের শ্রদ্ধা, অঙ্গুলিমেয় পাঠক কুলের সম্ভ্রম এঁরা পেয়ে গেছেন।

সুসম্পাদিত এই 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' বিষয় বৈচিত্র্যে খুব স্বাদু। সযত্ন প্রযাসে প্রণীত দক্ষিণারঞ্জনের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। ঝকঝকে ছাপা, বর্ণশুদ্ধিবিরল এমন সংকলন রচয়িতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার নিদর্শন। তাঁর রচনাগুলি চারটি প্রসঙ্গে বিন্যস্ত হয়েছে — 'স্মৃতিশাস্ত্র', 'দর্শনশাস্ত্র', 'দেবদেবী কথা' ও 'বিবিধ'। তার মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্র প্রসঙ্গিত রচনাগুলি একেবারে আধুনিক পাঠকের কৌতূহল জাগায় বিস্মিত করে। দেবদেবীকথা প্রসঙ্গে সূর্য, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং দুর্গা বিষয়ে আলোকপাত সাধারণ মানুষেরও ভোগ্য। তবে রচনাগুলি বড়ই সংক্ষিপ্ত। 'বিবিধ' পর্যায়ে 'বেদে নারীর অধিকার' নিবন্ধে সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা থেকে অবনমনের রেখাচিত্র পাওয়া যায়। ওই অধ্যায়েই 'পিষ্টক পরিচয়' নামে সরস রচনাটি সমগ্র সংকলনে ব্যতিক্রমী রচনা। গুরুগম্ভীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এ-রচনায় তাঁর রসজ্ঞ প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের এও এক সুপরিজ্ঞাত রূপ। বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে অধুনাতন নৃসিংহপ্রসাদ পর্যন্ত এই পর্যায়ের ধারণাটি অব্যাহত আছে। 'পিষ্টক পরিচয়' বাংলা রস সাহিত্যে এক বিরল সংযোজন। সব পর্যায়ের রচনাতেই দক্ষিণারঞ্জনের মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠতার পরিচয় আছে। তাঁর মননটি সহিষ্ণু এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট আধুনিক। সাধুভাষায় লেখা নিবন্ধগুলি পড়তে কোনও বাধা পড়ে না। কারণ রচনাভঙ্গি সহজ, পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত।

প্রবন্ধ সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে বিন্যস্ত 'স্মৃতিশাস্ত্র' সংক্রান্ত রচনাগুলি সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সদ্যতন কালস্পর্শী। 'স্মৃতি: আচার ও ধর্ম' এবং 'নানামুনির নানা মত' নিবন্ধ দুটি আমাদের সমাজে বহুপ্রচলিত নানা বিশ্বাস, প্রথা ও আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সদুত্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লেখক স্পষ্টত কোনও পক্ষ নেননি তবে তাঁর প্রবণতা কোন্‌দিকে তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। সমুদ্রে গমন, অসবর্ণ বিবাহ, দেবরকর্তৃক পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য পশুহত্যা, শ্রাদ্ধে মাংসভক্ষণ, দীর্ঘ ব্রহ্মচর্যব্রত সহিক না বৈচিক এ জাতীয় প্রশ্নের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দক্ষিণারঞ্জনের বিষয়গুলি সম্পর্কে অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে। মৃতদের দাহ বা সমাধি কোন্‌টি প্রাচীনতর এবং কেন, দক্ষিণদেশে মাতুলকন্যা বিবাহ কেন সদাচার তার মীমাংসা রয়েছে। 'শুচি ও অশুচি' নিবন্ধে আমাদের অশৌচ পালনের বিধিনিষেধ আর নির্দেশগুলি স্পষ্টাক্ষরে পাওয়া যায়। 'পিতৃযজ্ঞ' শীর্ষক নিবন্ধে শ্রাদ্ধকৃত্যের সূচনা-সংবাদ এইভাবে লেখক ব্যক্ত করেছেন যে, 'স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সন্তান অত্রি। অত্রির সন্তান দত্তাত্রেয়।

দত্তাত্রেয়ের সন্তান নিমি। নিমির পুত্র শ্রীমৎ। শ্রীমৎ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর কালগ্রাসে পতিত হন। দুঃখার্ত নিমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া শ্রাদ্ধের কল্পনা করেন।' প্রসঙ্গত দক্ষিণারঞ্জন জানিয়ে দেন: 'শ্রাদ্ধ শব্দটি কোনও বৈদিক সংহিতা বা ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বপ্রথম এই শব্দটি কঠোপনিষদে (অধ্যায় ১, বল্লী ৩, শ্লোক ১৭) দেখিতে পাওয়া যায়।'

বস্তুত, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর প্রবন্ধ সংগ্রহের বেশির ভাগ রচনাই আমাদের জানার পথকে নিঃসন্দেহে সুগম করে। তবে কোনও কোনও লেখা নিতান্তই ছোট, যেমন 'বৃষোৎসর্গ' মাত্র আড়াই পৃষ্ঠার। মন ভরে না। অবশ্য অনেক লেখাই স্বয়ং সম্পূর্ণ, যেমন 'বিবাহ কথা'। বিবাহকে লেখক 'অনুষ্ঠানাত্মক কর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং লক্ষ করেছেন যে 'এই অনুষ্ঠানাত্মক কর্মের সহিত সমাজের কিছু উন্নয়নের সম্পর্কও বিদ্যমান'। অর্থাৎ যে-সমাজ অনুষ্ঠানপ্রবণ সেই সমাজ উন্নত এবং যে সমাজে অনুষ্ঠানস্বল্পতা আছে সেই সমাজ পশ্চাদপদ। বিবাহ তাই উন্নত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, আদিম সমাজে তার ব্যাপ্তি বা আচারনিষ্ঠ ছিল না। ভারতবর্ষে শ্বেতকেতু সম্ভবত বিবাহ প্রথার জনয়িতা। 'পিত্রাদিকর্তৃক কন্যোৎসর্গনন্তত্তরং বরস্বীকারো বিবাহ' — সুন্দর সংজ্ঞা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখকের প্রাজ্ঞ দার্শনিকতা ও বহুপঠনজনিত গভীরতা। সেই পঠন শাস্ত্রজ্ঞান থেকে লোকায়তিক প্রসঙ্গ পর্যন্ত ধাবিত। 'প্রসঙ্গ দর্শন' নিবন্ধটি ভারতীয় দর্শনের নানা প্রস্থান বিষয়ে একটি ঋজু রচনা। প্রসঙ্গত এমত দেখা গেল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত এবং পশ্চিমি দর্শন বিষয়ে লেখকের অধিকার বেশ শক্তপোক্ত। তবে 'পাশ্চাত্য জড়বাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রীস' লেখাটি এ-সংকলনে একটু বেমানান। 'দেবদেবীকথা' অধ্যায়ের রচনাগুলিতে আমাদের দেবদেবী সম্পর্কে উপভোগ্য নানা সংবাদ ও উদ্ধৃতি আছে। স্বভাবত মনে হতে পারে, দুর্গা চণ্ডী গণেশ কার্তিক প্রভৃতি দেবদেবীর আবির্ভাব কাহিনী বিষয়ে অন্যতর কিছু আখ্যান হয়ত আমরা জানি। তাতে অবশ্য এই লেখকের কোনও গৌরবহানি ঘটে না। সবশেষে সমাজে অশুচি কারা তা বোঝাতে লেখকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। বলছেন 'যাহারা চিররুগ্ন, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ধর্মাচারবর্জিত, নিরক্ষর এবং স্ত্রীশাসিত তাহারাও অশুচি'। পরে মনে হল, কী সর্বনাশ, আমাদের চারপাশে এত অশুচি মানুষ? □

প্রবন্ধ সংগ্রহ — দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ৫০.০০

বাংলা নাট্যের ঐতিহ্য সন্ধানে একটি সার্থক প্রয়াস

বিষ্ণু বসু

দু' বছর আগে যখন বেশ ধুমধাম করে পালিত হচ্ছিল বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পূর্তি উৎসব, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচিত হচ্ছিল গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদভ ও তাঁর বেঙ্গলি থিয়েটারের কথা তখন কোনও কোনও বিদগ্ধ নাট্যবিদ আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন 'বাংলা থিয়েটার' নামক ব্যাপারটি কোনও বিশেষ বিদেশির অবদান নয় মোটেই, তার উৎস সুদূর অতীতে প্রোথিত। একদিক থেকে দেখতে গেলে কথাটি মিথ্যে নয়। কেননা 'থিয়েটার' শব্দটির বাংলা অর্থ যদি হয় 'নাট্যকলা' তাহলে এ শিল্পরূপটির সঙ্গে বাঙালি তথা ভারতীয়দের পরিচয়ের বিস্তার অন্তত কয়েক শতাব্দীর। অবশ্য বাংলায় আধুনিক থিয়েটারের পত্তন হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। ভরতমুনি যখন গ্রন্থনা করেছিলেন সুবৃহৎ 'নাট্যশাস্ত্রম' দুহাজার বছরেরও বেশি আগে, তাঁর সামনে অবশ্যই নমুনা হিসাবে সংগৃহীত ছিল প্রচুর তথ্য। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন নাট্যশাস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নাট্য বিষয়ক বই প্রাচীন পৃথিবীতে একখানিও নেই।

এখানেই হল মুশকিল। পাশ্চাত্য অভিঘাতে গত শতকে আমাদের দেশে সাহিত্য সৃষ্টিতে যখন ঘটছিল বিস্ফোরণ, রচিত হচ্ছিল উপন্যাস, গল্প ও গীতিকবিতা, তখন তাদের শিকড় সন্ধানে ভারতীয় আখ্যানসাহিত্য ও বিবিধ কাব্যশৈলী খানিক উল্লিখিত হলেও, তার আদর্শের জন্য স্মরণ করা হচ্ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যকলার বিভিন্ন শ্রেণীকেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখবার সময় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে। বিহারীলালও পাশ্চাত্য গীতিকবিতার ধারাটিকে। নাটকে কিন্তু পুরোপুরি তা ঘটেনি। মধুসূদন যতই কেননা 'মিস্টার বিশ্বনাথকে' অস্বীকার করার কথা ঘোষণা করুন, তাঁর প্রবর্তিত নাট্যরীতি অনেকটাই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনুগামী ছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে সর্বদা অনুসরণ করেননি। এ কথা প্রমাণ করে ভারতীয় নাট্যঐতিহ্যের মূল বেশ দৃঢ়ভিত্তিক ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান নাটককারদের মধ্যে কে কে বাঙালি ছিলেন অথবা আদৌ কেউ ছিলেন কি না সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কেউ কেউ অবশ্য শূদ্রক ও ভট্টনারায়ণকে

বাঙালি বলার পক্ষপাতী, কিন্তু তার ঐতিহাসিক যথার্থতা নিঃসংশয় নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় নাট্যঐতিহ্য বাঙালিদের উপরও যে বর্তায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাটককার সারা পৃথিবীতেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রম' নাকি এসব বরেণ্য নাটককারদের আবির্ভাবের আগেই গ্রন্থিত হয়েছিল।

কিন্তু এসব বরিষ্ঠ নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশাস্ত্র ক্রমে কালকবলিত হল। দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময় থেকে তার উপর নেমে এল বিস্মৃতির যবনিকা। নাট্যপ্রযোজনা থেকে বিচ্ছিন্ন নাটক কেবলমাত্র পাঠের বিষয় হয়ে উঠল। তাই স্বাভাবিকভাবেই নাট্যপ্রযোজনা বিষয়ক বই 'নাট্যশাস্ত্রম'-কে বিদায় দিয়ে লেখা হল নাট্যতত্ত্বের বই। ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ধনঞ্জয় লিখে ফেললেন 'দশরূপক'। শুধুমাত্র সাহিত্য হিসাবে নাটক পাঠ করবার নির্দেশিকা হিসাবে এ বইকে দেখলে অস্বাভাবিক হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যজগতের এ হাল হল প্রধানত দুটি কারণে। ইতিহাসের অমোঘ অথচ স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাচীন শিল্পকলার এ শাখা শীর্ণ হল। তার উপর এ সময়েই সংঘটিত হল ইসলামের আধিপত্য। মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের মধ্যে নাট্যচর্চা ধর্মীয় কারণেই নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে তখন ছিল ইসলামের তরুণ কাল। তাই এসব বিধিনিষেধ পালিত হত বেশ কঠোরভাবে। তদুপরি সংস্কৃত নাট্যচর্চার আশ্রয় ছিল মূলত রাজসভা। ইসলামের অগ্রগমনে হিন্দু রাজসভাগুলি ক্রমে বিলীন হল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে। জাতি হিসাবে বাঙালি যখন গড়ে উঠবার মুখে, ইসলামের এ আধিপত্য বাঙালিকে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যচর্চা থেকে বেশ খানিকটা বিচ্ছিন্ন করল। প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখতে হবে দিল্লি মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসবার আগেই বাংলায় মুসলিম অভিবাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই সংস্কৃত নাট্যচর্চা করার মতো ব্যাপক সুযোগ বাঙালি তাঁর গড়ে নেবার সময় তেমন পায়নি। তাই সংস্কৃত নাট্যঐতিহ্য বাঙালিকে প্রত্যক্ষভাবে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

সংস্কৃত নাট্যঐতিহ্য গড়ে উঠল না, অথবা গড়ে উঠবার মুখেই ধ্বস্ত হল, তাতে তো আর কোনও জাতির নাট্যচর্চা থেমে থাকতে পারে না। কোনও ধরনের অনুশাসন তার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিলেও তার বিকাশ বাধা পায় না। মধ্যযুগে বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন হিন্দুরাই। মুসলমানদের মধ্যেও বড় অংশ ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। তাঁরা ভিন্ন মতের আশ্রয়ে গেলেও সঙ্গে নিয়েছিলেন পূর্ববর্তী জীবনচর্যার বিবিধ উপাদান। লৌকিক বিশ্বাস ও আচরণ তারা সর্বাংশে ছাড়তে পারেননি।

তাই সংস্কৃত নাট্যঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙালি গড়ে তুললেন তাঁদের নিজস্ব নাট্যরীতি এবং তা হল লোকজ। অবশ্য লোকনাট্যের সবটাই যে এ সময়ে এবং একই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছিল তা নয়। প্রাচীন ভারতেও নানা লোকনাট্যরীতি প্রচলিত ছিল। অঞ্চলভেদে তাদের প্রকৃতিও ছিল পৃথক। ভরতমুনি স্বয়ং 'লোকধর্মী' নাট্যরীতির কথা উল্লেখ করে গেছেন। প্রতিটি লোকগোষ্ঠীর নিজস্ব নাট্যরীতি থাকে। এসব নাট্যরীতির সংখ্যাও সীমিত নয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' থেকে আমরা জানতে পারি প্রাচীন ভারতীয় কৌম জীবনে কৃত্যানুষ্ঠানে কী ধরনের নাট্যআঙ্গিক অনুসৃত হত। জর্জ টমসন তাঁর 'এসকাইলাস অ্যাণ্ড এথেন্স' নামক অসামান্য বইটিতে প্রাচীন গ্রিসের জনজীবনে কোন ধরনের কৃত্যনাট্য প্রচলিত ছিল তার অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এসব তত্ত্বকথার আবরণ সরিয়ে আমরা একটি সত্যেরই মুখোমুখি হই এবং তা হল লোকসমাজের নিজস্ব নাট্যরীতি বরাবরই বর্তমান। মধ্যযুগের বাংলাতেও তা অপ্রতুল ছিল না।

'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' নামক গবেষণাকর্মটিতে সেলিম আল দীন বাংলা নাট্যের এ লোকঐতিহ্যেরই নিবিড় অন্বেষণ করেছেন। সেলিম আল দীন বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের প্রফেসর। জীবন ও জীবিকাকে মেলানোর তাগিদ থেকেই যেন সেলিম লিখেছেন এ বইটি। বাংলা থিয়েটারের উদ্ভব বিদেশিদের আবির্ভাবের ফলে ঘটেছিল, এ ধারণাটিকে তিনি যেন একটি দুর্মর কুসংস্কার হিসাবেই দেখতে চান। অনেকের মতো সেলিমও ভাবেন, কলোনিয়াল সংস্কৃতির চুঁইয়ে পড়া মূলধন অন্তত বাংলা থিয়েটার নয়। তাই তিনি বাংলা থিয়েটার তথা নাট্যের সন্ধানে যাত্রা করেছেন অবিভক্ত বাংলার অতীতের অন্দর মহলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যাবতীয় প্রদর্শশিল্পকে তিনি হাজির করেছেন বিশ্লেষণের অনুপুঙ্খতায়।

এ বইয়ের বিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন চর্যাপদ থেকে শুরু করে প্রাক্-আধুনিক অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগের পূর্ববর্তী বিবিধ শিল্পকর্মকে। শুধু তাই নয় তিনি বাংলা নাট্যের স্বরূপ সন্ধান করেছেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকেই। ভরত নির্দেশিত ওড্র-মাগধীরীতির ঐতিহ্য বহন করেছিল বাংলা নাট্য। তাই বাংলা নাট্যের কালসীমাকে অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী বলেই নির্দেশ করেছেন তিনি। মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষাসহ বাঙালির পৃথক জাতিসত্তা গড়ে উঠেছিল এ সময় থেকে।

বাংলা নাট্য নিয়ে এ তত্ত্ব যে আধুনিক বাঙালি ইতিহাসকারদের অজানা ছিল তা নয়। সুকুমার সেন, সুশীলকুমার দে, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন লেখায় বাংলা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নাট্যরীতি সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন রচিত 'নট নাট্য নাটক' বইটি (প্রকাশকাল চৈত্র ১৩৭২) এ তত্ত্বেরই যেন প্রমাণপত্র। এ বইয়ের ভূমিকায় সুকুমার সেন ঘোষণা করেছিলেন, 'সাহিত্যে ও লোকব্যবহারে নাচ-নাট-অভিনয়ের ইঙ্গিত, উল্লেখ ও পরিচয় যেভাবে পেয়েছি এবং

সাহিত্যে তার প্রতিফলন যেভাবে হয়ে এসেছে তা বিচার বিশ্লেষণ করে বিষয়টির ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার ও তার বিচিত্র পরিণতির সন্ধান দেওয়াই আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য'। এ উদ্দেশ্য সাধনের পথে তিনি যেমন পেশ করেছেন বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের তথ্য। তেমনই পুতুলবাজি, ছায়ানাট্য, ছালিক্য, ভাণ, নাট্যগীতি প্রভৃতি প্রদর্শশিল্পের পরিচয়। চৈতন্যদেবের যাত্রাপালায় অভিনয় এবং শঙ্করদেবের নাটপালার প্রসঙ্গও আলোচনার পরিধিতে এনেছেন তিনি। বহির্বঙ্গে বাংলা নাট্যকেও তিনি অবহেলা করেননি। তা ছাড়া যাত্রা ও পুতুলবাজির গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। এমনকী বইটির সমাপ্তি হিসাবে একটি নেটো পালাকেও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা নাট্যের ঐতিহ্য সন্ধানে এ বইটি একটি জরুরি দলিল হিসাবেই গৃহীত হয়ে থাকে।

সেলিমের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি সুকুমার সেনের মতো অল্পে সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁর অভিযান ব্যাপক ভূখণ্ড জুড়ে। এ বইটি পড়ার আগে জানাই ছিল না অতীতের বাংলায় এত ধরনের প্রদর্শশিল্প প্রচলিত ছিল। এ আলোচনায় তার তালিকা দেওয়াই অসম্ভব। তবু সামান্য দুচারটির উল্লেখ করা হচ্ছে আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য। চর্যাপদে উল্লিখিত বুদ্ধ নাটকের অভিনয়রীতি থেকে শুরু করে গীতগোবিন্দের নাটগীতিরীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যরীতি, পাঁচালি, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণবিজয় একদিকে, অন্যদিকে গাজির গান, ইউসুফ জোলেখা, খোয়াজ খিজিরের পালা, সত্যপীর, মানিকপীর প্রমুখ অজস্র উপাদান তিনি পাঠকদের কাছে পেশ করেছেন। বাদ যায়নি বিবিধ গীতিকার কথাও, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গগীতিকা নামক পালাগান সমূহ। ভাদু, গম্ভীরা, আলকাপ, জারিগান, ঘাটু, ঝুমুর এবং যাত্রাপালার বিবরণও তাঁর বিশ্লেষণে গভীর মনোযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া বাংলার প্রান্তবাসী নৃ-গোষ্ঠীর কৃত্যনাট্যও যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে অসামান্য শ্রমের নিদর্শন। তিনি যে এ লৌকিক শিল্পকর্মগুলোর যান্ত্রিক বিন্যাস ঘটিয়েছেন, তা একেবারেই নয়। বরং তাদের পশ্চাদ্‌পটে নিহিত ধর্মীয় ও দার্শনিক বোধটিরও বিশ্লেষণ করেছেন যথাসম্ভব। এ বোধের মধ্যে ধ্রুপদী ও লৌকিক বিশ্বাসের সমন্বয়ও অন্বেষণ করেছেন।

এ বইয়ের প্রাপ্তি অতীত বাংলার বিবিধ নাট্যরীতির সঙ্গে পরিচিতি তো বটেই, সেইসঙ্গে আরও একটি বড় ব্যাপার ঘটিয়েছেন সেলিম। সারা ভারতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শুধু বাংলার কথাই ধরা যাক। বাংলায় হিন্দু মুসলমান দুটি সম্প্রদায় বসবাস করছে প্রায় হাজার বছর ধরে। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের জীবনচর্যা সম্পর্কে প্রচণ্ড উদাসীন। অবশ্য এ উদাসীনতা সম্ভবত বেশি দেখা যায় নাগরিক শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে। অথচ রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাই। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এ বিভাজনকে আরও দুর্লঙ্ঘ করে তুলেছে। শিক্ষিত এ ভদ্রলোক শ্রেণীরাই বাংলাভাগের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারত ভাগের পরিণতিতে অর্ধশতক আগে তৈরি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বকে হাস্যকর প্রমাণিত করে পঁচিশ বছর আগে আবির্ভাব ঘটেছিল নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক তথা ভদ্রলোক শ্রেণীর এ বিভাজনকে বরাবর অস্বীকার করে এসেছে বাঙালি প্রজাপুঞ্জ। গ্রামবাংলার জীবনচর্যা যে নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সমাজ আচরণে, তার প্রচুর প্রমাণ রয়ে গেছে। গ্রামবাংলার বেশির ভাগ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব যে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভাবনায় মথিত সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর একটা কারণ হতে পারে এই যে বাঙালি মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশের পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দু। তাই সুদূর অতীতে যখন তাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, সঙ্গে নিয়েছিলেন লোকবিশ্বাস থেকে শুরু করে জীবনচর্চার প্রভূত উপকরণ। এমনকী ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল লৌকিক দেবতাদের সঞ্চরণ। তাই মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, সেলিম যাদের নাম দিয়েছেন 'কৃত্যনাট্য' তার গরিষ্ঠ অংশ গড়ে উঠেছিল বিবিধ ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। স্বভাবতই এসব কৃত্যনাট্যের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের একটি উদার মিলনের পরিচয় মেলে। শিক্ষিত বাঙালির অনেকের মধ্যেই মাঝে মাঝে এ আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ পায় যে দুটি সম্প্রদায় প্রায় হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস করেও পরস্পরের অপরিচিত থেকে গেছে। হিন্দু মিথ্‌ নিয়ে মুসলমান এবং মুসলমান মিথ নিয়ে হিন্দুরা মোটেই মাথা ঘামান না। অথচ কোনও জাতির জীবনচর্যা গড়ে তোলার জন্য মিথ-এর একটা বড় ভূমিকা থেকে যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলে যদি একটি অখণ্ড বাঙালি জাতি গড়ে তুলতে হয় তাহলে এ মিশ্রণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জরুরি। এস. ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' নামক কাহিনীটি এ অন্বেষণেরই একটি ব্যাগ্র অভিব্যক্তি ছিল।

সেলিম আল দীনের এ বইটি প্রমাণ করছে বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে এ বিভাজন থাকলেও, গ্রামবাংলার লৌকিক সমাজ তাকে মোটামুটি অস্বীকার করেছিল। শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক মতলব নানা চেষ্টা সত্ত্বেও গত দুই শতক ধরে তার মধ্যে তেমন ফাটল ধরাতে পারেনি। এ বিষয়ে অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন সেলিম। তাঁর লেখার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে, 'পীর পাঁচালি মূলত অসাম্প্রদায়িক মনের সৃষ্টি। পীরের 'সেবা' 'হাজোত-মানোত' প্রভৃতি কৃত্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার। এ-শ্রেণীর পাঁচালিতে হিন্দু-মুসলিম পুরাণের একটি সমন্বিত রূপ আবিষ্কারের প্রয়াস আছে। সকল

পীরগাথায় তাই ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে আমাদের লোকমানসের একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লভ্য। আধুনিককালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকালে, পাঁচালিকাব্যের এই ক্ষয়িষ্ণু ধারাতেই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক নিগূঢ় সঙ্কেত পাওয়া যেতে পারে।' [পৃ. ৩২৭] শুধু পীরগাথাতেই নয়। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের বহু রীতি যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হত তার বহু উদাহরণ পেশ করেছেন সেলিম। তাঁর এ বইখানি মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের একটি বিশ্বকোষ হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে।

কিন্তু সেলিমের এ গবেষণা শুধুই কি শুষ্ক পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী? সেলিম নিজে নাটককার। দু বাংলা মিলিয়ে আধুনিককালের অগ্রগণ্য বাঙালি নাটককার তিনি। নিতান্ত তরুণ বয়সে তিনি যখন ব্রতী হন নাটকরচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময়ে, তখন থেকেই তিনি প্রচলিত বাংলা নাট্যরীতিতে স্বস্তি পাননি। তাঁর এ সময়কার লেখা 'সর্প বিষয়ক জটিলতা', 'জন্ডিত ও বিবিধ বেলুন', 'সংবাদ কার্টুন' প্রভৃতি নাটকে বাংলায় প্রচলিত নাট্যরীতিকে মেনেও বেশ খানিকটা সরে যাওয়া ছিল। অবশ্য বর্তমানে নাকি সেলিম এসব নাট্যকর্মকে অস্বীকার করতে চান। স্বাভাবিক। কেননা এ পর্যায়কে তাঁর শিক্ষানবিশীর কাল বলে ধরে নেওয়া যায়। এমনকী তাঁর নাট্যকার জীবনে 'শকুন্তলা'র গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় সেলিম তখনও নিজস্ব নাট্যভাষা যেন খুঁজে পাননি। তাই চলছিল তাঁর নিরন্তর অন্বেষণ। 'কিত্তন খোলা'-য় পথ তিনি খুঁজে পেলেন এবং 'কেরামতমঙ্গল' থেকে এ পথেই হল তার অবিরাম চলা। মধ্যযুগের বিবিধ নাট্যরীতির নির্যাস নিষ্কাশন করে তিনি গড়ে তুললেন নিজস্ব নাট্যরীতি। 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাতহদাই'-তে তিনি বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে মেলালেন মধ্যযুগ ও আধুনিককে, লোকপুরাণকে করে তুললেন সাম্প্রতিক। নিজস্ব নাটকের ভাষাও তিনি নির্মাণ করলেন। কিন্তু এখানেই থেমে থাকলেন না। ক্রমে নাটকে প্রচলিত চরিত্রদের কথোপকথন থেকে সরে এসে সৃষ্টি করলেন 'কথানাট্য'। মধ্যযুগের একাধিক প্রদর্শশিল্প জারিত হয়ে গড়ে উঠল 'কথানাট্য'। 'চাকা', 'হরগজ'! 'যৈবতী কন্যার মন' তাঁর এ ধরনের নাট্যরীতির শিল্পকর্ম।

ঠিক এ ধরনের নাটক বাংলায় সেলিমের আগে কেউ লেখেন নি। কোনও কোও বাঙালি নাটককার অবশ্য প্রভাবিত হয়েছেন 'যাত্রা' দিয়ে, এমনকী লেটো বা গম্ভীরা দিয়েও, কিন্তু সম্পূর্ণত মধ্যযুগের নিজস্ব নাট্যরীতিকে আশ্রয় করে সেলিমের মতো কেউ নাটক লেখেননি এর আগে। সেলিমের অবশ্য সৌভাগ্য, নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর মতো একজন পরিচালককে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নাটকসমূহকে মঞ্চস্থ করবার জন্য। নাসিরুদ্দিনের শৈল্পিক সমর্থন সেলিমকে গভীর প্রত্যয় জুগিয়েছে। শম্ভু মিত্র স্বয়ং 'চাঁদ বণিকের পালা' মঞ্চস্থ করতে পারেননি। এগিয়ে আসেননি অন্য কোনও পরিচালকও।

'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' গ্রন্থটি তাই শুধু বাঙালির ঐতিহ্য আবিষ্কার করার আগ্রহ থেকে সেলিম আল দীন রচনা করেন নি। নিজের অনুসৃত নাট্যরীতির সমর্থন তিনি ব্যাকুল হয়ে খুঁজেছেন অতীতের মধ্যে এবং তারই ফসল হল এ বই। পৃথিবীর বহু দেশেই দেখা যায় লোকনাট্যের নানা উপচার স্বীকরণ করে আবির্ভূত হন একজন সক্ষম ও শক্তিশালী নাটককার। বাংলা সাহিত্য এমন একজন নাটককারের অপেক্ষায় ছিল। সেলিমের মধ্য দিয় সম্ভবত সে প্রত্যাশা পূর্ণ হল।

'মধ্যযুগের বাংলা নাট্য' বইটির মধ্যে বিবিধ নাট্যরীতির প্রচুর উদাহরণ পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের প্রচণ্ড শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও বলা যায় তার নজর এড়িয়ে গেছে আরও কিছু নাম। নাচনির কথা তিনি উল্লেখ করেননি, বাদ গেছে ধামগানের কথাও। রংগাচালি, বাঘনাচ, হুদ্‌মা প্রভৃতির কথা উল্লেখ থাকলে ভাল হত। ভাল হত বউ নাচ অথবা সঙ-পাঁচালির কথা থাকলেও। উল্লেখিত হতে পারে এ ধরনের আরও কিছু অনুপপত্তির কথা। তবে এসব অনুল্লেখ প্রাপ্তির তুলনায় সামান্যই।

তবে পুরো বইটি পড়বার পর দুয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। সেলিম মধ্যযুগের নাট্যিক উপকরণ বলে যাদের হাজির করেছেন, তার সবগুলোকেই কি নাট্য বলা চলে? প্রদর্শশিল্পের সর্ব ধরনকে নাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি? মনে রাখতে হবে, ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে যাবতীয় গান পরিবেশিত হত আসরে। তাই গায়ক কথক ও শ্রোতার বিভাজন মোটামুটি অদৃশ্য হয়েছে। তাই মধ্যযুগে অর্থাৎ ছাপাখানার আগের যুগের আসরে পরিবেশিত সবগুলো শিল্পকর্মের গায়ে নাট্যের লেবেল মেরে দেওয়া সঠিক হয় কি?

তা ছাড়া বিবিধ নাট্যরীতি থাকবে, অথচ তার মধ্য থেকে নির্মিত হবে না কোনও নাটক, পাঠ ও প্রযোজনার জন্য গড়ে উঠবে না কোনও স্ক্রিপ্ট, তা কি সঙ্গত? সেলিম পরিবেশিত নাট্য তথ্য থেকে কোনও নাটক কি কেউ পরিবেশন করবেন? তা যদি না হয় তাহলে তাদের কি নাট্য বলে অভিহিত করা যায়? কেননা নাট্য বিষয়টির অন্যতম উপাদান কিন্তু নাটক। 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে আহরিত হলেও কিন্তু বিভাস চক্রবর্তী তাকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন নাটকের আঙ্গিকে, গীতিকার আঙ্গিকে নয়। অবশ্য সেলিম সৃষ্ট শিল্পকর্মগুলোকে বলা যায় মধ্যযুগের নাট্য থেকে গড়ে ওঠা নাটক। □

মধ্যযুগের বাংলা নাট্য — সেলিম আল দীন / বাংলা একাডেমি, ঢাকা / ১০০.০০

জীবনানন্দ প্রসঙ্গে একটি

অনন্যসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের যে-কোনও বই পড়াই নিজেকে সমৃদ্ধ করা। তর্কে, যুক্তিতে ও সিদ্ধান্তে তাঁর প্রবন্ধ যেমন অমোঘ হয়ে ওঠে, তেমনই সহজ সাবলীল ভাষায় তাঁর পরিবেশনাও উপভোগ্য করে তোলে প্রবন্ধগুলি। যতদূর জানি, তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধই লেখেন, গল্প বা উপন্যাস দেখিনি।

গোপালচন্দ্র আশি পার হয়েছেন ভাবা কঠিন। যেমন ক্ষুরধার তাঁর যুক্তি তেমনই শ্রমনিষ্ঠতা তাঁকে বয়সের ভারে শিথিল করেনি এতটুকু। এই চরম পাওয়া এই জাগ্রত প্রখর বুদ্ধিমান মানুষটির কাছ থেকে, এবং যখন যে গবেষণাকর্ম করেন তা মৌলিক গবেষণাকর্ম হয়ে ওঠে; সেই রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে টোকাটুকির বস্তাপচা গবেষণা তিনি করেন না ডাক্তার খেতাব পাওয়ার জন্য। তাঁর যে-কোনও প্রবন্ধ তাই খুঁজে পেতে পড়ার অভ্যেস আমার অনেক দিনের।

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের গবেষক রূপে ইতিমধ্যেই আমরা তাঁর কাছ থেকে নানা অজানা তথ্য পেয়েছি। তিনি সব সময়ই অনুসন্ধানী। প্রচলিত পথ থেকে সরে গিয়ে নতুন কিছু খুঁজে বের করে তাঁর উপর বিশ্লেষণী আলো ফেলে সত্য প্রকাশ করেন। এ একটা চমৎকার পদ্ধতি, যা তিনি আমাদের উপহার দেন এবং আমরা হতে থাকি ঋদ্ধ, তৃপ্ত।

'জীবনানন্দ' গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত রায়ের অসামান্য কাজ রূপে গণ্য হবে। সাহিত্যভবন, ২৬ মদন বড়াল লেন, কলকাতা ১২ থেকে এবছরই (১৯৯৭) বেরিয়েছে। জীবনানন্দের শতবার্ষিকীর সূচনাতে এমন বই পড়তে পারা অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা।

'জীবনানন্দের জীবনের শেষ দিকে প্রায় দু বছরের মত সময় তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।' মুখবন্ধে একথা বলেছেন গোপালচন্দ্র জীবনানন্দ গবেষক ক্লিন্টন সিলিকে। সেই বিদেশি শ্রমনিষ্ঠ গবেষকই অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে 'জীবনানন্দের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয়ের কথাগুলো, যদি একটি প্রবন্ধের আকারে লিখে দেন, তাহলে আমার বড় উপকার হয়।' লেখক সম্মত হয়েছিলেন, ওই অনুরোধে সাড়া দিয়েই তাঁর মনে হয়েছে 'জীবনানন্দের তো কোনও জীবনী নেই, একটা জীবনীই লেখা যাক। লেখা শেষ হলে, সে লেখা ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে 'জীবনানন্দ' নামে বই হয়ে প্রকাশিত'।

বর্তমান বইটি সেই ১৯৭১-এর প্রথম সংস্করণের বর্ধিত সংস্করণ।

জীবনানন্দকে নিয়ে কবিতার পাঠক মহলে যত দিন যাচ্ছে, বাড়ছে আগ্রহ, আকুলতা। মৃত্যুর আগেই এ দেশের স্বনামধন্যরা দেখে যাক, তাদের প্রতি আগ্রহ ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন; বেঁচে থাকা কালে খ্যাতির মোহে আচ্ছন্ন কবিদের একাংশ এতটাই আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে থাকেন, যে, যেন ধরেই নেন, এই বোলবোলাও চিরদিন থাকবে। প্রচারের আলো মুখ থেকে সরে গেলে, কি করুণ অবস্থা হবে, তা ভাবেন না তারা।

সেখানে জীবনানন্দ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আজ আমরা অনেকেই জীবনানন্দের মৃত্যুর পরের খ্যাতির কথা উল্লেখ করি, এই ভাবে যে,— সত্যিকারের সৃষ্টির মূল্যায়ন তো শুরু হয় একজন কবির মৃত্যুর পরে, যেমন হয়েছেন জীবনানন্দের। বায়রনের গ্ল্যামার আর খ্যাতির কাছে কীটস বা শেলী তো একেবারেই তুচ্ছ ছিলেন। আজ ইতিহাস কোন কথা বলছে? সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পাহাড় ওলটানোর মতন অসম্ভব দৃষ্টান্ত দেখি এদেশে আকছার। জীবনানন্দ জীবিতকালে অবিরাম নিন্দিত, আর মৃত্যুর কিছু পর থেকেই অবিরাম উদ্ভাসিত ও বন্দিত হচ্ছেন; এ প্রবাদপ্রতিম প্রতিষ্ঠার নজির এদেশে তেমন নেই।

জীবনানন্দের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পরে বেশ কয়েকটি আলোচনার বই বেরিয়েছে। অম্বুজ বসুর একটি নক্ষত্র আসে, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবনানন্দ, জীবনানন্দ-সুহৃদ অমলেন্দু বসুর কয়েকটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ নিয়ে বই বেরিয়েছে, আর মহামূল্যবান কাজ করছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে। এ ছাড়া দু চারটি বই ও অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ও হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। জীবনানন্দকে নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ লিখেছেন ক্লিন্টন সিলি। মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই এই কবিতা-তাড়িত, আপাদমস্তক কবি যে এভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শুধু নয়, তাঁকে নিয়ে শুরু হবে চর্চা ও আগ্রহের ঝড়, কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর দুর্দৈবতাড়িত জীবৎকালে?

গোপালচন্দ্র রায়ের 'জীবনানন্দ' ওই সব আলোচনাগ্রন্থ থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র জাতের। তিনি পূর্ণাঙ্গ না হোক, অনেকটাই তথ্যনির্ভর জীবনকাহিনী এই বইতে উপস্থিত করেছেন। এটা আমাদের জীবনানন্দ-প্রেমিকদের কাছে একটি বিকল্পহীন মূল্যবান উপহার, যা তিনি দিয়েছেন অশেষ শ্রমে ও যত্নে, দীর্ঘদিনের চাহিদার প্রয়োজনেও বটে।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর তরুণ প্রেমিক বন্ধুরা প্রকাশ করেছিলেন 'ময়ূখ' জীবনানন্দ সংখ্যা। হাওড়া গার্লর্স কলেজ পত্রিকায় নানা স্মৃতিচারণ ও প্রবন্ধ বেরিয়েছিল পরেপরেই।

বর্তমান লেখক তখন স্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। তখন ভবানীপুরের বিখ্যাত সাউথ সার্দান স্কুল মেইনের স্কুল পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা পত্রিকার সম্পাদক রূপে সম্পাদনা করেছিলাম আমি। পত্রিকার সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে আর নেই।

উত্তরসূরী পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যা বেরিয়েছিল। বলা যাবে না, এই মহৎ প্রতিভাকে শুধুই উপেক্ষিত হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর কবিতার খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল গুণগ্রাহীদেরই মধ্যে। তা আজকের মতন সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়েছে, কেননা তিনি তাঁর যুগ থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিলেন; যারা তা ছিলেন না, তারা তাৎক্ষণিক খ্যাতি উপভোগ করে গেছেন। যত দিন যাবে, জীবনানন্দ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন, মনে হয়।

গোপালবাবু পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন জীবনানন্দকে নিয়ে। এ কাজ এ বাংলায় নতুন, এবং দীর্ঘকালের চাহিদা পূরণ করেছে। এজন্য তাকে ধন্যবাদ নয়, প্রণাম জানাই। তিনি প্রণম্য।

জন্ম, বংশপরিচয়, বাল্য কৈশোর, কলেজ জীবন থেকে কর্মজীবন; নানা কলেজে চাকুরি, চাকুরি চলে যাওয়া, অনুসন্ধান, সমালোচনা ও তাঁর বই বেরুনো, প্রশংসা ও নিন্দা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও মরণোত্তর সম্মান এসব অতি জরুরি তথ্য, যা একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাকে বুঝে নেবার পক্ষে জরুরি, সবই তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দচর্চার ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্রের এই গ্রন্থ আকরগ্রন্থ রূপের বিবেচিত হবে একদিন।

আমরা শুধুই কবিতাবিশ্লেষণ চাই না; আমাদের চাই প্রিয় কবির জীবনের নানা ঘটনা, যা তাঁকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করবে। একজন মানুষ, অতিরিক্ত সংবেদনশীল মানুষ সমকালের আত্মীয় পরিজন, কর্মস্থানের সহকর্মী, সহযোগী লেখকদের চোখে তাঁর অবস্থানে, পাঠক-পাঠিকাদের চোখে তাঁর 'ইমেজ', এসবই জানার কৌতূহল কম থাকে না। জীবনানন্দের উপরে এতাবৎ সব মূল্যবান কাজ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্যায়নের উপরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। শ্রীযুক্ত পোপালচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থটিতে কবির জীবন ও সৃষ্টির সমগ্রতাকে ধরতে চেয়েছেন। যেমন 'জীবনানন্দের চরিত্রের কয়েকটি দিক,' ...কয়েকটি চিঠি, গ্রন্থকারের কবির সঙ্গে পরিচয়, ইত্যাদি যেমন নতুন আলোকপাত করে কবির জীবনের উপর তেমনই প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ, বর্ণগন্ধের কবি জীবনানন্দ, জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা, এরকম কবিতার অন্তর্চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন নানা প্রবন্ধে।

এই বইয়ের সবচাইতে মূল্যবান অংশ 'জন্ম ও বংশ পরিচয়' কারণ, স্বল্পকথায় কবির কবি-জননী ও আদর্শবাদী পিতা ও পিতামহের, মাতামহের চরিত্র তুলে ধরেছেন; আমরা বুঝতে পারি, জীবনানন্দের কেন অতিরিক্ত আত্মসম্মানবোধ ছিল। আদর্শবাদী শিক্ষক ও মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর এই চারিত্রিক শুদ্ধতা ও বলিষ্ঠতার উৎস ও প্রেরণা কে বা কারা। তাঁর কবিমাতা কুসুমকুমারী দাস অপার স্নেহে ছেয়েমেয়েদের মানুষ করেছেন, সংসারের তাবৎ কাজকর্ম, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় সাহায্য করে কীভাবে কবিতা লিখতেন, 'কুসুমকুমারী দেবী ভাল কবিতা ত লিখতেন এমনকী, বৃহৎ সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বা কাজের মধ্যে থেকেই খুব তাড়াতাড়ি কবিতা লিখতে পারতেন।'

জীবনানন্দ লিখেছেন—'কি রকম তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন তিনি! রান্না করছেন, পিসেমশায় আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী এসে বল্লেন— এখনি 'ব্রহ্মবাদী'র ফর্মা প্রেসে যাচ্ছে, অবিলম্বে একটি কবিতা লিখে দাও কুসুম। ...অমনি মা খাতাকলম নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি আর এক হাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত— যেন চিঠি লিখছেন, বড় একটা ঠেকছে না কোথাও।'

আমরা জানতে পারি 'দাদামশায় ছাড়া বাড়িতে ঠাকুরমার কাছেও জীবনানন্দ ছেলেবেলায় রূপকথার গল্প, নিজেদের বংশের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস প্রভৃতি শুনতেন।'

বুঝতে পারি, জীবননান্দের কবিতায় রূপকথার চরিত্র ও অনুষঙ্গ কেন এতবার এসেছে এবং গভীর অর্থ বহন করছে। আমরা জানতে পরি, 'ক্যাম্পে' কবিতার হয়ত প্রেরণা রূপে রয়েছে ছেলেবেলার শিকার কাহিনী। তাঁর কাকা ভাল শিকারী ছিলেন। সেই কাকার শিকারের নানা গল্প ঠাকুরমা শোনাতেন জীবনানন্দকে।

বরিশালের জলে ঘেরা দ্বীপভূমির সৌন্দর্য জীবনানন্দের কবিতায় এবং বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রা এনেছে, সেই প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় কত নিবিড় ছিল, তার বর্ণনা এই বইকে সমৃদ্ধ করেছে। গ্রন্থকার সব সময়ই তার তথ্যের উৎস নির্দেশ করেছেন। কোনও ঘটনাই লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়। আর যেসব তথ্য তিনি দিয়েছেন কবির ভাইয়ের স্মৃতিচারণ থেকে, ভ্রাতৃবধূর স্মৃতিচারণ থেকে, নিয়েছেন কবির সঙ্গে পরিচিত প্রিয়াজন, ছাত্রছাত্রী, সহকর্মীদের কাছ থেকে। লেখক সেই সব স্মৃতিকথা থেকে তথ্য নিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন কবির বাল্য কৈশোর, কর্মজীবনের কথা যা পেয়েছে পূর্ণতা; লেখক দেখিয়েছেন, বরিশালে কলেজে কর্মজীবনে তাঁকে নিয়ে সহকর্মীদের কেউ কেউ কীভাবে হাস্যপরিহাস করত, তাঁর কবিতা বুঝতে পারত না বলে; ভাই অশোকানন্দের সঙ্গে কলকাতায় মেসে থাকবার সময় কয়েকটি ঘটনায় জানা যায়, কবি রঙ্গকৌতুক করতে ভালবাসতেন। তাঁকে সমালোচনা করলে বিব্রত হতেন ঠিকই। বিপন্নবোধ করতেন আবার কীভাবে হো হো করে হেসে উঠতেন। তিনি কলকাতায় এসে ল্যান্সডাউন রোডে আর্থিক কারণে একটি ঘর ভাড়া দিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন, উদ্ধার

পাবার জন্য সেকালের ক্ষমতাবান লেখকদের দরজায় কড়া নেড়েছেন, বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন। জানতে পারি, কবির অশ্লীল কবিতা তাঁর সিটি কলেজ থেকে চাকুরি যাবার কারণ নয়, চাকুরি গিয়েছিল হিন্দু ব্রাহ্মদের রেষারেষিতে, ছাত্রসংখ্যা কমে যাবার জন্য।

অনেক অনেক না-জানা তথ্য যেমন শ্রীযুক্ত রায় এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন তেমনই জানা তথ্যের মধ্যে ভ্রান্তি কোথায় তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরায়ের বিশ্লেষণ সব সময়ই তথ্যনির্ভর বলে, আমরা আমাদের প্রচলিত ভুল সংশোধন করে নিতে পারি। একজন প্রকৃত গবেষক সব সময়ই তথ্যনিষ্ঠ, সত্য নিষ্ঠ। জীবনী রচনায় 'আমার মনে হয়'-এর স্থান নেই। গবেষক শ্রীরায়, তাঁর সমকালের সব জীবনানন্দ বিষয়ক লেখার সঙ্গেই পরিচিত আছেন বলে, তিনি সব লেখককে সম্মান জানিয়ে তাঁদের খামতি ও ভ্রান্তি নিরসন করেছেন। এবং পরিবেশন করেছেন নতুন নতুন তথ্য। জীবনানন্দের সঙ্গে শেষের দিকে ২।৩ বছর মিশেছিলেন। তিনি ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের ও হাওড়া গার্লর্স কলেজের কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করেছিলেন কর্মহীন কবি যাতে কলেজে চাকুরি পান। এই মেলামেশার কারণে তিনি জীবনানন্দের মর্যাদা বোধ, বিপন্নতা, মানবতার নানাদিক নিজে লক্ষ করেছেন এবং এই গ্রন্থে তা তুলে ধরেছেন স্বল্প কথায়, প্রাঞ্জল ভাষায়। একটিমাত্র দুশো আটষট্টি পাতার বই-এর মধ্যে লেখক এত প্রাসঙ্গিক তথ্য, ব্যাখ্যার সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে সীমাবদ্ধ আলোচনায় তাঁর পরিচয়দান অসম্ভব। জীবনানন্দ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলির উৎস যা-ই হোক, লেখক প্রমাণ দিয়ে তার অনেকগুলি খণ্ডন করেছেন। নির্জনতাপ্রিয় হলেও জীবনানন্দ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালবাসতেন, ছিলেন কৌতুকপ্রিয়, মানুষের উদাসীনতাকে আমল দিতেন না, অর্থাৎ নিজের কবিতা সম্পর্কে তাঁর অস্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তিনি জীবিতকালে প্রকৃত সমঝদার পাননি তা নয়; তাঁর আবৃত্তি ছিল অসাধারণ; তিনি ভাল শিক্ষক ছিলেন না, তা নয়; ছাত্রছাত্রীরা তাঁর পড়ানো সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এরকম অনেক অনেক প্রচলিত ধারনাবিরোধী বক্তব্য তথ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন শ্রীরায়। একজন জীবনানন্দ প্রেমিকের কাছে এই সব উপকরণ নানা কৌতূহল মেটানো এবং কবির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিকারক বলে মনে হয়।

এ ছাড়া পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার পুনর্মুদ্রণ রয়েছে। অসম্ভব রকম শ্রম করে তা সংগ্রহ করেছেন, পরবর্তী পত্রিকায় বা সংকলনে সম্পাদক বা সংগ্রাহকের শ্রমকুণ্ঠার পরিচয়স্বরূপ দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ কবিতার অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে বা ভুল করা হয়েছে।

একজন প্রকৃত গবেষক শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কোনও কাজ করলে তা কীভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের 'জীবনানন্দ' গ্রন্থ তাঁর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

জীবনানন্দ/গোপালচন্দ্র রায়—সাহিত্যভবন, ২৬ মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ /৮০.০০

বিচিত্রস্বাদের আটটি গল্পগ্রন্থ

সোহারাব হোসেন

বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ সংযোজন হল প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালার ২১ তম গ্রন্থ—কিন্নর রায়ের ছোটগল্প গ্রন্থটি। সব দিকের বিচারেই গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট—স্বাদুতা এর সর্বাঙ্গ জুড়ে।

কিন্নর রায়ের ছোটগল্প এখানে যেন সদর্থে চালিত ও গতিবান এক একটি পুষ্ট, সাবলীল, মাটি ও মাটিময় মানুষের গন্ধে সুবাসিত মুখর এক একটি ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ড তথা ভূমিরূপ গুলি শিল্পেরও চমৎকার নিদর্শন। 'বলরাম' 'খড়ের বাছুর' 'স্থিতাবস্থা', 'নির্খোঁজ', 'মায়া-মুষিক', 'কালিদাস-পুকুর', 'ছবিতে পৃথিবী' 'বোধিসত্ত্ব', 'যক্' গ্রন্থভুক্ত এই ন'টি গল্পই পাঠকের সামনে নিজ নিজ প্রত্যয়ের ভূমিখণ্ডে দাঁড়িয়ে এক একটি স্বপ্নময় ভূমিরূপের দরজা খুলে দেয়। যার ভেদ-ক্ষমতা আছে, সে ওই দরজার ওপারের পৃথিবীটার রস বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারবে। —এখানে কিন্নর রায়ের গল্পের একটা কৌশলগত দিকের কথা বলে নেওয়া যায়। যাদের কাছে গল্প কেবলমাত্র ঘুমের মৌতাত কিম্বা বিনোদনের হেরোইন, কিন্নর রায় সচেতন ভাবেই বোধ হয় তাদেরকে পাঠক হিসাবে চান না। সেজন্যই তাঁর গল্প পড়তে গেলে দিক্ষিত মনন দরকার। সেই মনন যার আছে তার কাছে কিন্নর রায়ের গল্প সত্যি অর্থেই স্বতন্ত্র এক পৃথিবীর সন্ধান দেয়। আর সেই ভিন্ন এক পৃথিবীতে পৌঁছনোর পর কিন্নরের গল্পের দিকে তাকালে তাঁর গল্পের কয়েকটি মাত্রা আবিষ্কার করা যায়। সেগুলি হল:

ক. কিন্নর রায়ের গল্প একই সঙ্গে মননশীল এবং আকর্ষকও। গল্পে আছে অনন্যসাধারণ বীক্ষণ-বিবরণের বিস্তার। ডির্টেলস্ নির্মাণ। এ সব ক্ষেত্রে গল্প সাময়িক থেমে

যায়। কিন্তু বিচিত্র বিষয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনার বেগ সে সব ক্ষেত্রে বলবতী হয়ে পাঠকের মনকে যেন চুম্বক শক্তিতে টেনে রাখে। এই অদম্য চুম্বকশক্তির অন্য নামই বোধহয় গল্প। সংকলনভুক্ত 'নির্খোঁজ' নামের গল্পটি এই বৈশিষ্ট্যে গত দু-দশকের শ্রেষ্ঠতম ফসলগুলির অন্যতম বলে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

খ. কিন্নর রায়ের গল্পে আছে হারিয়ে যাওয়া এক বাংলার অন্বেষণ। হারিয়ে যাওয়া বঙ্গদেশ, তার সরল সাদাসিধে মানুষ, তার সমৃদ্ধি, তার একতা যেন চিরতরে মিলিয়ে যাওয়ার আগে তার শেষতম রশ্মির ঝলকানিতে আমাদেরকে আলোকিত করে যাচ্ছে। 'বলরাম' গল্পের বলরামের ভাবনায়, 'খড়ের বাছুর' গল্পের উট ও তার বাচ্চাটির অনুষঙ্গে, 'কালিদাস পুকুর' গল্পের সমস্ত ঘটনায় এই সত্য উজ্জীবিত—উজ্জীবিত কিন্নরের গল্পও।

গ. কিন্নর রায়ের গল্পের অন্তিম প্রতীতি নিদারুণ বাস্তব। বাস্তবের হানাহানি, অত্যাচার, রাষ্ট্র-প্রশাসনের বদরক্তযুক্ত থাবা—তার নখর কিন্নরের গল্পের সুষুম্নাকাণ্ড-কেন্দ্রতন্ত্রী। কিন্তু কঠিন বাস্তবকে তিনি জাফরিকাটা কারুকাজে রূপান্তরিত করেন পুরাণ ও পুরাণের নানান ঘটনা এবং দেশীয় মিথ ব্যবহারের মাধ্যমে। 'নির্খোঁজ' গল্পে ভূষণ্ডি কাক ও তার স্মৃতিচারণা তেমনই অভিসন্দর্ভ রচনা করে দিয়েছে। 'যক্' গল্পটি এ বিষয়ের অনবদ্য নির্মাণ।

ঘ. কিন্নর রায় সেই সব বিরল লেখকদের অন্যতম, যাঁর গল্পে মুসলিম জীবন ও বিহারি-জীবন, তার ভেতর বাইরের দ্বিধা, দ্বিধাহীনতা ও শোষণ-লাঞ্ছনা এক আশ্চর্য রূপকল্প রচনা করে। ফলে গল্পের বিষয়ের জন্য কিন্নরকে কখনও ভাবতে হয় না।

হ্যাঁ, শুধু বাস্তবের সত্য নয়, সত্যের রূপকল্প নির্মাণ করেন গল্পকার কিন্নর রায়। একজন পাঠক হিসাবে আমার মনে হয় এইখানটাতেই বড় জিত। গ্রন্থের ভূমিকায় গল্পকার উচ্চারণ করেছেন:

> "এই তেতাল্লিশের কোটায় পৌঁছে মনে হয় সংশয়ই বোধ হয় শিল্পের মূলসত্য। 'একমাত্র সত্য', 'চরম সত্য বলে' কিছুই হয়তো বাস্তবে হয় না। মানুষ প্রশ্ন করতে চায়। তার সামনে এক চিরকালীন জিজ্ঞাসা, রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মহাকাশ, অনন্ত সময়, বহুযুগের প্রাচীন সব নক্ষত্ররা। সেই তারার আলোয়, বহতা নদীর স্রোতে, চাঁদের আলোয়, রোদে, ভোরের বাতাসে জীবন গড়ে মানুষ। আনন্দ পায়, বিষাদে ডোবে। আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গল্প তো এরকমই, কারণ তা তো জীবন ঘিরেই।"

কিন্নর রায় এই জীবনের সংশয়মাখা রূপকল্প নির্মাণ করেন। গ্রন্থটি তাই বার বার পড়ার বারবার জীবনের রূপ খোঁজারও।

মুর্শিদ এ. এমের 'ফাউ ও ফেরেশতা' স্বতন্ত্র স্বাদের গল্প সঙ্কলন। তিনি তরুণ লেখক। তবে গল্প রচনায় তাঁর অনবদ্য সিদ্ধি। এই সিদ্ধির মূলে রয়েছে মুর্শিদের বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা। সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষজন, তাদের সুখ-দুঃখময় জীবন, তাদের ধর্মবোধ ও ধর্মবাঁধন এবং সেই বাঁধনের বিরুদ্ধে একটা স্বভাব-সরল বিদ্রোহ মূলত তাঁর গল্পের প্রাণকেন্দ্র গড়ে দেয়। 'রাতপোকা' কিম্বা 'ফাউ ও ফেরেশতা' ... এমন ভাবধারার বলিষ্ঠ গল্প। দুটো গল্পই দরিদ্রের গল্প। তবে দারিদ্র এই গল্পদুটির একটা মাত্রা, প্রধান মাত্রা নয়। সে দিকের বিচারে বলতে হয় 'ফাউ ও ফেরেশতার' গল্পগুলি শেষঅর্থে মানবিকতার গল্প। আর এই মানবিকতার নির্মাণে মুর্শিদ শক্তিমান শিল্পী। তাঁর 'পাথরের মাপ,' 'আয়ুবাতাস' কিম্বা 'পুতুলের হাত-পা' গল্পে মানবিকতার স্বচ্ছ নির্মাণটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানবিকতার নির্মাণ, দরিদ্রের অসহায়তা, হতাশা এবং সেই সঙ্গে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের মানুষের পিছিয়ে পড়ার রূপকে প্রতীকে গড়ে ওঠা 'রাতপোকা' গল্পটিই বোধহয় সঙ্কলনের সেরা গল্প। ইসলাম নামে ব্যক্তি, তার পিছিয়ে থাকা, সম্প্রদায়ের মধ্যে তার অবহেলিত রূপ, প্রতীকে ব্যাপ্ত মাত্রা পেয়ে গেছে। গল্পকার মুর্শিদ অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় গড়ে তুলেছেন ইসলামকে। ওই একই মমতার অংশভাক হয়েছে ফাউ ও ফেরেশতা গল্পের খোশনবি। খোশনবি গল্পকারের বিশিষ্ট সৃষ্টি। স্বতন্ত্রও। একদিকে খিদে অন্যদিকে জুম্মার নামাজ। মাঝখানে বিস্তৃত স্পেশে খোশনবির মনের দ্বান্দ্বিকতা। সেখানে ধর্ম ও ধর্মের বাঁধন কেমন যেন আলগা হয়ে যায়। 'ফেন্সি' ফেরেশতার স্থানে তাই সে দেখে তার ছেলেমেয়েকে—"ওজু ভেঙে গেল যে। সুন্নত খেলাপ হয়ে গেল যে, কারা যেন ফিন ফিন করে বলতে থাকে। দু'কাঁধের দুই ফেরেশতা নাকি গো! না তো, এ যে মেরিনা আর হাবিবের কলকলে হাসির আওয়াজ।" —এমনই মুর্শিদের দর্শন, ভাবনার নির্মাণ। তা ওপরে ওপরে বেশ সরল—সহজও। কিন্তু ভিতরে তার বেশ ঘূর্ণি। 'আয়ুবাতাস' গল্পের 'পরীযান' কিম্বা 'পুতুলের হাতপা' গল্পের বরীন কিম্বা 'পাথরের সাপ' গল্পের ব্রিজেশের মধ্যে সেই ঘূর্ণির লক্ষ কোটি আঁচড়। মুর্শিদ, অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে সেই সব আঁচড় ও বাঁককে মূর্ত করেন। অনায়াস দক্ষতায়। —নির্মাণের এই বৈশিষ্ট্যে বড় লেখক হওয়ার গুণ মুর্শিদের কলমে দানা বেঁধে আছে।

সব অর্থে 'ফাউ ও ফেরেশতা' একটা ভাল গল্পের বই। তা বারবার পাঠের আমন্ত্রণ জানায়। বইটি সংগ্রহে রাখার যোগ্য।

অজিত দে'র গল্পগ্রন্থ 'জতুগৃহের নকশা' আকর্ষণীয় গল্পের সংকলন। একবার পড়া শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন ছাড়া যায় না। তাঁর বিষয় নির্বাচনও বিচিত্র। গল্পগুলিকে সুখপাঠ্য করার একটা প্রবণতা গল্পে লক্ষ করা যায়। প্রায় সব গল্পেরই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থনৈতিক চাপহেতু ভেঙে পড়া সংসারের ও ব্যক্তিমানুষের বিপর্যয়কর আপসকামী চিত্র। গল্পকার আবেগে ও সেন্টিমেন্টের সূক্ষ্ম মেলবন্ধনে সে চিত্রকে বাড়তেও দেন। এটা গল্পকারের শক্তিমত্তার পরিচয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও উচ্চার্য — গল্পগুলিতে শুধুই হৃদয়াবেদন সৃষ্টির প্রচেষ্টা, মস্তিষ্কের ব্যবহার খুবই কম। লেখকের গল্প লেখার শুরু ছ'য়ের দশকে, সংকলনভুক্ত গল্পগুলি সাতের দশকের, কিন্তু গল্পগুলি পড়তে বসে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের কোনও গল্প পড়ছি। আর অদ্ভুতভাবে এই ক্ষেত্রে মনে এসে যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা। অজিতবাবুর গল্পগুলির কেন্দ্র-স্বভাবে কোথায় যেন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাবনার ছাপ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন ধরা যাক 'দেওয়াল', 'আপস' কিম্বা 'জতুগৃহের নকশা' গল্পগুলির কথা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে দেখি অর্থনৈতিক চাপে পড়ে গৃহবধূকেও বাইরে যেতে হয়েছে চাকরি নিয়ে এবং এই সূত্রে নরেন্দ্র মিত্রের গল্পে এসেছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিত্র (উদাহরণ হিসাবে অবতনিকা, অভিনেত্রী, সেতার ইত্যাদি গল্পের নাম করা যেতে পারে)। অজিতবাবুর গল্পে যেন সেই সমস্যারই রূপায়ণ ও নির্মাণ। তফাৎ শুধু একস্থানে — নরেন্দ্র মিত্রে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আছে আর অজিতবাবুতে আছে সেই অবক্ষয়ের সঙ্গে আপস। এই কারণেই বোধ হয় দেওয়াল গল্পের পিতা অবনী, টাকার জন্য চাকুরি করা অবিবাহিত বড় মেয়ের ব্যাপে হাত দিয়ে, সেখানে জন্ম-নিরোধক পিল দেখেও নীরবে সব কিছু মেনে নেয়। আপস করে। কিম্বা 'আপস' গল্পের শ্যামল বসু মাধুরীর কটাক্ষ সত্ত্বেও, মনে প্রেমের টান সত্ত্বেও, চাকরির অজুহাতে, চাকরি বাঁচানোর জন্যই, টাকার কারণেই দুজনে পরস্পরের বন্ধুরে — ধানবাদে ও কলকাতায় — থাকার সিদ্ধান্তকেই কেবলই সমর্থন করে যায়।

অজিত দের গল্পে অর্থনীতির সঙ্গে প্রেম-দাম্পত্যের একটা তুমুল লড়াই আছে। আর এ-লড়াইয়ে কেবল অর্থই জেতে। 'দেওয়াল', 'আপস, জতুগৃহের নকশা, 'জনক' সবেতেই অর্থ এসেছে অভিশাপ হয়ে। মানুষগুলো সেই অভিশাপ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বারে বারে। আসলে 'জতুগৃহের নকশা'র গল্পগুলি ভাঙনের গল্প। অর্থ-চাপে ক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত মানুষের ভিতরটা যে ক্ষয়ে যাচ্ছে তার চিত্র অজিত দের গল্পে আছে। কিন্তু এই সব বিষয়-কেন্দ্রিক গল্প যতখানি তীক্ষ্ণ হতে পারত গল্পগুলি সে-পথে হাঁটেনি। জনমনোরঞ্জনের একটা তাগাদা গল্পগুলিতে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে। যেমন : ১. কালো মেয়ের বিয়ের সমস্যাকে ঘুরে ফিরে নানা গল্পে দেখা। ২. অর্থের জন্য স্ত্রীকে বাইরে পাঠিয়ে দাম্পত্যের টানাপোড়েন সৃষ্টির পৌনঃপুনিকতা। ৩. সব গল্পেই প্রেমের আবেগময় চিত্র রচনার প্রচেষ্টা।

কিন্তু এই বাহ্য। এক সময়ের বাঙালি জীবনের ভাঙনের চিত্র হিসাবে গল্পগুলির মূল্য নির্ণিত হতে পারে অনায়াসেই। সেই প্রেক্ষিতে 'জনক' গল্পটির সার্থক রচনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। শুধু পাঠক হিসাবে একটাই হতাশা আমাদের — গল্প রচনায় যাঁর এতটা সিদ্ধি তিনি সমাজ-অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে বসে কেন আরও তীক্ষ্ণ সূচীমুখের সামনে ফেলে বিষয়কে বিন্যস্ত করলেন না — বিশ্লেষণ করলেন না?

'ঋড়ঝঞ্ঝা' শুভমানস ঘোষের পঞ্চম গ্রন্থ। এটির আগে লেখকের তিন তিনটি গল্পের বই এবং একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু চতুর্থতম গল্পগ্রন্থে যে পরিণতি আশা করা যায় সংকলনের গল্পগুলি তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। চোদ্দটি গল্প যে গ্রন্থে জায়গা পেল সেখানে মনে রাখার মতো গল্প হাতেগোনা দু'খানা মাত্র। নামগ্রন্থ 'ঋড়ঝঞ্ঝা' এবং 'পাখির অদৃশ্য পালক' লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়।

'ঋড়ঝঞ্ঝা' গল্পটি দু'জোড়া দম্পতির মধ্যেকার তুলনামূলক ভালমন্দ-প্রেম-অপ্রেমের পরিবেশনায় চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। দীপ-রিনি এবং শুভ্র-প্রমিতা — এই দু'জোড়া দম্পতির সুখ-অসুখের গল্প এটি। একদিকে ঐশ্বর্য অন্যদিকে প্রেম — তুলনা প্রতিতুলনায় হতাশা ও পাওয়ার চিত্রনাট্য যেন গল্পে প্রবাহিত। রয়েছে ঘটনার চাকচিক্য, পরিণতিও সেইমতো। ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কের ভাঙা-গড়ার প্রতীক হয়েছে। যদিও এই প্রতীক বড়ই দুর্বল। আসলে প্রতীকটি ঘটনার অনুষঙ্গে এসেছে, মননের মাত্রা নিয়ে আসেনি। আসেনি বলেই এই ভাল গল্পটি শেষপর্যন্ত যেন কেমন একটা হালকা ভাবের আমদানি ঘটায়।

সংকলনটির আর একটি ভাল গল্প 'পাখির অদৃশ্য পালক'। যন্ত্র ও মানবের মধ্যে একটা প্রতিতুলনা এনে পাওয়া না পাওয়ার খেলাটাকে বেশ আকর্ষণীয়ভাবে খেলেছেন গল্পকার। তবে গল্পের পরিণতিতে যেন ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছাকৃত একটা ছোপও এখানে লেগে গেছে।

এমন ইচ্ছাপূরণের সাদামাটা গল্প 'ঋড় ঝঞ্ঝা'তে অনেকগুলো আছে। কোথায় যেন আঁতের কথার উদ্ঘাটনের পরিবর্তে মানুষের জীবনের উপবিতলের ভাসা ভাসা রূপায়ণের চাপ লেখককে জনপ্রিয় গল্প রচনায় তাড়িত করেছে। 'রাস্তায় লাশ', 'ধর্মক্ষেত্র', 'ভূকম্পন', 'নীলপরী', 'চতুর্থপর্ণ', 'ভাইরাস' — সব গল্প সম্বন্ধে একথা বলা যায়।

'নকশি কাঁথার দেশ' হিতেন নাগের চতুর্থ গ্রন্থ। খুব সম্ভবত

গল্পগ্রন্থ হিসাবে এটি লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির প্রায় সবকটিই অত্যন্ত হালকা চালের এবং গল্পগুলিকে সুখপাঠ্য করার একটা সচেতন প্রয়াস যেন গুপ্ত থাকেনি। ফলে গল্পগুলি যেমন হয়েছে ইচ্ছাপূরণের গল্প অন্যদিকে তা রমাতাও অর্জন করেছে। 'গাও ফিরে', 'নকশি কাঁথার দেশ', 'এম.পি. নারায়ণ চাটুজ্যের গল্পো', 'ভুবনচন্দ্র কবি হতে চেয়েছিল,' 'হাক্ক পঞ্চায়েতের ভারতদর্শন' ইত্যাদি সার্থকনামা গল্পগুলি পড়া যায় তরতর করে। পড়তে পড়তে একপ্রকার রমারচনার মজাও পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পগুলি পড়া শেষ করার পর, গল্পবিষয় থেকে বোধ ও বোধির জন্য কিছুই যেন পাওয়া যায় না। এখানে গল্পের পরিবর্তে কোথায় যেন একটা প্রতিবেদন রচনার ইমেজ ধরা পড়ে। এই বিচারে গ্রন্থের প্রথম গল্প বাদে বাকিগুলিতে তাড়াহুড়ো করে বক্তব্য শেষ করার একটা তাড়িত মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়।

নীহারুল ইসলাম তরুণ লেখক। 'পঞ্চব্যাধের শিকার পর্ব' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি বড়ই আকর্ষণীয় ও ব্যাঞ্জনাময়। এই গ্রন্থে জায়গা পাওয়া দশটি গল্প তাই যতটা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম তৃপ্তি ততটা কেন তার অর্ধেকও মিটল না। গ্রন্থের বিষয়ের অনবদ্য উপস্থাপনা পাঠকের মনে গেঁথে বসে। দ্বিতীয়ত, এই সব বিষয়কে সাহিত্যের বিষয় করে যে ভাবনার প্রকাশনা গল্পগুলিতে ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। তাঁর গল্পগুলি সুখপাঠ্য কিন্তু গল্পগুলি সুখপাঠ্য করার বাজার চলতি পদ্ধতি গ্রহণের প্রচেষ্টা একদম নেই। আর এখানেই গল্পকার কামাল হোসেনের অধিক সিদ্ধি। এবং উত্তরণ। গল্পে স্বাদুতা আনার জন্য কোথাও সস্তা সেন্টিমেন্ট আনয়ন নয়, কিম্বা ঘটনার অস্বাভাবিকতা সৃজন নয়, গল্পশিল্পী কামাল হোসেন সম্পূর্ণ রূপে মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পথে হেঁটেই তাঁর গল্পকে আকর্ষক করতে সক্ষম হয়েছেন। যাঁরা রচযিতা তাঁরা জানেন — এই প্রক্রিয়া কতটা কঠিন। গল্পকে একই সঙ্গে মননশীল করা এবং আকর্ষণীয় করাটা দুরূহ কাজ। কেননা, মননশীলতা কাহিনীকে থামিয়ে দেয়, ঘটনাকে পাশে রেখে মননধর্ম বড় হয় সেখানে। আর কাহিনীর গতি থেমে গেলে গল্পের আকর্ষক ক্ষমতা সাধারণভাবে কমে যায়। কিন্তু দক্ষ শিল্পীরা দুটোকে অনবদ্যভাবে মেলান, মিলিয়ে দিয়ে গল্পের স্বাদুতাকে সৃজন করেন। কামাল হোসেনের গল্পগুলি সেই বিশেষ কৃতির ফসল।

আর এ কাজে কামালের বড় অবলম্বন হয়েছে তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা। গল্পকে, ঘটনাকে তিনি একঘেঁয়ে হতে দেন না। গল্পে গল্পে বিষয়, ভাব, বক্তব্য, অভিনন্দর্ভ সব কিছু নতুন হয়ে ওঠে। কখনও তিনি অশীতিপর তিন বৃদ্ধার আসন্ন মৃত্যু-বোধের মনন নিময় থাকেন, কখনও এ যুগের নিজ বক্তব্যও যেন উদ্দেশমূলক। যেন গোড়া থেকে সেই বক্তব্যকে জোর করে ফোটানোর চেষ্টা। গল্পে তো এমনটা মানায় না। তবে গল্পকারের মুন্সীয়ানা প্রকাশিত গ্রন্থের নামগল্পে। গল্পটি প্রতীক-গল্প। পঙ্ক ব্যাধ, একটি শিয়াল এই সমাজের বিশেষ ব্যক্তি, বক্তব্য ও অভিসন্দর্ভের প্রতীক। নিতান্ত সাধারণ মানুষের, নিপীড়িত মানুষের ক্রোধ ও ক্ষোভ যেন এখানে রূপকের মাধ্যমে জীবন্ত। সেই ক্ষোভ একত্রিত হলে যে ধূর্ত সমাজ-শিয়ালদেরও মৃত্যুমুখে নিপতিত করাতে সক্ষম, তার বাঞ্ছনাই গল্পের রসপরিণতিকে ঘনীভূত করেছে।

গল্প বলার প্রচল ঢং নীহারুলের গল্পে আছে। তবে তাঁর গল্পের মধ্য থেকে যেন ভিন্ন আর একটি গল্প উঠে আসার ইঙ্গিত থাকে — যেটা আধুনিক ছোটগল্পের পরশপাথর। নীহারুল সে পথে হাঁটার আভাস রেখেছেন। মনে হয় এখানেই তাঁর যথার্থ শক্তি নিয়োগ করা উচিত। তবে একটা সাবধানবাণী এখানে উল্লেখ করাই যায় যে, যে পাঠক মনোরঞ্জনের উপাদান তিনি এই সংকলনের অনেকগুলি গল্পে ব্যবহার করেছেন, সেখানে এখনই রাশ টেনে ধরা দরকার।

কামাল হোসেনের 'মর্তো তিন পরী' একটি চমৎকার গল্পগ্রন্থ। এই চমৎকারিত্ব তাঁর গল্পে এসেছে নানাভাবে। প্রথমত, অভিনব বিষয়ের অনবদ্য উপস্থাপনা পাঠকের মনে গেঁথে বসে। দ্বিতীয়ত, এই সব বিষয়কে সাহিত্যের বিষয় করে যে ভাবনার প্রকাশনা গল্পগুলিতে ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। তাঁর গল্পগুলি সুখপাঠ্য কিন্তু গল্পগুলি সুখপাঠ্য করার বাজার চলতি পদ্ধতি গ্রহণের প্রচেষ্টা একদম নেই। আর এখানেই গল্পকার কামাল হোসেনের অধিক সিদ্ধি। এবং উত্তরণ। গল্পে স্বাদুতা আনার জন্য কোথাও সস্তা সেন্টিমেন্ট আনয়ন নয়, কিম্বা ঘটনার অস্বাভাবিকতা সৃজন নয়, গল্পশিল্পী কামাল হোসেন সম্পূর্ণ রূপে মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পথে হেঁটেই তাঁর গল্পকে আকর্ষক করতে সক্ষম হয়েছেন। যাঁরা রচযিতা তাঁরা জানেন — এই প্রক্রিয়া কতটা কঠিন। গল্পকে একই সঙ্গে মননশীল করা এবং আকর্ষণীয় করাটা দুরূহ কাজ। কেননা, মননশীলতা কাহিনীকে থামিয়ে দেয়, ঘটনাকে পাশে রেখে মননধর্ম বড় হয় সেখানে। আর কাহিনীর গতি থেমে গেলে গল্পের আকর্ষক ক্ষমতা সাধারণভাবে কমে যায়। কিন্তু দক্ষ শিল্পীরা দুটোকে অনবদ্যভাবে মেলান, মিলিয়ে দিয়ে গল্পের স্বাদুতাকে সৃজন করেন। কামাল হোসেনের গল্পগুলি সেই বিশেষ কৃতির ফসল।

আর এ কাজে কামালের বড় অবলম্বন হয়েছে তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা। গল্পকে, ঘটনাকে তিনি একঘেঁয়ে হতে দেন না। গল্পে গল্পে বিষয়, ভাব, বক্তব্য, অভিসন্দর্ভ সব কিছু নতুন হয়ে ওঠে। কখনও তিনি অশীতিপর তিন বৃদ্ধার আসন্ন মৃত্যু-বোধের মনন নিময় থাকেন, কখনও এ যুগের নিজ

পায়ে দাঁড়ানো নারীর স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাহীনতার তুলাযন্ত্রকে ব্যবহার করে সুবিধাভোগী পুরুষের আদিমতার মুখোশ খোলেন, কখনও কলকাতায় বসবাসকারী চিনা জীবনের আশা-নৈরাশ্যের মানসিকতাকে মূর্ত করেন, কখনও বা তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে ব্যবহার করে মানবমনের অতৃপ্তির রেণুটিকে জীবন্ত করেন। তবে সব কিছুই চিত্রিত হয় মননশীলতার সূত্র ধরে।

গ্রন্থের নামগল্পটিই বোধহয় সংকলনের শ্রেষ্ঠতম গল্প। মৃত্যু, মৃত্যুভাবনা এবং মৃত্যুর অনুষঙ্গে জীবনের অনেকগুলি বছর কাটানো তিন বৃদ্ধা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে এখানে যেন জীবনের মুখোমুখী হয়েছে। এককথায়, এটি ভাল গল্প। তিনটি ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের এ যেন মননস্ছেদ। ক্রমিক মনন উন্মোচনের মাধ্যমে এখানে ঘটেছে সত্যরূপের উন্মোচন। তিন বৃদ্ধার স্মৃতিকথা এখানে যেন উপকথা-রূপকথার পর্যায়ে উত্তীর্ণ। গল্পকারের অভিসন্দর্ভ নির্মাণ এখানেই সার্থক। গল্পকারের জিতও এখানে।

'মর্তে্য তিন পরী' গল্পের বিষয়ে যেমন অভিনবত্ব, ঠিক তার পাল্টা 'স্ত্রীর পত্র: শ্রাবণ ১৪০১' গল্পটি। বিষয়বস্তু এখানে অতি পরিচিত। পুরনো। নারী স্বাধীনতা ও নারীমুক্তি নিয়ে এটা পুরানো বিষয়ের গল্প। কিন্তু এর চমৎকারিত্ব এর পরিবেশনায়। বলতে পারি নতুন ফ্রেমের চমক গল্পটিকে শেষ পর্যন্ত পড়তে বাধ্য করায়। রবীন্দ্রনাথের এই নামের গল্পের অনুরণনটিকে লেখক এখানে সচেতনে, ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করেছেন। এমনকী তাঁর গল্পের নায়িকার নামও কামাল রেখেছেন—মৃণাল। এটা তাঁর সাহিত্যিক দুঃসাহস। এবং এখানেও তিনি জিতেছেন। কেননা, পাঠকের কৌতূহল বাংলার স্রষ্টা-গল্পকারের চরিত্রের পরিণতি ও বক্তব্যের সঙ্গে কামালের নায়িকার তুল্যমূল্যতায় জেগে ওঠে। গল্প রচনার এই কৌশলই কামালের গল্পকে সার্থক করে তুলেছে।

তবে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং গল্পে অভিসন্দর্ভ রচনার মুন্সিয়ানায় সব থেকে বেশি করে মনকে টানে 'ড্রাগনের ঘর গেরস্থি' এবং 'আত্মজ' গল্প দুটি। দুটি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে ফারাক ঐতিহাসিক কালের। একটির পটভূমি খ্রিস্টীয় ১৪০০ সালের। অন্যটির বর্তমান কলকাতার চিনাপল্লী। কিন্তু দুটি গল্পের মধ্যে যেন কোথায় অস্তিত্ব-সঙ্কটে পড়া মানুষের আর্ত কান্নাধ্বনি প্রবাহিত। একদিকে বাংলার সেন বংশীয় রাজাদের বংশরক্ষার রাজকীয় হুতাশন অন্যদিকে দীর্ঘ দেড়শ বছর কলকাতায় বসতকারী চিনা-মানবের বংশধরের অস্তিত্বের অবক্ষয়িত হতাশা। দুয়ের মাঝখানে কামাল হোসেনের অনায়াস যাতায়াত। শিল্পের রাস্তা ধরে। —এ রাস্তা তাঁর নিজস্ব সৃজনে ভরপুর, মুখর।

অশোকেন্দু সেনগুপ্তের 'ভদ্রলোক' গল্পগ্রন্থটি বড়ই সাদামাটা সব গল্পের সংকলন। গল্প বলাতে—বস্তুকে, বিষয়কে সাহিত্যকর্মে রূপান্তরিত করাতে শেষপর্যন্ত যে শিল্পীত মোচড় লাগে, সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাই যেন অনেকখানি অনায়ত্ত থেকে গেছে গল্পকারের।

তাই অনেকক্ষেত্রে তাঁর গল্প যেন সামাজিক বক্তব্যের সরাসরি পরিবেশনাতে পর্যবসিত হয়ে গেছে। গ্রন্থের নামগল্প 'ভদ্রলোক'-এ এ-ত্রুটি সর্বাধিক। তবে সংকলনটির সেরা গল্প নিশ্চিতরূপে 'অ্যাকোয়ারিয়াম' নামের গল্পটি। স্বার্থসর্বস্ব মানুষের মুখোশটি এখানে খুলে গেছে এক পরিবারের অদ্ভুত নিলামের সূত্রে। 'উদ্বাস্তু' গল্পটি জমে উঠল না গল্পকারের সমস্যার গভীরে প্রবেশের অনীহার কারণে। 'পোস্তবড়া ও পান্তাভাত' গল্পটি বাচ্চাদের জন্য লিখিত কোনও গ্রন্থেই মানাত ভাল—এখানে নয়।

কিন্নর রায়ের ছোটগল্প: কিন্নর রায় / প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৩

ফাউ ও ফেরেশ্‌তা: মুর্শিদ এ.এম / দিবারাত্রির কাব্য। চম্পাহাটি। দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

জতুগৃহের নকশা: অজিত দে / স্বর্ণাক্ষর, ৩১৯/২ নেতাজী সুভাষ রোড। হাওড়া-৭৪১ ১০১

ঝড়ঝঞ্ঝা: শুভমানস ঘোষ / ওয়ানটাচ, ৭, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলকাতা-১৪

নকশি কাঁথার দেশ: হিতেন নাগ, পি.ডি. পাবলিকেশন লিমিটেড, কলকাতা-১৭

পঞ্চব্যাধের শিকার পর্ব: নীহারুল ইসলাম / দিবারাত্রির কাব্য, চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মর্তে্য তিন পরী / কামাল হোসেন / প্রমা, ৫-ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭

ভদ্রলোক: অশোকেন্দু সেনগুপ্ত। দীপ প্রকাশন। ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

পঞ্চাশ বছরের হিসাবনিকাশ

পুলকনারায়ণ ধর

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট মধ্যরাত্রে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে নিয়তির সঙ্গে যে অভিসার শুরু হয়েছিল আজ তার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হল। একটি দেশ বা জাতির জীবনে পঞ্চাশ বছর কোনও কালই নয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ হিসাবে এই পঞ্চাশ বছর বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই পঞ্চাশ বছরের পেছনে আরও একশো বছরের সংগ্রাম ও প্রস্তুতি ছিল অবিরাম। ত্যাগ, বীর্য, ধৈর্য ও আত্মদানের কাহিনী নিয়েই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গাঁথা। তাই বিগত পঞ্চাশ বছরে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে কতটা মর্যাদা দিতে পেরেছি, এবং যে মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তার প্রতি কতটা যথার্থ শ্রদ্ধার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারে চিন্তাশীল বিদগ্ধ ব্যক্তিরা ব্যাপৃত হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গ্রন্থটি এমনই একটি সংকলন যা স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিল্প সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রের একটি বিশ্বস্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। "ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি অথবা তার অভাবের হিসাব নিকাশ" তুলে ধরার ইচ্ছাই এই প্রবন্ধ সংকলনের প্রেরণা। ভারত বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারতের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, প্রশাসন, মুসলিম নারী, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম, সাহিত্য, বিজ্ঞান সাধনা, শ্রমিক সমাজ, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রভৃতি মোট পঁচিশটি ছোট বড় প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

একেবারে গোড়ার ইতিহাস দিয়েই শুরু করেছেন মনস্বী প্রবন্ধকার অন্নদাশঙ্কর রায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় সরকার, গ্রুপ সরকার ও প্রদেশ সরকারের কাঠামো মেনে দেশের অখণ্ড স্বাধীনতা গ্রহণ করতেন তবে এই তিন কর্তৃপক্ষের "পারস্পরিক বিবাদে গোটা দেশকে অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতেন।" জিন্না ও গান্ধীজির আশা ছিল বাঙালি হিন্দুরা বাংলা ভাগ চাইবেন না। কিন্তচ "জিন্না সাহেবের ডাইরেকট অ্যাকশনের ঘোষণার দিন কলকাতায় তার প্রয়োগ দেখে" এবং নোয়াখালির ঘটনার পর বাঙালি হিন্দুরা "খেপে গিয়েছিল।' তারা আর ধৈর্য ধরতে পারল না" (পৃ: ১১)।

অন্নদাশঙ্করের মতে "অনিচ্ছুক পার্টনারকে নিয়ে যেমন দাম্পত্য জীবন হয় না, অনিচ্ছুক পার্টনারকে নিয়ে তেমনি জাতীয় জীবন হয় না" (পৃ: ১২)। কংগ্রেস মুসলিম লিগকে ভারতভূমির একভাগ ছেড়ে দিয়ে ঠিকই করেছিল। তথাপি সেটা ছিল সামগ্রিক দৃষ্টিতে একটা গ্রেট ব্লান্ডার' (পৃ: ১২)

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও এবং "ভারতের মাটিতে ফ্যাসিজম জন্ম নিলে তা জন্মাবে ধর্মের নামেই। একথা বললেও অন্নদাশঙ্কর চান না "জনগণ ধর্মহীন হোক।" কারণ সেকুলার স্টেট মানে তাঁর কাছে "ধর্মহীন রাষ্ট্র নয়।" ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশে ও বহুত্ববাদী সমাজে ফ্যাসিজমের ভূত শুধু কি (অ) ধর্মের মধ্যেই খুঁজলে হবে? এখানে ফ্যাসিজমের বীজতলা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। জাতিদ্বন্দ্ব, ভাষাদ্বন্দ্ব, আঞ্চলিকতা এমনকী গণতান্ত্রিক দল পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যেও। এত বড় দেশে ফ্যাসিজমের চেহারাই বা কেমন হওয়া সম্ভব এবং কত দিনই বা যে টিকতে পারবে এ সব প্রশ্ন সততই মনকে উৎকণ্ঠিত করে। সে সম্বন্ধে কোনও পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক আলোচনাও বিশেষ দেখা যায় না। অন্নদাশঙ্করের এই রচনাতেও নয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি দেখে গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন "An ignoble end of a glorious struggle". স্বাধীনতার পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছর ছিল একটি 'heroic period' বা বীরত্বের যুগ। তা নিয়ে একটি এপিক বা মহাকাব্য লেখা যায়। "কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর যুগ নিয়ে একখানা এপিক লেখা যায় না। এটা একটা heroic period নয়" (পৃ: ১৮)। অন্নদাশঙ্কর এই মতই পোষণ করেন। তবু গর্ব এই যে আমাদের নেশন ভেঙে পড়েনি। গণতন্ত্রও অটুট আছে। স্বাধীনতার পর "বিপ্লব বেপাত্তা" হওয়ায় কমিউনিস্টরাও যে "বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাগযুদ্ধ" করছেন তা দেখে লেখক যুগপৎ আশ্চর্য ও খুশি।

হোসেনুর রহমান ভারত বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে অধিকাংশ হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম ও সমাজচিন্তায় এতটুকু আধুনিকীকরণ কল্পনা করতে পারেনি" (পৃ: ২১)

মন্তব্যটি গভীর হলেও তার ব্যাখ্যা তিনি পাঠকের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। ধর্মকে তার যথার্থ মর্যাদা দিয়ে যদি পালন করা হয় এবং রাজনীতির সংকীর্ণস্বার্থে ব্যবহারযোগ্য করে না তোলা হয় তবে তথাকথিত আধুনিকীকরণের ঋত্বিকদেরও তেমন প্রয়োজন হবে না।

সমস্যাটা অন্যত্র, এবং সে সম্পর্কে হোসেনুর খুব চাঁছাছোলা ভাষায় বলছেন: "হিন্দু প্রতীক ধর্মী। মুসলমান প্রতীক নির্মাণে অপটু। এখন ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে মুসলমান ভারতবর্ষে সংখ্যায় কম এবং আধুনিক কালে সৃষ্টিশীল আচরণে অনভ্যস্ত।........ সমস্যাটা হল মুসলমান মন তখনও

ন্যাশনালিজমে মজতে শেখেনি। মুসলিম বিশ্বে ন্যাশনালিজম অনেক পরে এসেছে" (পৃ: ২৩)। কিন্তু হোসেনুরের মত নির্বিচারে মেনে নেওয়া কষ্টকর যে মুসলমানরা "দেশ মাতৃকার সেবায় প্রায়শই অনুপস্থিত।" মুসলমানরা তো সংখ্যায় অল্প, বিশেষ করে মধ্যশ্রেণী তো তেমন ছিলই না মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারা হিন্দুদের মতন দলে দলে জেল ভরবে কেমন করে? এটা না বুঝলে মুসলমানদের ওপর অবিচার হবে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে আমাদের স্বাধীনতা "অনেকটা আকস্মিক ভাবে পেয়ে যাওয়া স্বাধীনতা।" ফলে আদর্শ ও বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে আমরা হয়েছিলাম 'হতাশ ও হতবাক।' তিনি কি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কথা ভেবে এ কথা বলছেন? সে সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করলে ভাল হত।

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারতের প্রশাসনের বিষয়ে লিখেছেন অশোক মিত্র। প্রশাসনের তুলনামূলক আলোচনা ছিল আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু প্রশাসন সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর ধারণাই রচনাটির মূল বিষয়বস্তু। রচনাটি অন্যত্র পূর্ব প্রকাশিত ও বহুপঠিত।

ড. উৎপল বন্দোপাধ্যায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। বিষয় 'ভারতের উত্তর স্বাধীন চারণ কলা। রচনাটি মনোগ্রাহী ও পরিশ্রমস্বচ্ছ। সঙ্গীত, নাটক, চিত্রশিল্প ও নৃত্যের ভারতীয় মূলকে তিনি স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে উপস্থিত করেছেন। ভারতীয় জীবনে ও ধর্মীয় জীবনচর্যায় কি ভাবে তা প্রোথিত আছে তার সুচারু বিশ্লেষণ করেছেন। দূরদর্শন ও অন্যান্য গণমাধ্যমের কল্যাণে চারণকলার জনপ্রিয়তা বাড়লেও এর গুণমান ও গুণগ্রাহীতা কতটা বাড়বে সে সম্বন্ধে লেখকের সংশয়ও যথার্থ।

শিক্ষার সমস্যা অতুল। সেই তুলনায় সুদিন ভট্টাচার্যের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধটি আকারে ছোট। আধুনিক ও বর্তমান ব্যবস্থার কাঠামো বাতিল করা সম্ভব নয় এই বাস্তববোধ থেকে সরে না এসে এরই সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কথাই তিনি বলেছেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ. এম. আহমদির মতে ভারতের গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হল জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের অবজ্ঞা, অবহেলা এবং অজ্ঞতা। জনগণের যথার্থ প্রতিনিধির ভূমিকা পালনে তাঁরা ব্যর্থ। জনগণ তাই আদালতের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষার বা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান জনগণের স্বার্থের ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকলে সর্বোচ্চ 'আদালতের তরফ থেকে এ জাতীয় পদক্ষেপ নেবার দরকারই পড়ত না।' এই অবস্থা 'সাময়িক হলেও' অবশ্যম্ভাবী। বিচার বিভাগের সাম্প্রতিক সক্রিয়তা (judicial activism) রাজনীতিবিদদের ও সাংসদদের বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে। সুতরাং প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকেও তারা যে নির্বিচারে গ্রহণ করবেন না তো বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে এত প্রাঞ্জল বক্তব্য প্রায় দুর্লভ।

সংবাদপত্র ও পত্রিকার জগৎ সম্পর্কে একটি তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র সরকার। জনমানসে সংবাদপত্র পত্রিকার প্রভাব অমোঘ ও সুদূরবিস্তারী। ১৯৯০ সালের হিসাবে ২৮৪৯১ টি পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখ করা যায় যে জনগণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইংরাজি ভাষার সঙ্গে অল্প পরিচিত হলেও ইংরাজি পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৬৭,১১,০০০। সংস্কৃত ভাষাতেও ৩৬ টি পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়।

একটা সত্য এই তথ্য থেকে উঠে আসে যে যতদিন পর্যন্ত সংবাদ বা বিকীর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ মানুষ উপযুক্ত শিক্ষিত হয়ে না উঠবে ততদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষই আমাদের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক থাকবেন। শুধু পত্রপত্রিকা চাপা দিয়েই তাদের ঢেকে রাখা যাবে।

ড. সুধীন সেনগুপ্ত স্বাধীনভারতে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি লক্ষ করলেও স্বাধীনতার এক দশক পর থেকেই বহু তরুণ ও সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী এদেশে 'উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযুক্ত সামাজিক মূল্য না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে চলেছে।' মহাকাশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, জেনেটিক ও বায়োটেকনোলজি, পক্ষীতত্ত্ব পরমাণু বিজ্ঞান প্রমুখ ক্ষেত্রে ভারতের বিজ্ঞানচর্চার সংক্ষিপ্ত চালচিত্র লেখক উপহার দিয়েছেন।

গোপীকান্ত ঘোষ প্রচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার উপস্থিত করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে এক নিমেষে বিরাট ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় পরিচয় পাওয়া গেল। সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা ও ভাষা গোষ্ঠীর মানুষদেরও তিনি একটি পরিচয় তুলে ধরেছেন প্রশংসনীয় দক্ষতা ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে।

ব্রাত্যজনের চেতনা আন্দোলন ও মণ্ডল কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে সজল বসুর প্রবন্ধটি চিন্তা ভাবনাকে সক্রিয় করে বটে কিন্তু মতামতের একপেশে ঝোঁক ও উগ্রতা প্রবন্ধটির দুর্বলতা। জন্মভাগ্যবানদের বিরুদ্ধে ব্রাত্যজনের সমস্ত চিৎকারই যে তাদের সুস্থ চেতনার প্রতীক তা মেনে নেওয়া শক্ত। কোনও একটি যুগের অবিচারের প্রতিকার পরবর্তী যুগের পাল্টা অবিচার ও বিশৃঙ্খল দাবির মারফৎ অর্জন করা সম্ভব কি না আবেগতাড়িত না হয়ে সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে তা বিচার করতে হবে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি আত্মস্মৃতিমূলক। আজকের কমিউনিস্ট নেতারা এককালে আমাদের স্বাধীনতাকে "ঝুটা আজদী" বলে বর্জন করার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আজকাল

কিছু শোনা না গেলেও হীরেনবাবুর মতে তা ছিল কমিউনিস্টদের 'পক্ষ থেকে কতকটা অসময়ের আওয়াজ (হয়ত যথেষ্ট প্রস্তুতি বিনাই)' পৃ. ২৪৮. কিন্তু এই প্রাজ্ঞ অশীতিপর সাম্যবাদী ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। একে তিনি 'পুরোপুরি ভুল' বলে মানতে নারাজ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস 'অন্তত কতকটা আমাদের প্রতিরোধের চাপেই আমেরিকা আর তার অনুগতরা পরিপূর্ণভাবে তখন কুক্ষিগত করতে পারেনি এ দেশকে (পৃ: ২৪৮)।

আজকের কমিউনিস্টদের সীমিত ক্ষমতার ক্ষুদ্র হাত যে বহুজাতিক বিদেশি অক্টোপাশের শুড় ধরে ঝুলে পড়েছেন তা মুক্তির সংরাগ না অক্ষমের আত্মসমর্পণ হীরেনবাবু সে সম্বন্ধে কিছু জানাননি।

যাই হোক সামগ্রিক বিচারে রচনাটি মূল্যবান, কারণ এঁরা চলে গেলে স্মৃতিঘেরা টুকরো টুকরো কাহিনীগুলি আমরা আর পাব না। 'স্মৃতির পাহারা'টাই উঠে যাবে।

আবদুর রউফের আলোচ্য বিষয় উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশভাগের পর থেকে আজও উদ্বাস্তু প্রবাহ অব্যাহত। কোথাও 'উদ্বাস্তু', কোথাও 'অনুপ্রবেশকারী'র তকমা নিয়ে তারা অবাঞ্ছিত। এই সমস্যার খতিয়ান করতে গিয়ে আবদুর রউফ সংখ্যাগত দিকে আবদ্ধ থাকেননি। সমস্যাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন গুণগত দিক থেকে।

খণ্ডিত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে যাবার পর আজও যদি কোনও সমস্যা দেশভাগের মর্মন্তুদ স্মৃতি ও উত্তরাধিকার বহন করে চলে তা হল উদ্বাস্তুসমস্যা যা বাংলা ও পঞ্চনদীর দেশকে দিশাহারা করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবের সমস্যা মিটলেও বাংলার সমস্যা আজও বর্তমান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষানৈতিক ও মূল্যবোধের ভিত্তিকে এই সমস্যা বিপর্যস্ত করেছে। রউফ এই বিষয়গুলি গভীর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

পূর্ববঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা ইচ্ছে করলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারতেন এই রকম ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। হিন্দুরা চলে আসায় পণ্ডিত নেহরু খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রতি নেহরু তাই চিরদিনই ছিলেন সহানুভূতিহীন ও আমলাতান্ত্রিক। হিন্দু মুসলমানদের তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কের পরিস্থিতিতে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গেই থেকে যেতে পারতেন বলে আবদুর রউফেরও অভিমত। সুতরাং নেহরুকে তাঁর ধারণার জন্য 'খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না' বলেই তিনি মনে করেন।

কী হলে কী হত সে প্রশ্নের বিচার এখন নানাভাবেই করা যায়। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর ঠাণ্ডা মাথায় যে সব চিন্তা আসে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িকতার বীষজর্জর বাতাসে পঞ্চাশ বছর আগে সে দিনের হিন্দুদের পক্ষে তা ভাবা সম্ভব ছিল না, বিশেষ করে জাতীয় দলগুলির ক্ষমতালোভ ও বিশ্বাসঘাতকতার পর। সামাজিক সম্পর্কের বিশ্বাসেই তখন ভাঙন ঘটেছে। সেই ভাঙনই দেশ ভাগের মূলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু এবং রউফের বিচার যথার্থ কি না, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

স্বাধীনভারত যে কঠিন সমস্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এবং যে সমস্যাগুলি জটিলতর হয়েছে সম্পাদক শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছত্রিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনায় সে সমস্ত বিষয়ই ভিড় করেছে। গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শৈলেশবাবুর বিশ্লেষণ সমস্যাগুলি ও তার সমাধানের পথ অনুধাবনে ভিন্ন ভাবে সাহায্য করে।

সবশেষে একটি কথা মনে এল। স্বাধীন ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা ও সেই সংখ্যাকন্টকিত বাসস্থানের সমস্যা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন এই গ্রন্থে স্থান পেলে ভাল হত। □

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর: সম্পাদনা — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩ / ১০০.০০

অনবদ্য দুটি সংকলন: অনুবাদগুচ্ছ এবং স্মরণিকা

মেঘ মুখোপাধ্যায়

ভারতের অতি সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যগুলির মধ্যে তামিল ও কানাড়া অন্যতম। কারও ব্যক্তিগত ভাললাগা বা খেয়ালখুশির বশবর্তী হয়ে নয়, একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় 'কথা' সংস্থা তামিল ও কানাড়া ছোট গল্পের মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। গল্প সংকলনটির নাম দিয়েছেন — কাবেরী-গঙ্গা গল্পগুচ্ছ। 'কথা'-র উদ্দেশ্য ইংরেজি বা হিন্দির সাহায্য না নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা থেকে কর্মশালার মাধ্যমে সাহিত্যের সরাসরি অনুবাদ। এই উদ্দেশ্যপূরণে তাঁরা উভয় ভাষার সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, সমালোচক এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়েছেন। এক বছরকালব্যাপী প্রয়াসে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে আধুনিক কালের চারটি তামিল ও চারটি কন্নড় গল্পের বাংলায় অনুবাদ করিয়েছেন 'কথা'

গোষ্ঠী। গল্পগুলি পড়ে উঠে মুগ্ধতার বেশ নিয়ে মনে হল এ এক অনবদ্য ও সার্থক প্রয়াস। প্রত্যেকটি গল্পের নির্বাচন হয়েছে যথার্থ এবং অনুবাদ স্বচ্ছ-সাবলীল। মনে হয়েছে আটটি গল্পই আধুনিক ভারতীয় ছোটগল্পের এক একটি রত্ন। মপাঁসা, চেকভ, ও হেনরি, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ প্রমুখ নির্ধারিত বিশ্ব ছোটগল্প সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধারায় যোগ্য সংযোজন।

আলোচ্য অনুবাদ প্রকল্পটির (বাক প্রকল্প) বাংলার সঞ্চালক ছিলেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কানাড়ার সঞ্চালক নটরাজ ছলিয়ার এবং তামিল গল্প সঞ্চালক দিলীপ কুমার। কলকাতা, বাঙ্গালোর ও চেন্নাইতে প্রকল্পটির কর্মশালাগুলি পরিচালিত হয়েছিল। 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' শিরোনামে অনুবাদ প্রকল্পের পিছনের ভাবনাচিন্তা, প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। বেশ আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় এই বিবরণ। তাঁরা নাটকও অনুবাদ করেছেন যা স্বতন্ত্র সংকলনে প্রকাশিত হবে। পরিশিষ্টে লেখক ও অনুবাদক পরিচিতি গ্রন্থটির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও বইটির বিক্রয়মূল্য কিছুটা বেশিই রাখা হয়েছে। হয়ত প্রকল্পের ব্যয়ভার সংকুলানের জন্য, তবুও সাধারণ পাঠকের কেনার পক্ষে অধিক।

এরকম একটি চিত্তাকর্ষক অনুবাদ প্রকল্পের আইডিয়াটি যাঁর, 'কথা'র প্রধান চালিকাশক্তি গীতা ধর্মরাজনকে অশেষ ধন্যবাদ এবং অনুরোধ যে, তিনি যেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে বাংলায় ছোটগল্পের অনুবাদ অব্যাহত রাখেন এবং নতুন নতুন সংকলনগ্রন্থ আমাদের হাতে তুলে দেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী প. বঙ্গের সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি একটি বড় স্থান অধিকার করে আছেন। যদিও আজকাল কংগ্রেসি-অকংগ্রেসি রাজনীতিকদের মধ্যে কিংবা জনসাধারণে তাঁর নাম শোনা যায় না, কিছু জীবিত ঘনিষ্ঠ সুহৃদ-স্নেহভাজন ব্যক্তিই তাঁকে স্মরণে রেখেছেন, তা বলে তো তাঁর গুরুত্ব কমে যায় না। স্বাধীনতার পরের প. বাংলায় তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর মন্ত্রী এবং বিধানচন্দ্র রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর ৬২ সালের থেকে ৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে তিন বছর সংসদ সদস্য হয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার আহ্বান ত্যাগ করেন। বর্ধিষ্ণু পরিবারের এক মেধাবী সন্তান তাঁর প্রথম যৌবনে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বিলাতযাত্রার পূর্বমুহূর্তে অকস্মাৎ ঝলমলে সোনালি জীবনের হাতছানি হেলায় অস্বীকার করে গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন — স্বাধীনতার জন্য, জনসাধারণের দুর্দশা মোচনের জন্য।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল জীবন, তাঁর সমাজভাবনা, সমাজসেবা এবং মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রশাসনিক দক্ষতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে প্রফুল্লচন্দ্র সেন জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছেন। এমন একটি সংকলনগ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য কমিটি বঙ্গজনের কৃতজ্ঞতা পাবেন কি না জানি না; তবে প্রবীণ-নবীন সকলেই কৌতূহলী হয়ে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখলে একটি হারানো যুগ এবং বিরল হয়ে আশা অসাধারণ মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারবেন। বইটিতে প. বঙ্গের ইতিহাসের এক আলোড়িত অধ্যায়ের অনেক তথ্য এবং আখ্যান রয়েছে। বিখ্যাত আলোকচিত্রী মোনা চৌধুরীর তোলা অসংখ্য ছবি গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনকে পাঁচভাগে ভাগ করে তাঁর সান্নিধ্যনা, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মানুষেরা আলোচনা করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এঁরা হলেন — বিনয় চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কাশীকান্ত মৈত্র, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী, চন্দ্রশেখর, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুধরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুশীলকুমার ধাড়া, ভোলানাথ চক্রবর্তী, তরুণ দত্ত, মোনা চৌধুরী, সুনীল দাস, কৃত্তিবাস ওঝা, বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র, ফুলরেণু গুহ, শৈবাল মিত্র প্রমুখ। এই গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে ছিলেন তাঁর কাজের সহযোগী, রাজনৈতিক সহযোদ্ধা এবং তাঁর গঠনকর্মের ভাগীদার। প্রত্যেকের লেখা পড়ে একটা মূলসূত্র পাওয়া যায়, তা হল, এমন সরল, অনাড়ম্বর, সৎ, নীতিনিষ্ঠ, আত্মগরিমা ও স্বার্থশূন্য রাজনীতিক এবং ক্ষমতাবান নেতা বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্লভ। ১৯ বছর মন্ত্রীত্ব করেও একজন নেতা কী সহজ-অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে গেছেন, বিত্ত-সম্পত্তি সঞ্চয় করেননি ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়! প্রত্যাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন — In these dark days of scams and corruption at high places, Profulla Chandra Sen's life glows with the fire of hope and faith in man. কিন্তু সন্দেহ হয়। সত্যিই কি আজকের ক্ষমতালোভী, বিত্তবিলাসী ভারতীয় রাজনীতিকরা এমন একজন সাদামাটা, গান্ধীবাদী, সেকেলে রাজনীতিক তথা মুখ্যমন্ত্রীর জীবন থেকে কিছুমাত্র শেখার চেষ্টা করবেন? স্মরণিকা কমিটি সেরকম আশা করেই এই সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণে সাহস দেখিয়েছেন। তাঁদের প্রয়াস সার্থক হোক।

বাক : কাবেরী-গঙ্গা-গল্পগুচ্ছ সম্পা : এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় / সমতট প্রকাশন, ১৭২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯ / ৭৫.০০

প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্মরণিকা — প্রফুল্লচন্দ্র সেন জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি / ৩০.০০

বিশ্ব সাহিত্য

মার্কেজ এবং তাঁর একটি উপন্যাস

আনন্দ ঘোষ হাজরা

লাতিন আমেরিকার লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বের বরেণ্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর উপন্যাস, ছোট গল্প ইত্যাদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে খুব। বাংলা ভাষার উপন্যাসকার তাঁর উপন্যাসের নামে নিজের উপন্যাসের নামকরণ করছেন। উত্তর-আধুনিক সমালোচক তাঁর উপন্যাসের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনাও লিখছেন। এক কথায়, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মার্কেজ ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। এতদ্বারা বাংলা সাহিত্যজগৎ কতখানি সমৃদ্ধ হচ্ছে বলা কঠিন: তবে নিশ্চয়ই হচ্ছে, কারণ মার্কেজের গল্প উপন্যাসের বাংলা অনুবাদগুলিও সংবাদপত্রে দীর্ঘ পরিসরে আলোচিত হচ্ছে। যে কোনও ধরনের অনুবাদই — যদি অনুবাদ যথার্থ হয় — সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নিঃসন্দেহে। সাধারণ পাঠকের মনে কেমন প্রভাব ফেলছে মার্কেজ চর্চা, সেটাও জানা দরকার। অনুবাদকেরা বা প্রাবন্ধিকেরা নানা তত্ত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও বা পাঠকসাধারণকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে চাইলেও, আমাদের মতো সাধারণপাঠক উপন্যাসে বা ছোট গল্পে প্রাথমিকভাবে নির্ভেজাল গল্প শুনতে চায়, সে গল্প একেবারে বাস্তবসম্মত হতে হবে তার কোনও মানে নেই: গল্পের উপাদানে অবাস্তবতা, অতিবাস্তবতা বা পরাবাস্তবতা থাকলেও তা আনন্দগ্রাহ্য অবশ্যই, যদি সে সব উপাদানগুলি পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য না হয়ে ওঠে বা অপ্রাসঙ্গিক না হয়। ইংরাজিতে যাকে irrational বলে তার প্রতি প্রবণতা সাধারণ পাঠকের আছে নিশ্চয়ই তা না হলে কৃষ্ণ শিব হনুমান প্রমুখ হিন্দি টি.ভি. সিরিয়ালগুলি বাণিজ্যিক সফলতা পেত না। প্রশ্ন হল মার্কেজের গল্পে বা উপন্যাসে এরকম গল্পের উপাদান কতখানি আছে আর তা আমার মতো সাধারণপাঠকের কাছে কতখানি অনায়াসগ্রাহ্য?

এই কথাগুলি মনে হল মার্কেজের 'লাভ ইন্ দ্য টাইম অব্ কলেরা' বা 'কলেরার সময় প্রেম' নামক উপন্যাসটি পড়তে পড়তে। বস্তুত পক্ষে এই গদ্যবন্ধটি বর্তমান রচনাকারের উক্ত উপন্যাসটি পাঠ করার সময়ে উচ্চারিত চিন্তাস্রোত মাত্র। মার্কেজের নাম উচ্চারিত হলেই তাঁর 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস্ অব সলিচুড' বা 'নির্জনতার একশ বছর' নামক বিখ্যাত উপন্যাসটির কথা এসেই যায় সবার আগে। পোস্ট-মডার্নিস্টরা 'নির্জনতার একশ বছরের' সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানগুলির মধ্যে থেকেও ইতিহাসবোধের একটা তত্ত্ব খাড়া করে তোলেন। উইট্‌জেন স্টাইনের ধারায় পোস্ট-মডার্নিস্টদের অনেকেই ইতিহাসকেই স্বীকার করেন না। ইতিহাসকে 'ইমপসিবিলিটি' মনে করেন। শোনা যায় এখন নাকি আমেরিকার কোথাও কোথাও সাহিত্যের ইতিহাস বা অন্য কোনও ধরনের ইতিহাস পড়ানো তুলে দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। ইতিহাস যদি অসম্ভব হয়, অতীতও অসম্ভব এবং তাহলে ভবিষ্যৎও অসম্ভব, একমাত্র বাস্তব বর্তমান। ব্যাপারটা ক্ষমতাবানদের কাছে খুবই কাম্য। যা খুশি করার দর্শন। অতীতও যখন নেই, ভবিষ্যৎও যখন নেই, তখন ইতিহাসের কাছে, সমাজের কাছে জবাবদিহি করার দায়ও নেই। সুতরাং উত্তর পুরুষদের জন্যও কোনও দায় নেই। অবশ্য পোস্ট মডার্ন দার্শনিকেরা সবাই যে তা মনে করেন তা নয়। ইতিহাস একটা আছে। কিন্তু তা নিতান্তই বিবরণ আবার ইতিহাস লেখকের ব্যক্তিগত মনোভূমির আলোছায়ায় যা বর্ণভঙ্গিময় রঞ্জিত হয়ে ওঠে বেশি বা কম। কাজেই প্রকৃত উপন্যাসের বা গল্পের সঙ্গে ইতিহাসের বস্তুত কোনও পার্থক্য নেই। লিখিত ইতিহাসের পাতাও পুরনো হয়ে যায়, হারিয়ে যায়, ছিঁড়ে যায় অথবা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে একেবারেই। সুতরাং ইতিহাসবোধ ঐতিহ্যবোধ ইত্যাদি এক ধরনের মানসিক অবরোধমাত্র। অথবা

বলা যায় ইতিহাসই অবরোধ। সুতরাং একমাত্র বর্তমানই কি বিবেচ্য? আসলে কার্যকারণতত্ত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে এই রকম একটা অবিবেচনার বিবেচনায় এসে পৌঁছান। আধুনিক বিজ্ঞানদর্শনও কার্যকারণতত্ত্বকে অস্বীকার করছে। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের কথা অথবা বিগ্ ব্যাংগের পূর্ববর্তী ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থানের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কার্যকারণতত্ত্বকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক যদি না থাকে, ইতিহাস সম্পর্কিত বোধই যদি পাল্টে যায়, ইতিহাস যদি ইতিহাসকারের মনের রঙে রাঙানো বিবরণমাত্র হয়, অথবা যদি ইতিহাসের কোনও অস্তিত্বই না থাকে আর তাহলে সমূহ বিবরণ সমূহ ঘটনা অন্য এক ধরনের বাস্তবতা পেয়ে যায়, যাকে 'ম্যাজিকাল রিয়ালিটি' বা যাদুবাস্তবতা বলা যায় বোধ হয়। পোস্টমর্ডান উপন্যাসে এই সব লক্ষণগুলি বিদ্যমান বলে আলোচকেরা মনে করেন। অবশ্য উপন্যাসকারের রচনাকে দেশকালগত সীমায় ফেলেও বিচার করা সম্ভব। যেমন গুন্টার গ্রাস। তাঁর দেশ জার্মানি। জার্মানিতে আবার ইতিহাস ঘটনাবহুল এবং গ্রাস মনে করেন তিনি ইতিহাসে, ইতিহাসের ঘটনাবলিতে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে আছেন। মার্কেজের সঙ্গে গ্রাসের রচনার সঙ্গতি থাকলেও তা বিপরীত সঙ্গতি। গ্রাস থেকে মার্কেজে যাওয়া মানে ইতিহাসের প্রাচুর্যের পুনরাবর্তন থেকে ইতিহাসের দারিদ্রের আবর্তনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাস মানে খুন, জখম, নৃশংসতা এবং হয়ত বা যৌনাচারের যান্ত্রিক আবর্তনের ইতিহাস। ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাস মানে ইতিহাসের জন্য ক্ষুধা, অতীত বা স্মৃতি বা অতীতের বিবরণ না থাকার ইতিহাস। তার অর্থই হচ্ছে ভুলে যাওয়ার ইতিহাস। প্রায় না থাকা ইতিহাস, সময় অতিক্রান্ত হলে বিস্মৃতির গর্ভে চলে যায়। তাই ল্যাটিন আমেরিকার লেখকেরা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে কষ্ট অনুভব করেন। পোস্ট মডার্ন দর্শনের ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাঁদের এই কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মার্কেজের উপন্যাস এই কষ্টেরই আলেখ্যায়ন। সমাজের জনসাধারণের দুর্দশার ইতিহাস রচনা করার আগ্রহ এবং ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতার দ্বন্দ্ব মূলত 'নির্জনতার একশ বছর' উপন্যাসটিতে অন্তত দুবার আসে। একবার, মাকানডো শহরটি যখন প্লেগে আক্রান্ত হল। নিদ্রাহীনতা থেকে জন্মাল বিস্মৃতি। সমস্ত শহর তখন অতীত ভুলে যেতে আরম্ভ করল, ব্যক্তিপরিচয় এবং জিনিসপত্রও ভুলে যেতে শুরু করল। এখানে আবার ভাষাতত্ত্বের একটি বিষয়কে মার্কেজ চমৎকারভাবে নিয়ে এসেছেন। অরেলিয়ানো সে সময় একটি মতলব বের করলেন। ছোট ছোট কাগজে জিনিসপত্রের নাম লিখে সেগুলি দ্রব্যাদির গায়ে আটকে দিতে চাইলেন। কিন্তু এভাবে নাম লিখে আটকে দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ মানুষ যদি দ্রব্যটির ব্যবহারিক সম্পর্কটিই ভুলে যায়, নাম দিয়ে কি করবে? কাজেই অগস্টাইনের ভাষাতত্ত্ব থেকে পরবর্তী উইজেনস্টাইনের তত্ত্বে ফিরে যেতে হয়। কোনও দ্রব্যের বা বস্তুর উপর শুধু 'গাভী' লিখে দিলেই চলবে না, প্রতিদিন সকালে যে এটিকে দোহন করতে হয় সে বিষয়টিও লিখে রাখতে হবে। কিন্তু এই প্রথাটিও খুব সহজ প্রথা নয়। প্রচণ্ড মনোযোগ, পরিশ্রম ও বীক্ষণের প্রয়োজন। কাজেই ভাষা, সংস্কৃতি, বস্তু, সমস্তই বিস্মৃতির কাছে পরাভূত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পিলার টারনেরার শরণাপন্ন হতে হয় মানুষকে। পিলার টারনেরাই একমাত্র চরিত্র যিনি নাকি বইটির শেষ পর্যন্ত স্মৃতির উৎসস্বরূপ জীবিত থাকেন এবং তাসের যাদুবিদ্যাতে ভবিষ্যৎও যেমন বলে দেন, অতীতও তেমন বলে দেন। এভাবে কার্যকারণতত্ত্ববিহীন যাদুবিদ্যার বা বর্হেসীয় 'চান্স' বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেন লেখক। ম্যাজিকাল রিয়ালিটি বা যাদুবাস্তবতার দিকে চলে যান। আরও একবার ভয়াবহ বিস্মৃতি মাকোনডো শহরকে গ্রাস করে। ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যায়। অতীত লুপ্ত হয়ে যায়, অথচ এই বেদনাদায়ক ইতিহাসটির বর্তে থাকার কথা ছিল শহরটির স্বার্থেই। প্রায় তিন হাজার শ্রমিককে মাকোনডো শহরে সরকার ডেকে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করে এবং শবদেহগুলি ট্রেনে করে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। জোস আরকাদিও সেকান্ডো দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে ট্রেন থেকে মাকোনডোতে কিছুদিন পরে ফিরে এসে দেখতে পেলেন কেউই এই বীভৎস ঘটনাটি মনে রাখেনি। যেন ঘটনাটি ঘটেইনি। আবার বিস্মৃতি। আবার যাদুবাস্তবতা। ইতিহাসের পরাভব।

কিন্তু ইতিহাসের পরাবভবের বা যাদুবাস্তবতার আরও লক্ষণ বইটিতে আছে। সৈন্যেরা নৃশংস হত্যার পরে বুয়েন্দিয়া পরিবারে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাচ্ছে কিন্তু জোস আরকাদিও সেকান্ডো তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থে অদৃশ্য থেকে গেলেন। তাঁর ঘরে ঢুকেও সৈন্যেরা তাঁকে দেখতে পেল না। জোস আরকাদিও ইতিহাস এবং সময় থেকে নির্বাসিত অথবা ফেটে যাওয়া সময়ের এক টুকরো স্প্লিন্টারের মধ্যে আবদ্ধ মূল সময়স্রোতের বাইরে।

সুতরাং মার্কেজের 'নির্জনতার একশ বছর' অনিবার্যভাবে আমাদের বোর্হেস এবং কাফকার কথা মনে পড়ায়। মার্কেজ নিজেই বারবার বলেছেন সাহিত্য কী জিনিস তাঁকে শিখিয়েছেন কাফকা। কিন্তু এই আলোচনা স্বতন্ত্র। 'কলেরার সময়ে প্রেম' নামক উপন্যাসটি সম্পর্কে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

(খ)

আসলে আমি বলতে চাইছি যে 'নির্জনতার একশ বছর' উপন্যাসটি যেটি মার্কেজের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস, সেটিতে

তত্ত্বের ব্যাপারস্যাপারগুলি সচেতনভাবেই রেখেছেন তিনি। তবু তিনি যে গল্প বলতেও পারেন তার নমুনাও মাকানডো শহরের বুয়েন্দিয়া পরিবারের এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির উপাখ্যানগুলির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। অবশ্য যে-গল্প বলার ক্ষমতা কিছু কিছু উপন্যাসকে বিশ্বসাহিত্যে ক্লাসিক করে তুলেছে, সে রকম গল্প বলতে তিনি পারেন কি না সে তর্ক থেকেই যাবে। যতক্ষণ না আমরা ওই রকম ক্লাসিকধর্মী উপন্যাসের সমগোত্রীয় কিছু তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি। 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' উপন্যাসটির কথা এসে যায়, কারণ 'নির্জনতার একশ বছরে' যতগুলি চরিত্র আছে সম্ভবত তার থেকেও বেশি চরিত্র আছে 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসটিতে। অথচ শেষোক্ত উপন্যাসটি পড়তে অসুবিধা হয় না কোনও। বারবার পাতা উল্টে চরিত্রপরিচয় দেখতে হয় না, কারণ ঘটনাগুলির জটিল বুনোনের মুন্সিয়ানা চরিত্রগুলিকে এমনভাবে ধরে রেখেছে যে বিশাল মহাভারতের মতো বইটি পড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধা হয় না। [এখনকার সময়ে, যখন সব কিছুই দ্রুত ঘটে যাচ্ছে, পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তখন এত বড় উপন্যাস পড়ার জন্য সময় দেওয়াটা একটা কথা। কিন্তু সে কথা যে কোনও বড় উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।] অবশ্য 'যুদ্ধ ও শান্তি' গ্রন্থটিতেও লেখকের একটি ইতিহাসবোধ আছে। সঙ্গত কারণেই এই ইতিহাস ধারণা মার্কেজের ইতিহাসধারণার বিপরীত মেরুতে। ইতিহাসের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই মার্কেজ নিশ্চিন্ত নন, অথচ মার্কসবাদী মার্কেজ হয়ত বিশ্বাস করেন যে মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করবে বা মানুষই নিয়ন্ত্রিত করবে ইতিহাস — যদি আদৌ তিনি ইতিহাসবিশ্বাসী হন। এখানে আমার যেন মনে হয় মার্কেজ নিজেই দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে গেছেন। উইজেনস্টাইন বা হাইডেগারের মতো ইতিহাসবোধ থাকলে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পান কি করে? এটাও আবার একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন, যে আলোচনায় আমি যেতে চাই না।

টলস্টয় ভাবেন যে ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে এবং মানুষ সেই গতির কাছে নিছক এক আপতন। তাঁর উপন্যাসের পাঁচশ চরিত্র এই গতির আবর্তে ধরা পড়ে। তবু পাঠকের গল্প শুনতে অসুবিধা হয় না। ইতিহাসের সঙ্গে পারস্পরিক জীবন, সমাজের সঙ্গে নাটাশারোস্তব, প্রিন্স এনড্রু, পিয়ারেবেজুভেও তো বটেই অন্যান্য চরিত্রগুলিও জড়িয়ে যায় তীব্রভাবে, কিন্তু পাঠক বুঝতেই পারেন না। গল্পের আসঙ্গে, জটিল বুনোনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন তিনিও। অথবা ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্টের' কথাই ধরা যাক। এই উপন্যাসটিতে ইতিহাসের তত্ত্ব না থাকলেও মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাপার স্যাপার আছে। কিন্তু গল্পটি একেবারে থ্রিলারের মতো দ্রুতবেগে গড়িয়ে চল পরিণতির দিকে, বিশেষ করে সোনিয়ার অনুরোধে রাসকোলনিকফের স্বীকারোক্তি পর্যন্ত। এমনকী সোনিয়া ও রাসকোলনিকফের প্রেমের চমৎকার রোমান্টিক গল্পটিও পাঠক কোনও দিন ভুলতে পারেন না। বইটির শেষে মনে হয় বোধ হয় ওই গল্পটিই উপন্যাসটির প্রধান আখ্যান, আসলে শুধু ওই আখ্যানটি নিয়েই একটি চমৎকার প্রেমের উপন্যাস সৃষ্ট হতে পারত। কথাটা উঠল এই কারণে যে 'কলেরার সময়ে প্রেম'ও রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু মার্কেজ সুন্দরভাবে গল্পটি বলতে পেরেছেন কি না সেটাই প্রশ্ন। মার্কেজের এই বইটি তত্ত্বভারাক্রান্ত নয়। শুধু ত্রিভুজ-প্রেমের গল্প বলার ঝোঁকেই লিখেছেন তিনি। যদিও ড. জুভেনিল আরবিনোর মৃত্যুদৃশ্যে তোতাপাখির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন ও পাখিটিকে ধরতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু প্রতীকী ব্যাপার ও যাদুবাস্তবতারূপে প্রতিফলিত হয়ে গেছে। ইতিহাসবিহীন ক্যারিবিয়ান উপকূলের জিলাশহর লা মাঙ্গাতে ইতিহাসসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ডাক্তার আরবিনো, নানাবিধ সামাজিক সংস্কার সাধন করে এমনকী সংস্কৃতি সংস্থা গঠন করেও। কিন্তু তোতাপাখির মতো পুনরুক্তি করতে করতে ইতিহাস একসময় বিনষ্ট হয়ে যায়, ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বকেও রেহাই দেয় না ইতিহাস। ড. আরবিনো মারা যান। প্রতীকী ভাবে ইতিহাসই কি মারা গেল? তোতাকাহিনী ও ডাক্তারের মৃত্যুর এই রকম একটি যাদুবাস্তবতা থাকলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে কাহিনীটি মূলত প্রেমের কাহিনী। অবশ্য প্রতীকী ব্যাপার থাকলেও যাঁরা গল্প বলতে পারেন তাঁরা তা অবশ্যই পারেন। 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি' নামক ছোট্ট উপন্যাসটি সামগ্রিকভাবেই প্রতীকী। কিন্তু পাঠক একটা টানটান রুদ্ধ শ্বাস গল্প পেয়ে যান। লেখকের কাজই তো তাই — বাস্তবকে প্রতীকের ও কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে, তারপর আবার প্রতীক বাদ দিয়ে রঙ বাদ দিয়ে পাঠকের সামনে সেই বাস্তবকেই যেন নতুন করে দেখানো। এটা করতে গেলে লেখককে গল্পের বা ছবির আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। না হলে প্রতীকের বা কল্পনার রঙ দেবেন কিসের উপর? ফরাসি লেখক রোলাঁ বার্থের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে — '....by initial rite the writer must transform the 'real' into a painted object (a framed one): after which he can unhook the object, pull it out of his painting, in a word, depict it....'' লেখকেরা নানারকম কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন, তত্ত্বেরও আশ্রয় নিতে পারেন, লেখকের উদ্দেশ্যও থাকতে পারে নানারকম, কিন্তু গল্প বলার ব্যাপারটি পাঠকসাধারণে জন্য দরকার হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মার্কেজ যে গল্প বলতে পারেন না তা তো নয়। 'ক্রনিক্যাল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড' উপন্যাসটির রুদ্ধশ্বাস বেগ আমাদের আচ্ছন্ন করে এবং উপন্যাসের একেবারে শেষের বেদনাদায়ক ছবিটি পাঠক কখনও ভুলতে পারেন না। সানটিয়াগো নাসারকে মেরে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে,

আমরা উপন্যাসের শুরু থেকেই তা জানতে পারি এবং একেবারে উপন্যাসের শেষে যে ছবিটি পাই তা হল— "Santiago, my son," she shouted to him, "What has happened to you ?"

"They 've killed me, wene child" he said. He stumbled in the last step, but he got up atonce. "He even took care to brush off the dirt that was stuck to his gutts," my aunt wene told me. Then he went into his house through the back door that had been open since six and fell on his face in the kitchen.

সুতরাং 'নো-বডি-রাইট্‌স্‌ টু দা কর্নেল' নামক আরেকটি বেদনাগাঢ় উপন্যাসের মানবদরদী লেখক ইতিহাস সচেতন মার্কেজ যে চমৎকার গল্প বলতে পারেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'কলেরার সময় প্রেম' নামক রোমান্টিক আখ্যানটির ক্ষেত্রে তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। এখানেই বেশি সুযোগ ছিল তাঁর। অথচ এখানেই তিনি রোমান্টিক প্রেমের যোগ্য উপন্যাসকার হয়ে উঠতে পারলেন না।

(গ)

গল্পটি খুব সরল ও সাধারণ। ফ্লোরেনটিনো আরিজা খুব গরিব ঘরের অবৈধ সন্তান। মা বন্ধকীর কারবার করে সংসার চালান। বাবা বেঁচে থাকতে আর্থিক সাহায্য পেলেও মা ও ছেলে বাবার কাছ থেকে সামাজিক স্বীকৃতি পাননি, যদিও বাবা একটি জাহাজ কোম্পানির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বাবার মৃত্যুর পর কাকা অবশ্য তাঁকে অস্বীকার করেননি বরং চাকরি পেতে সাহায্য করেছিলেন। এই গরিব ছেলেটির হৃদয়ে ছিল কবিতা ও গানবাজনা। ফারমিনা ডাজাকে নিজের সম্পূর্ণ সত্তা উজাড় করে ভালবেসেছিলেন তিনি। সুন্দরী ফারমিনা ডাজার বাবা অন্যদেশ থেকে এসে লা-মাঙ্গা শহরটিতে ব্যবসাসূত্রে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। অবশ্য তিনি বে-আইনি ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। টাকাও কামিয়েছিলেন ভালই। ইচ্ছে ছিল সমাজে জাতে ওঠার। ফারমিনা পিসির সঙ্গে স্কুলে যেতেন। ফ্লোরেনটিনো বসে থাকতেন তাঁর যাওয়া আসার পথের ধারে। ধীরে ধীরে তাঁদের আলাপ হয়, গভীর প্রেম হয়। এমনই গভীর ভালবাসা যে ফারমিনার বাবা জানতে পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে মেয়েকে অনেক শাস্তি দেন। পিসিকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। তবু ফ্লোরেনটিনো আরিজা ও ফারমিনা ডাজার চিঠি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে এবং ফারমিনাও অবিচল থাকে। ইতিমধ্যে যুবক ড. জুভেনিল আরবিনো উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। ড. আরবিনোর পরিবার শহরটিতে নামকরা পরিবার এবং আরবিনোও ডাক্তার হিসাবে বেশ ভাল। যুবক ডাক্তার বিদেশ থেকে সমাজ সংস্কৃতি উন্নয়নের যে সব ব্যবস্থা দেখে এসেছেন সেগুলি শহরটিতে চালু করার চেষ্টা করেন। বেশ কিছু কাজও হয়। সুতরাং শহরটি যেন ড. আরবিনোর মধ্যে নিজের পিতাকে আবিষ্কার করে। এসব হয় ক্রমশ। কিন্তু তার আগেই ফারমিনার বাবার সৌভাগ্যক্রমে এবং ফ্লোরেনটিনো আরিজার দুর্ভাগ্যক্রমে ড. আরবিনো ফারমিনাকে ভালোবেসে ফেলেন। কিন্তু বাবার অত্যাচার সত্ত্বেও উভয় তরফকে ভয় দেখানো সত্ত্বেও ফারমিনা এবং ফ্লোরেনটিনোর প্রেম অক্ষত থাকে। সুতরাং ফারমিনাকে বহুদূরে আত্মীয়স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া বাবার আর গত্যন্তর থাকে না। ফ্লোরেনটিনো, যিনি কিনা ইতিমধ্যে পোস্ট-অফিসে টেলিগ্রাফ বিভাগে চাকরি পেয়েছেন, ফারমিনার সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ রেখে চলেন। বরং তাঁদের প্রেম আরও গাঢ়তর হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাবার যখন মনে হল দুজনের প্রেমের এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন মেয়েকে আবার লা-মাঙ্গাতে ফিরিয়ে আনা হল। ফ্লোরেনটিনো যখন আনন্দে উদ্বেল, যখন আবার ফারমিনার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হতে যাচ্ছে দীর্ঘ-বিরহের পর, যখন তাঁর মা প্রায় সর্বস্ব বাজিধরে ছেলের বিয়ের জন্য বাড়ি ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন, যখন আবার ফারমিনার জন্য গানের অর্ঘ্য রচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছেন ফ্লোরেনটিনো, তখন ফারমিনার সঙ্গে বাজারে তাঁর সত্যিই দেখা হল অকস্মাৎ এবং তার চেয়েও অকস্মাৎ, ফারমিনা, যিনি কি না ফ্লোরেনটিনোর 'ক্রাউন্ড্ গডেস' ফ্লোরেনটিনো আরিজাকে প্রত্যাখ্যান এবং বর্জন করে বসলেন। ফ্লোরেনটিনোর অবস্থা এখন অবর্ণনীয়। প্রায় মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এলেন যেন। ড. আরবিনো তাঁর শূন্যস্থান দখল করে নিলেন। কাব্যপ্রাণ, শিল্পী, প্রেমিক ছেলেটিকে ছেড়ে ফারমিনা ড. আরবিনোকেই বিয়ে করে বসলেন। বাপ জাতে উঠলেন কিন্তু বে-আইনি ব্যবসা করার অপরাধে গুরু শাস্তি থেকে ডাক্তারের খাতিরে অব্যাহতি পেয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করতে হল।

ফ্লোরেনটিনোর অনন্ত অপেক্ষা শুরু হল। ড. আরবিনোর সচ্ছল সংসারে, সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, ফারমিনা প্রায় ভুলেই গেলেন ফ্লেরেনটিনোর কথা। ড. আরবিনোর ভালোবাসাতেও খাদ নেই। সংসারও সুখী সংসার। কিন্তু ফ্লেরেনটিনো অপেক্ষা করতেই থাকল; কখনও না কখনও আবার তাদের দেখা হবে। হয়তবা ডাক্তারের মৃত্যু হলে তাঁদের আবার মিলন হবে এই আশায় বুক বেঁধে পড়ে থাকলেন আরিজা। হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলে ডাক্তারের মৃত্যুও হল। জীবিত দুজনই তখন বৃদ্ধ। তবু, ফ্লোরেনটিনো ডাক্তারের মৃত্যুর দিনেই ফারমিনার কাছে এলেন। প্রথমদিকে একটা তিক্ত, কটু, বিস্বাদ অবস্থার

মধ্য দিয়ে গেলেও ফারমিনা ফ্লোরেনটিনোকে গ্রহণ করলেন। ততদিনে ক্যারিবিয়ান সাগরে অনেক ঢেউ উঠেছে, ভেঙেছে। অনেক জল বয়ে গেছে। ফ্লোরেনটিনো কাকার জাহাজের ব্যবসাতে ঢুকেছে এবং লিওনা ক্যাসিনি নামক একজন মহিলার বুদ্ধিমত্তায় ও ভালবাসায় পরবর্তীকালে কোম্পানির সর্বেসর্বা হয়েছেন। একদিন মৃত ড. আরবিনোর পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ সবাইকে অবাক করে দিয়ে দুজনে একটি জলযানে চেপে বসলেন। সঙ্গে থাকলেন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন যিনি আবার মাঝপথ থেকে তাঁর প্রেমিকাকে তুলে নিলেন। তাঁদের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে নিশ্চিত করার জন্য কলেরার পতাকা ওড়ানো হল জাহাজে। ফলে হল কি জাহাজটি চিহ্নিত হয়ে গেল এবং বন্দরে ভিড়তে পারল না সংক্রামক রোগের জন্যই হয়ত বা। ক্যাপ্টেন যখন ফ্লোরেনটিনো আরিজাকে জিজ্ঞেস করছে এখন সে কি করবে, তখন আরিজা উত্তর দিচ্ছেন :

"Let us keep going, going, going back to La Dorada."

উপন্যাসের শেষাংশটি এবার উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"Do you mean what you say?" he (captain) asked.

"From the moment I was born" said Florentino Ariza "I have never said anything I did not mean"...

"And how long do you think we can keep this goddamn coming and going" he asked. Felorentino Ariza had kept his answer ready for fifty three years seven months and eleven days and nights.

"Forever", he said.

এইভাবে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনন্ত যাত্রায় ভেসে পড়লেন দুজনে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতো শেষ হল উপন্যাসটি।

(ঘ)

মুশকিলটা এইখানে যে উপরোক্ত মিষ্টি গল্পটির রসাস্বাদনে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাঝখানের ওই পঞ্চাশ বছর। অন্তত সাধারণ বাঙালি পাঠক কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না ফ্লোরেনটিনো আরিজার জীবনযাপন। ওই পঞ্চাশ বছর ফ্লোরেনটিনো যেমন আগ্রহের সঙ্গে ফারমিনাকে খুঁজেছেন, তেমনই আগ্রহের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন খুঁজেছেন অন্য নারীর দেহ। খুঁজেছেন এবং ভোগ করেছেন। এরকম ভোগের বর্ণনায় লেখকের কলমও অনেক সময় বল্গাহীন। হতে পারে, আরিজার মানসিক অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি অন্য নারীর দেহ সম্ভোগেই শান্তি পাচ্ছিলেন, দেহের চাহিদাও মিটছিল তাঁর। হয়ত ল্যাটিন আমেরিকার সমাজে এরকম যৌনাচার অত্যন্ত বাস্তব। কিন্তু আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। শুধু কঠিন নয়, ফ্লোরেনটিনোর প্রতিটি শারীরিক প্রেমের উপাখ্যান উপন্যাসটির মাধুর্য একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখকের বর্ণনা অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। বিরহ পর্যায় শুরু হবার প্রায় প্রথম দিকে দেহপোজীবিনীদের সঙ্গে বাস করেও দেহজ কামনার প্রতি শুধু অন্যমনস্কই ছিলেন না ফ্লোরেনটিনো, বরং কামনার আহ্বানকে প্রতিহত করতে পারতেন। এতে আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ছিল তাঁর প্রতি। দু'একবার যদি পতন হত তাঁর তাও বাস্তবসম্মত হত। কিন্তু তাঁর পতন এমনই হল যে একেবারে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, ড. আরবিনোর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নারীদেহের বাছবিচার ছিল না তাঁর কাছে। 'এপিসোড'গুলির দু'একটির বর্ণনাও পাঠকের মনে বিবমিষার সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য যাঁরা শ্লীল-অশ্লীলের সীমারেখা মানেন না সাহিত্যক্ষেত্রে, তাঁদের কাছে এরকম 'এপিসোড' ভালই লাগতে পারে। রোসালবা, বিধবা নাজারেত, আওসেনিক সানতান্দের, সারা নোরিয়েগা ইত্যাদি প্রত্যেকটি রমণীর সঙ্গেই তাঁর উদ্দাম শারীরিক সম্পর্ক; অধিকাংশক্ষেত্রে বর্ণনাতেও লেখক উদ্দাম। ফ্লোরেনটিনোর এরকম অবৈধ দেহসংসর্গের জন্যই এক রমণীকে তার স্বামীর হাতেই প্রাণ দিতে হল। তাও তাঁর বাধাবন্ধহীন অশালীন জীবনযাপন বন্ধ হল না বৃদ্ধ বয়সেও। 'এপিসোডগুলি' মাঝে মাঝে এতই ন্যক্কারজনক হয়ে ওঠে যে সমগ্র উপন্যাসটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে। যদিও বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় শ্লীলতার সীমারেখা অতিক্রম না করে তবু আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ সানতান্দেরের 'এপিসোড' থেকে অল্প কিছু অংশ উদ্ধার করছি।

"As soon as he has done that, she attacked him without giving him time for anything else, there on the same sofa where she has just undressed him, and only on rare occasions in the bed. She mounted him and took control of all of him for all of her, absorbed in herself, her eyes closed guaging the situation in her absolute inner darkness, advancing here, retreating there, correcting her invisible route, trying another, more intense path, another means of proceeding without drowning in the slimy marsh, that flowed from her womb, drowning like horsefly as she asked herself questions and answered in her native Jargon; where was that something in the shadows that only she knew about and that she longed for just for herself, until she succumbed without waiting for anybody, she fell alone into her abyss with a' jubilant explosion of total victory that made the world tremble. Florentino

Ariza was left exhausted, incomplete, floating in a puddle of their perspiration ..."

উপরোক্ত বিবরণটিতে যদিও ভাষার আবরণ আছে, সারা নোরিয়েগার 'এপিসোডে' ভাষা একেবারে নগ্ন। ভিকুনার 'এপিসোড'টিও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। 'আমেরিকা ভিকুনা'র গার্জেন হিসাবে রাখা হয়েছিল ফ্লোরেনটিনোকে। ভিকুনার বাবা / মা-ই রেখেছিলেন, কারণ ফ্লোরেনটিনো তাঁদের আত্মীয়। ভিকুনা স্কুলে পড়তে এসেছিল। কিন্তু ভিকুনার বয়ঃসন্ধিকালের সুযোগ নিয়ে বয়সের অসম্ভব তারতম্য থাকা সত্ত্বেও ফ্লোরেনটিনো তার দেহকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন বৃদ্ধবয়সেও তাকে কিছুতেই শিল্পের দোহাই দিয়েও মেনে নেওয়া যায় না। এটাই আবার ভিকুনার আত্মহত্যার কারণ। চরিত্রগত দিক থেকে বিচার করলে ফারমিনা বা আরবিনোর এমন পতন দেখাননি লেখক। তবু, আরবিনো, মুলাট্টা মেয়ে থিওলজির ডক্টরেট মিস বারবারা লিন্‌চের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী ও সংযমী মিস বারবারার প্রশ্রয় থাকলেও তার জন্যই কিছুটা বা কিছুটা ফারমিনার জন্যও ড. আরবিনো খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে দাম্পত্য সম্পর্কের বর্ণনার ক্ষেত্রেও — ড. আরবিনো এবং ফারমিনার প্রথম দৈহিক মিলনের বর্ণনার ক্ষেত্রেও — লেখক শ্লীলতার সীমা চূড়ান্তভাবে অতিক্রম করেছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে, এইরকম একটা মিষ্টি গল্প বলতে গিয়ে, লেখক যে বারেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে দৈহিক মিলন বর্ণনা করেন অনেক সময় অনুপুঙ্খে, তার কি আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল? শিল্পগতভাবে প্রয়োজনীয়তা না থাকলে তাকেই তো অশ্লীল বলব আমরা? অশ্লীলকে তখনই আর অশ্লীল বলে মনে হয় না, বরং তাকে গ্রহণ করা যায়, যদি উপন্যাসের জন্যই তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মার্কেজের মতো সাহিত্যিক কোন প্রয়োজনে এরকম দৈহিক রমণের কথা বারবার এনেছেন উপন্যাসটিতে? অথচ এই উপন্যাসেই লিওনা ক্যাসিনির মতো অসাধারণ বুদ্ধিমতি ব্যক্তিত্বসম্পন্না কালো মহিলার চমৎকার চরিত্রবর্ণনায় লেখক নিজের শিল্পীসত্তাকে পূর্ণ প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। এই দুই রমণীর সঙ্গেও ফ্লোরেনটিনোর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত। পারেনি ক্যাসিনির ব্যক্তিত্বের জন্য এবং ফ্লোরেনটিনোর প্রতি তার সত্যিকার ভালোবাসার জন্য। এই উপেক্ষিতার জন্যই বলা যায় জাহাজ কোম্পানির উন্নতি ও ফ্লোরেনটিনোরও চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি। এই উপন্যাসেই পাগলাগারদ থেকে খুন করে পালিয়ে আসা উজ্জ্বল মেয়েটির ছবি আছে, যে কার্নিভালে আনন্দ করার জন্যই পালিয়ে এসেছিল। আরিজার সঙ্গে কার্নিভালে মত্তও হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত নির্দোষভাবে। কখনও মনে হয়নি আরিজার, যে মেয়েটি পাগল, যদিও মেয়েটি অকপটভাবেই পাগল বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। ধরাও পড়েছিল আবার, ফ্লোরেনটিনো হয়ত তাকে ভালবাসতেও পারত কারণ হাতে চকোলেট নিয়ে মেয়েটিকে সে অনেক খুঁজেছিল। পায়নি আর। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রটি পাঠকের মনে দাগ রাখতে বাধ্য। ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের ইতিহাসের জন্য স্পৃহা (ইতিহাস না থাকা সত্ত্বেও) এবং ইতিহাসের অসম্ভবতার যে পোস্ট-মডার্ন ধারণা — এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অনেক সময় ল্যাটিন আমেরিকার লেখককে একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তৈরি করার প্রেরণা দেয় এবং এই ব্যক্তিত্ব ল্যাটিন আমেরিকার সমাজের 'মিথিক' (Mythic) গুণগুলিকে প্রকট করার চেষ্টা করে, যাতে মনে হয় এই সব দেশে ইতিহাসের কোনও মানে নেই। এখানকার মানুষেরা জানে সময়ের বাইরে কি করে বেঁচে থাকতে হয়। 'দি লস্ট স্টেপ্‌স্' নামক উপন্যাসে কারপেনটিয়ারের নাম-না-জানা প্রোটাগনিস্টের যাত্রা সেইদিকেই। কারপেনটিয়ারের নায়ক হয়ত কৃতকার্য হননি, কিন্তু মার্কেজের ড. জুভেনিল আরবিনো খানিকটা যেন সেই ধরনেরই ব্যক্তিত্ব। এই সব ব্যাপার থাকার জন্য উপরোক্ত কতকগুলি চরিত্রের চমৎকার চিত্রণের জন্য উপন্যাসটি হয়ত উতরে গেছে। তা না হলে সম্ভবত এটি পর্নোগ্রাফির সীমা অতিক্রম করত না। হতে পারে, স্প্যানিশ ভাষার ব্যবহারে আরও আবরণ সৃষ্টি করা যায়। আমি ঠিক জানি না। এও হতে পারে, ল্যাটিন-আমেরিকার সমাজে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সমাজে, যৌনাচার এইরকমই প্রকট আর তার জন্যই উপন্যাসেও তার প্রয়োজনীয়তা। হয়ত বিবরণ, উপন্যাস ও ইতিহাসে কোনও পার্থক্য নেই এই বোধ থেকেই যৌন বিবরণগুলির প্রয়োজনীয়তা। তবু আমাদের বাংলা সাহিত্যে আদৌ উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে কি? মার্কেজ বিখ্যাত লেখক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মতো পাঠকের কাছে অন্তত তাঁর লেখা 'কলেরার সময়ে প্রেম' উপন্যাসটি অনায়াসগ্রাহ্য নয়, আনন্দগ্রাহ্য তো নয়ই। □

উল্লেখপঞ্জি

1. One hundred years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez.
2. Chronicle of a Death foretold by Gabriel Garcia Marquez.
3. No one writes to the Colonel by Gabriel Garcia Marquez
4. War and Peace by Leo Tolstoy
5. Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky
6. Words in Reflection by Allen Thiher
7. Fragments of an Amorous Discourse by Roland Barthes

সঙ্গীত

রাগ : রূপ-অরূপ

মীনাক্ষী ঘোষ

রূপ আর অরূপ, সোজা কথায় যাকে চর্মচক্ষে দেখা যায় আর যাকে দেখা যায় না কিন্তু ভাবা যায় (বা, চক্ষু ইন্দ্রিয় ছাড়া অন্য কোনও ভাবে অনুভব করা যায়) — এই দুই-এর মিশেলে তৈরি হয় ছবির জগৎ। কোনও ছবিতে রূপ আর অরূপের মিশেল কোন অনুপাতে হবে বা কোন পদ্ধতিতে হবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ছবি প্রথমে চোখকেই নাড়া দেয় অথচ তার প্রথম শর্তও রূপ না অরূপ? কোনও ছবি কতটা পরিমাণে হবে দৃশ্যবস্তুর অনুকৃতি বা ফোটোগ্রাফিক আর কতটাই বা ইমপ্রেসনিস্ট বা ভাব দ্যোতক — এসব ভাবনা বদলে যায় যুগে যুগে। বিমূর্ত রাগরাগিনীদের মূর্তি আঁকার পালা মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেছে ১৮ শ শতকে। তখনও চিত্রকলার জগতে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরেরা আনেননি আধুনিক বিপ্লব। কিন্তু রাগ-রাগিনী এখনও আমরা ব্যাপকভাবে গাইছি, শুনছি এবং তার সঙ্গে সেই পুরনো ছবিগুলিকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে হতাশ হচ্ছি। তথাকথিত সেইসব বহুযুগখ্যাত রাগচিত্র-এর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও মনে হচ্ছে বিমূর্ত রাগরাগিনীগুলিকে সফলভাবে ধরতে পারেননি চিত্রকরেরা। সফলতা বলতে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, কোনও রাগ শুনলে বা গাইলে যে ধরনের মনোভাব জাগে সেই রাগের ছবি দেখেও একই ধরনের মনোভাব অন্তত কিছু পরিমাণে জাগা চাই। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

যখন আমরা 'টোরী' রাগিনীর ছবি দেখি তখন স্বাভাবিক ভাবেই ছবি এবং সুরের মুড-এ একটু অন্তত সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করি। যেটা না পেলে ছবিটি যতই সুন্দর হোক তাকে 'টোরী' রাগিনীর ছবি বলে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। টোরী (তোড়ী) একটি সকালের রাগিনী। সকাল হলে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে একটা বায়োলজিকাল পরিবর্তন আসে। সকাল মানে কেবলমাত্র সূর্য ওঠা নয়; রঙ-রস-গন্ধ-স্পর্শর বিশেষ বিশেষ মাত্রা নিয়ে সকালের একটি গোটা চরিত্র আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে যে কোনও রাগই তার সময়গত চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। 'টোরী' শুনলে বা গাইলে একটি স্নিগ্ধ সকালের কোমলতা, পবিত্রতা, প্রশান্তি সহজেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে মন-প্রাণ জুড়ে। নরম আলোয় চোখ মেলে চাওয়ার সুখ, সারারাত বিশ্রামের পরে এক ধরনের তাজা-ভাব (ফ্রেশনেস্), সকালের মিঠি, শীতল বাতাসের স্পর্শ, গাছপালা-ঘাসের সকালবেলাকার সুখদায়ক চেহারা ও সুগন্ধ — এই সব কিছুর সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ একটি মুড বা ভাবের স্পন্দন রয়েছে 'টোরী' রাগিনীতে। 'টোরী' রাগিনীর দুখানা ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছে। দুটিরই কেন্দ্রে রয়েছে বীণা হাতে সুন্দরী নারী এবং হরিণ। ভঙ্গিমা অবশ্য পৃথক পৃথক।

হরিণেরা সুর ভালবাসে (Zoological fact) এমন কথা শোনা যায়, সুরে সম্মোহিত করে ব্যাধেরা হরিণ শিকার করত। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের প্রথম ভাগের ভূমিকায় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, "আবহমান কাল হইতে আমাদের ধানের ক্ষেতগুলি আগুলিয়া আসিতেছে চাষীর মেয়ে। বন হইতে আক্রমণ করিয়া আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য হরিণ ধান্য ক্ষেত্রের শষ্য হরণ করিতে। তখন এই শষ্য রক্ষিনী বীণা বাজাইয়া গান শুনাইয়া হরিণ দলকে আকৃষ্ট করে এবং হরিণের চৌর্য বৃত্তি দমিত ও শান্ত করে ...এই বীণাবাদিনী চাষীর মেয়ে হইল 'তোড়ী' রাগিনীর চাক্ষুষ প্রতিম।" (পৃ: ২২)

সূক্ষ্ম রেখার নিপুণ বিন্যাসে আঁকা হরিণ পরিবেষ্টিতা বীণা বাদিনী নারী সহজেই দৃষ্টিকে নন্দিত করে। কিন্তু সে ছবির নাম 'তোড়ী' লিখে দেবার পরেও উক্ত রাগিনীর আবহাওয়ায় পৌঁছনো কঠিন। দীর্ঘকাল ওই রাগটি চর্চা করবার পরে এবং বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে শোনা হয়ে যাবার পরেও ছবিটি দেখে ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, 'এ-ছবির নাম 'তোড়ী কেন'? অন্য কিছু নাম হলে বেশি মানাত।' বলাই বাহুল্য আমার কথায় সঙ্গের পণ্ডিত ব্যক্তিটি মোটেই খুশি হতে পারেননি। এতকালের স্বীকৃত রাগরূপ সম্পর্কে এমন মন্তব্য। আমাকে বোঝাবার জন্য পণ্ডিত বন্ধুবর যে ব্যাখ্যা দিলেন, যা আগেই লিখেছি, তা শিল্পগত নয়, ইতিহাসভিত্তিক। ওই ইতিহাস জানবার পরেও কখনও 'টোরী' গাইবার সময় ওই রাগরূপ (নারী ও হরিণ) মনে জাগে না আবার ছবিটা দেখলেও 'টোরী' বেজে ওঠে না মনের মধ্যে। দুটো বিষয়ের মুড-এ সাদৃশ্য পাওয়াই কঠিন। মনে হয় সঙ্গীতের অনুভব থেকে এই ধরনের রাগ-রূপ সংক্রান্ত ছবিগুলি স্বতঃ উৎসারিত নয়। ইতিহাস-জ্ঞানের ভিত্তিতে এদের নির্মাণ করা হয়েছে। 'সৃষ্টি আর নির্মাণ' গ্রন্থে শঙ্খ ঘোষের একটা উক্তি মনে পড়ছে—"সৃষ্টির একটা ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে, তবু এইটেই স্বাভাবিক যে সে ইতিহাস থাকবে রূপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, নিজেকে সে উত্থাপিত করে দেখাবে না বারে বারে।"

ঐতিহাসিক রাগ-রূপ-চিত্রর প্রতি অশ্রদ্ধা না রেখেও মনে হয়েছে আধুনিক তুলিতে আর একবার রাগ রাগিনীর ছবিগুলো আঁকা হোক। রেখার কঠিন শাসনে আবদ্ধ আলপনার মতন ছবিগুলি সুন্দর হলেও সফল নয়। গত একশ বছরে চিত্র কলার ক্ষেত্রে এসেছে আশ্চর্য কত পরিবর্তন। তার আগেকার পাঁচশ বছরের চিত্রকলাতেও এমন সব বিপ্লব দেখা যায় না। রেখা ও রঙের গতানুগতিক সীমাবন্ধনে এখন এসেছে কত অভিনব ভাঙচুর, যার ফলে অরূপ অনুভবগুলোকে বেশি পরিমাণে ধরা যাচ্ছে রূপের মধ্যে। আধুনিক চিত্রকলা এখন আর ফোটোগ্রাফিক নেই; নেই মানুষ পশু বা গাছপালার স্থির অনুকৃতি রচনার যুগ। তবে এ কথার থেকে যেন মনে না করা হয় যে আগেকার শিল্পীরা মনহীন শরীর এঁকেছেন। অরূপ সেখানেও ছিল কিন্তু তার প্রকাশপথে ছিল কড়া রূপগত সীমারেখা। অরূপ রাগ-এর রূপ রচনায় যে সব বাধা কাজ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল এই অত্যধিক সীমাবন্ধন। আর সেই সঙ্গে রয়েছে ইমপ্রেশন সংক্রান্ত দূরত্ব। ভারতীয় রাগরাগিনীর চিত্ররূপ বিশেষভাবে চর্চা করা হয়েছে রাজস্থানে। এ কাজে রাজপুত শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলির অবদান সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও পাহাড়ী এবং মোগল আর্টে রাগ-চিত্র আঁকা হয়েছে বেশ কিছু। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাগ-রাগিনীদের চিত্রসম্ভার একটা নতুন পরিবেশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। রাজপুত তুলি এবং মোগল তুলি মিলে মিশে এ সময়ে উন্নততর নতুনতর সৃষ্টির সাধনা শুরু হয়। শিল্প সমালোচক বেসিল গ্রে 'The Intermingling of Mogul and Rajput Art' নিবন্ধে লিখছেন "He (Akbar) was the real creater of the school of Mogul painting of Mogul Empire'—শুধু চিত্রকলাই নয় আকবরের সময় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতও খুবই উন্নতি করেছিল। প্রবাদ রয়েছে তানসেন মল্লার গাইলে যথার্থই বৃষ্টি হত। অথচ সে সময়ও বিমূর্ত রাগানুভবকে চিত্রতে প্রকাশের জন্য এমন কোনও নতুন টেকনিক আবিষ্কৃত হয়নি যাতে ছবি এবং গান কাছাকাছি আসতে পারে অর্থাৎ একই ধরনের ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারে। রাগ-রাগিনীকে চিত্রে রূপ দেবার চেষ্টা মোগল আমলেই শেষ নয়। খ্রিস্টীয় ১৮'শ শতকে বাঙলায় মুর্শীদাবাদ চিত্রকলাও রাগমালার প্রতিকৃতি এঁকেছে। রবার্ট স্কেলটন-এর 'মুর্শীদাবাদ পেন্টিং' নিবন্ধ থেকে এ বিষয়ে আমরা জানতে পারি। এ ছাড়া মিসেস ডি. আর্সিহাট-এর সংগৃহীত মুর্শীদাবাদ চিত্রাবলীর মধ্যে হিন্দোল (১৭৫৫ খ্রি) কুকুভ (১৮৫৫ খ্রি) এর ছবি রয়েছে। এই সব ছবিই রেখার দৃঢ় বন্ধনে পরাধীন এবং তার বিষয়বস্তুর মধ্যে রাগের মুডকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যতদিনে এই সব ছবি আঁকা শেষ হয়েছে তত দিনের মধ্যে বিমূর্তচিত্র অঙ্কনরীতি (এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট) আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একান্তভাবে বিমূর্ত ভাবের আধার। কারণ সেখানে বাণীও গৌণ। তারানা যখন গাওয়া হয় তখন তো বাণী থাকেই না, থাকে কেবল কতক গুলি শব্দ। এ ছাড়াও খেয়ালে 'আলাপ' এবং 'তান' অংশে বাণীর ভূমিকা নেই। 'বাট'-এর সময় বাণীকে যথেচ্ছ ভাগ বাটোয়ারা করা হয়। যন্ত্রে যখন রাগ বাজে তখন তা সম্পূর্ণই বাণীহীন ভাবরাজ্য।

এই সব বিমূর্ত রাগরাগিনীদের মূর্তি আঁকা হয়েছে রাগ সৃষ্টির বহু পরে। মহাভারত, হরিবংশের যুগে রূপচিত্র তো দূরস্থান, রাগরূপ কল্পনা করে শ্লোক রচনার প্রবণতাও তখন দেখা দেয়নি। ভরতের সময় সঙ্গীতকলার বিকাশ হয়েছে যথেষ্ট এবং তারপর কোহল, দত্তিল, যষ্টিক প্রভৃতির যুগও পার হয়েছে কিন্তু রাগরূপ সৃষ্টি হয়নি। কেউ কেউ অবশ্য কোহলাচার্যকে রাগরূপ কল্পনার পথিকৃৎ বলেছেন, তবে তার যথাযথ ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া না। রাগরূপের বর্ণনামূলক শ্লোক পাওয়া গেল শার্ঙ্গদেবের সময়ে। কিন্তু সে বর্ণনায় রয়েছে বিমূর্ত ভাবেরই কথা। যেমন—

> হেমন্তে প্রথমে যামে বীভৎসে সভয়ানকে।
> সার্বভৌমাৎসবে গেয়ো ভৈরবস্তদ্ সমুদ্ভব:।
> ধাংশোমান্তে রি-পতক্ত: প্রার্থনায়াং সমস্বর:।'

অর্থাৎ ভিন্ন ষড়জ গ্রাম রাগে রস বিকাশ হলে বীভৎস ও ভয়ানক, উৎসবে ও প্রার্থনায় শান্ত রস....ইত্যাদি। উদাহরণ বাড়ালাম না। এই ধরনের কয়েকটি শ্লোক 'রাগ ও রূপ' (প্রজ্ঞানানন্দ)-এ অর্থ সহ উদ্ধৃত হয়েছে এবং উক্ত শ্লোকটি সেখান থেকেই নেওয়া। এই শ্লোকগুলিতে রাগ-রস-ভাব-এর নির্দিষ্ট নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই ভাবপ্রধান রাগ রূপ থেকে পরবর্তী কালে রূপ-প্রধান রাগচিত্রগুলি আঁকা হয়েছে।

আমরা জানি রূপ শিল্প কখনও অরূপ বিচ্ছিন্ন নয়। ভারতবর্ষ চিরকালই মূর্তির মধ্য দিয়ে মূর্তি অতিক্রান্ত একটা অরূপ অনুভবের রাজ্যে পৌঁছাবার সাধনা করে গেছে। 'রবীন্দ্র চিত্রকলা রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা' গ্রন্থে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন—"বিমূর্ত ভাবপ্রধান হওয়ার জন্যই ভারত শিল্পে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনার অবকাশ স্বল্প।.... এ দেশের শিল্পীরা নিছক চোখে দেখা রূপের ওপর ষোলো আনা ভরসা করেনি কখনও।... রূপের অতীত যা তাকে কাজে লাগিয়েছেন।" (পৃ: ২৩১)

"রূপের অতীত" যে-চরিত্রটি এ দেশের প্রাচীন শিল্পকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে সেটি আন্তর্জাতিক নয়, অন্তর্দেশীয়। কারণ প্রাচীন ভারতের বিমূর্ত ধ্যানধারণা খুব বেশি রকম যুক্ত রয়েছে ভারতীয় ধর্মের সঙ্গে। মন্দিরের গায়ে যত জীবন-চিত্র আছে সবকটির পিছনে রয়েছে ধর্মীয় ব্যাখ্যা। এই ধর্মের আবার অনেকটাই দেব-দেবীরা জুড়ে আছেন। সুতরাং শিল্পদৃষ্টিও অনেক জায়গাতেই দেব-ভাবনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই দেব-ভাবনা থেকে রাগচিত্রও মুক্ত নয়। উদাহরণ হিসাবে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির শিব পূজার ও ভৈরব রাগগুলির চিত্র উল্লেখ করা যায়। এখানে একটা কথা ভেবে দেখবার আছে। অরূপ বা অতীন্দ্রিয় ভাবনা বলতে যখন আমরা ভগবান বা দেবদেবী বা অলৌকিক কোনও চরিত্রকে ভাবছি তখন সেই অলৌকিককে আমরা দেখিনি বা শুনিনি। অর্থাৎ দেবতাকে বা ভগবানকে আমরা দেখিনি এবং কোনও একটা রূপ এঁকে তার মধ্যে দেবত্বকে আরোপ করছি। কিন্তু রাগ-এর ছবি যখন আঁকা হচ্ছে তখন আমাদের মধ্যে রাগ-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তখন দেখা থেকে অদেখা-তে যাওয়া নয়, তখন মূর্তি থেকে বিমূর্তিতে পৌঁছনো নয় বরং বিমূর্তকেই মূর্তির মধ্যে ঠেলে আনা। অরূপ রাগের রূপ রচনা। রাগ বটে, কিন্তু অপরিচিত নয়। শ্রুতির ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা এসেছে তাকে দৃষ্টিগোচর করে তোলা নিঃসন্দেহে সহজ নয়। একটি অনুভব আসছে চোখের মধ্য দিয়ে অপরটি কানের মধ্য দিয়ে। উভয়ে মস্তিষ্কের একই জায়গায় একই রকমের কম্পন তুলতে পারে না। অথচ আমরা দুইশিল্প পথ (সঙ্গীত ও চিত্র) দিয়ে একটি বিশিষ্ট অনুভবের মধ্যেই পৌঁছতে চাইছি। সুতরাং রাগরাগিনীর চিত্রের মধ্যে দেবতা, মানুষ, পশু যা কিছুই আসুক না কেন, তারা কেউই প্রধান নয়, প্রধান হল রাগটির অনুভব। অতএব কোনও রাগের বিষয়বস্তু নির্ণয় খুবই দুরূহ। এবং এ কারণে ধানশ্রী, বিলাবল, কামোদ প্রভৃতি শুনলে যে-ভাব জাগে তাদের ছবি দেখলে সে-ভাব জাগা কঠিন। অথচ প্রগাঢ় পণ্ডিত স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখছেন—"খ্রীষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতক থেকে ১৮ শ শতকের মধ্যে রাজপুত, জম্বু, কাঙড়া, মুঘল প্রভৃতি চিত্রের অবদান রাগরাগিনীর চাক্ষুষ মূর্তিকে সার্থক করে তুলেছে। সাধক ও শিল্পীদের ধ্যানঘন প্রেরণা ও কল্পনাই রাগমালা চিত্রকে করেছে বিচিত্র রস, ভাব, রঙে রঞ্জিত এবং চিত্রের লাবণ্য, কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের করেছে প্রাণদান।"

খ্যাতিমান পণ্ডিতব্যক্তিদের বিরোধিতা করবার যোগ্যতা বা রুচি নেই। তাঁদের প্রতি সম্মান রেখেও একথা বলা যায় লাবণ্য, কমনীয়তা প্রভৃতি রাগচিত্রের একটি দিকমাত্র। এই লাবণ্য এবং কমনীয়তা কোনও কোনও ছবিতে এতই প্রবল যে বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে তা অর্থহীন মনে হয়। ছবিগুলি দেখে এবং তাদের ইতিহাস পড়ে মনে হয় চিত্রকরেরা এবং চিত্রসমাদরকারী পণ্ডিতব্যক্তিরা উভয়ই ছবি ও সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ যোগকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না যতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন রাগরূপ বর্ণনাকারী শ্লোকগুলির উপর। এই শ্লোক প্রত্যক্ষ যোগকে ক্ষীণ করেছে এবং ছবি ও সুরের মধ্যে দূরত্ব রচনা করেছে। সকলেই জানেন শিল্পের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলার মধ্যে সঙ্গীতে যত সহজে বিমূর্ততাকে স্পর্শ করা যায়, সাহিত্যে তার চেয়ে একটু কম এবং চিত্রকলায় আরও কঠিন হয়ে যায় সে কাজ। এখন সঙ্গীত এবং চিত্রকলার মাঝখানে যদি সাহিত্যের সেতু তৈরি করা হয় তাহলে সঙ্গীত এবং চিত্রকলার টেম্পারামেন্টে অনেকটা যে তফাৎ হয়ে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ নেওয় যাক।

হিন্দোল রাগ-এর ধ্যান-রূপ-এ বলা হয়েছে—

> "নিতম্বিনী মন্দতরংগিতাসু
> দোলাষু খেলাসুখমাদধান:
> খর্ব কপোতদ্যুতি—কামযুক্ত:
> হিন্দোল রাগ কথিতো মনীন্দ্রে:।"

অর্থাৎ নিতম্বিনী সুন্দরী নারীরা ঈষদভাবে দোলা আন্দোলন করছেন, হিন্দোল সেই দোলায় বসে ক্রীড়া সুখ উপভোগ করছেন। দেহ খর্ব ও পারাবতের ন্যায় লাবণ্য বিশিষ্ট।

১৭ শ শতকের শেষভাগে রাজপুত তুলিতে আঁকা হিন্দোল রাগের ছবিটি উক্ত শ্লোকের অনুগামী। শ্লোক অনুযায়ী অতি কোমল চেহারার এক পুরুষ (হিন্দোল) দোলনায় বসে আছে যাকে গোঁফআঁকা ছদ্মবেশী মহিলাও মনে করা যেতে পারে। এই গোঁফটুকুই হিন্দোল-এর জাত রেখেছে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে শাস্ত্রমতে হিন্দোল রাগিনী নয়, রাগ। তাকে ঘিরে আছে

জনাআষ্টেক সুন্দরী রাজপুত রমণী। হিন্দোল এবং তার সখীদের একই ছাঁদে আঁকা টানা টানা চোখ ও চোখের দৃষ্টি। এ ছাড়া ছবিতে রয়েছে রাজপুত আর্ট সুলভ নানারকম কারুকাজ।

হিন্দোল বসন্তকালীন রাগ। এর সুরে এক ধরনের মাদকতা আছে, পাসান আছে। দোল খাওয়ার দৃশ্যতে বসন্তের আনন্দ সম্ভোগ খানিকটা বোঝানো হয়েছে বটে কিন্তু তবুও রাগ থেকে ছবি রয়ে গেছে বহু দূরে। স্পষ্টই মনে হয় চিত্রকর নিজের শ্রুতিকে একবিন্দু প্রাধান্য দেননি, শ্লোকটি পড়ে ছবি এঁকে দিয়েছেন। 'গৌর সারঙ্গ'-এর ছবিটি দেখেও মনে হয়েছে কোনও গায়ক ওই রাগ গাইবার সময় ওই ছবিকে স্মরণে রাখতে পারবেন না। কারণ তারও বিষয়বস্তু সুন্দরী মহিলা এবং কারুকার্য খচিত গৃহাংশ। এইসব ছবি দেখে 'বাঃ' বলতে পারা যায় কিন্তু বলতে পারি না রাগেরা প্রাণ পেয়েছে। অবশ্য কচিৎ ব্যতিক্রমও আছে। যেমন মেঘমল্লার রাগের ছবিতে (রাজস্থানী খ্রি: ১৮ শ শতক) ধরা পড়েছে মেঘের ঔদাস্য। মাথার ওপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের চাঁদোয়া, গাছের ছাতার নীচে একটিমাত্র মানুষ, হাতে বীণা। অন্যান্য ছবির মতন যে চিত্রে নেই প্রাসাদের বিলাস, সুন্দরী সুবেশা রমণীদের ললিত বিন্যাসও নেই। বিস্তীর্ণ মেঘের সমুদ্রে একাকী অনুভবী মানুষ। ছবিটি নির্জন, উদাস, গভীর এবং গম্ভীর। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' মনে পড়ে — মেঘ দেখলে সুখী লোকের মনেও 'অন্যথা বৃত্তি' জাগে। যদিও পুরনো রীতি অনুসারে মূর্তি এবং দৃশ্য খুব বেশি ফোটোগ্রাফিক, যদিও নেই রেখা প্রয়োগের আধুনিক স্বাধীনতা এবং বিস্তৃতি তবুও বলা যায় ছবিটি সার্থক। টেকনিক যাই-ই হোক আসল কথা মেঘ দেখলে এবং মেঘমল্লার শুনলে যে মন কেমন করা ভাবটি জাগে ছবির মধ্যেও ধরা হয়েছে সেই ভাবটি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাচ্ছি না সেই যাদু, যে যাদুতে পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি কেন্দ্রিক পরিবর্তনগুলোকে সুরে বাঁধা হয়েছে। ইমনের মধ্যে যে ময় সন্ধ্যা আছে, ললিত গাইলে যেমন আশ্চর্যভাবে রাত ফুরিয়ে আসে তাদের ছবি দেখলে তেমনটা হওয়া চাইত? আমরা যখন ভান গগের আঁকা রৌদ্রস্নাত ফুলের ছবি দেখি তখন কত অনায়াসে একাত্ম হতে পারি একটি রোদ ঝলমলে ফুলের সঙ্গে। সে ছবি রঙে-রসে-আনন্দে এত বেশি সম্পূর্ণ যে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। ফুলের প্রাণকে মানুষের প্রাণে পৌঁছে দেবার জন্য কত সাবধানে স্বাধীন করে দিয়েছেন ভ্যানগগ পাঁপড়ির অন্তরেখাগুলিকে (বর্ডার লাইন) উজ্জ্বল আলোর স্রোতে কেমন ভাসিয়ে দিতে পেরেছেন দর্শকের চোখ, আলোর বিমূর্ত অনুভূতিকে মূর্তি দিয়েছেন কী দারুণ নৈপুণ্যে। বিদেশের কথা থাক, স্বদেশেও অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গিয়েছেন বিমূর্ত অনুভবকে কী ভাবে রেখায় ধরা যায়। উদাহরণ হিসাবে শেষ বয়সের আঁকা অন্তত দশটি আস্ত ছবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কালো রঙের টানে আঁকা চুল দাড়িতে, যেসানে যীশুখ্রিস্টের আদল রয়েছে, সেখানে এক ধরনের অসহায়তা, অভিমান এবং করুণা ফুটে উঠেছে। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় ছবিগুলোর কোনওটায় বিক্ষোভের চাপা আগুন, কোনওটায় যন্ত্রণা। সে সময়ে এসব ছবির টেকনিক ছিল যেমন অভিনব তেমনই ছিল নতুন নতুন বিমূর্ত বিষয়বস্তু। ছবির মধ্যে তিনি অসীম সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন — "The world of sound is a tiny bubble in the silence of infinity. The Universe has its only language of gesture, it talks in the voice of picture..." (My pictures, Chitralipi—) বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি আড়াই হাজার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু রাগ-রূপ প্রসঙ্গ তাঁর তুলিতে আসেনি। অথচ রাগশাস্ত্রের অনুভব তাঁর মধ্যে কতখানি প্রগাঢ় ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে অজস্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে। সঙ্গীত এবং চিত্র উভয় ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার, অনুভব এবং বিশিষ্ট টেকনিক। মাড়োয়া-র বিষণ্ণ, বৈরাগ্যময় সূর্যাস্ত, দরবারী কানাড়া-র বেদনা-গম্ভীর, নির্জন রাত প্রভৃতিকে তিনি হয়ত সফলতরভাবে এনে দিতে পারতেন চিত্রের মধ্যে। তাঁর পরবর্তী আধুনিক চিত্রকরেরা অনেক রকম ভাবপ্রধান বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন, সৃষ্টি করেছেন বিস্ময়ে ভরা ইমপ্রেসনিস্ট চিত্র জগৎ কিন্তু রাগমালা রয়ে গেছে মধ্যযুগের ফ্রেমে।

কিছু দিন আগে দূরদর্শনে দেখেছিলাম এ যুগের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্রাট ভীমসেন যোশী গাইছেন রাগসঙ্গীত, একালের সবচেয়ে দামী শিল্পী এম এফ হুসেন সাহেব ক্রমাগত সেই সুরকে রূপ দিয়ে চলেছেন ক্যানভাসে। বহু শত বছরের গুণীজন চিত্রিত এবং স্বীকৃত রাগরূপ-এর ছবির সঙ্গে হুসেন সাহেবের ছবির মিল নেই এতটুকু।

অনেক রকম যুগলবন্দি শুনেছি, কিন্তু কণ্ঠ ও তুলির যুগলবন্দির অভিজ্ঞতা এই প্রথম। দেখতে দেখতে একবার মনে হল আগামী কালে ছবি ব্যাপারটা কি ক্যাসেট হয়ে যাবে? সেখানে পরিবর্তন বা গতি থাকবে কি? ছবি মানে তখন আর একটি মাত্র স্থির অবস্থা নয়। যেমন ভাবে আমরা সিনেমা বা নাটকে একটি গল্পকে দেখি অনেকটা সেই রকম ভাবে একটি ছবিও হয়ত খানিকটা সময় ধরে বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকশিত হবে। চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অবশ্য এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের লক্ষ্য রাগ-রাগিনীর চিত্র-রূপ। হুসেন সাহেবের রাগ-রূপ আঁকবার এই আধুনিকতম পদ্ধতি লোকে গ্রহণ করবে কি না এখনই তা বলা যাচ্ছে না। কারণ দূরদর্শনের যুগলবন্দি দেখে আমরা অনেকেই মন্তব্য করেছিলাম "এ আবার কেমন ধারা রাগ রূপ: একবার নাম হয়ে গেলে

মানুষ যা খুশি তাই করতে পারেন এবং বাহবাও পেয়ে যান।" এখন প্রশ্ন এই যুগলবন্দি কি শুধুই মাত্র গুণীজনের খেলা? মনে হয় না। বিমূর্ত রাগ রাগিনীর মুডকে তুলিতে ধরবার একটা নতুন পথের ইঙ্গিত অন্তত হুসেন সাহেব দিয়েছেন। কিন্তু হুসেন সাহেব কেবলমাত্র বিমূর্ত মুডকে ধরবার চেষ্টা করেননি সেই সঙ্গে তাঁর ছবিতে রয়েছে আরও দুটি অভিনব বিষয়। (১) গান গাওয়ার সময়ের পরিমাণ বা Time dimension (২) গান চলার গতি বা লয়। এর ফলে সে ছবি রাগরূপ না হয়ে গান-রূপ হয়ে উঠেছে। গাওয়ার পদ্ধতি যুগে যুগে বদলায়। আবার একই গানে ক্রমশ ধীর থেকে দ্রুততর হতে থাকে লয়। কিন্তু রাগরূপ তো প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি একই আছে। যেমন, মল্লার চিরকালই বর্ষাঘন রাগ। ধ্রুপদ, খেয়াল, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি যে ছাঁচেই গাওয়া হোক, ধীরে বা দ্রুত লয়ে, কম সময় নিয়ে কিম্বা অনেকটা সময় নিয়ে যে ভাবেই পরিবেশন করা যাক, একটি বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পেলে তবেই কোনও গানকে বলা হয় এটি মল্লার। এই মল্লার যখন ছবিতে প্রকাশ পাবে তখনও থাকা চাই তার বিশিষ্টতার প্রকাশ। যে ধ্রুব অনুভবগুলি মানুষের দেহে মনে রয়ে গেছে অন্তরকাল ধরে সেগুলিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি রাগ। একটি মাত্র গানে তো তার কাজ ফুরিয়ে যায় না। সুতরাং গানের ছবি এবং রাগের ছবি খুবই পৃথক হতে পারে।

হুসেন সাহেবের দক্ষ হাতের ছবি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে — আহা তিনি যদি নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতেন তবে আমাদের রাগ-রূপ-তৃষ্ণা হয়ত মিটত। রাগরাগিনীর বিমূর্ত মুডগুলিকে চিত্রশিল্পে তুলে ধরার মতো দুরূহ কাজ করতে গেলে চিত্রশিল্পীকে তো সঙ্গীতজ্ঞও হতে হবে। অপর পক্ষে যুগলবন্দির অপর শিল্পী ভীমসেন যোশীজিও তো চিত্রকর নন।

অতএব এখন অবধি শুধুই আশা — ভবিষ্যতে কোনও সঙ্গীতজ্ঞ চিত্রশিল্পীর হাতে যথার্থভাবে ফুটে উঠবে অরূপ-রাগের রূপ চিত্র। □

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালির এক বহুশতাব্দীর সাধনায় পাওয়া উত্তরাধিকার। জাতির পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষ চিহ্নিত করে। তাই তার যথার্থ সংরক্ষণ বাঙালির জাতীয় সমস্যা। রবীন্দ্রসঙ্গীত সংরক্ষণ ব্যাপারে শিক্ষক, গায়ক ও শ্রোতার দায়িত্ব অশেষ। তাই এর সু-স্থিতির ব্যাপারে স্বরলিপি, গায়কি এবং গায়কের স্বাধীনতা ও দায়িত্ব কর্তব্যাদি সম্পর্কে সকলের অবধান প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে এ বিষয়ে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

স্বরলিপির উদ্ভাবন সঙ্গীতের ইতিহাসে এক যুগান্তরবাহী ঘটনা। লিপির বা অক্ষরের প্রচলন যেমন প্রাচীনকালের চিন্তাভাবনাকে, সেকালের কাব্য দর্শন প্রভৃতিকে বর্তমানের কাছে সুলভ করে দিয়েছে, মানুষের নশ্বর বক্তব্যকে একটা স্থায়ী রূপ দিয়ে প্রায় কালোত্তীর্ণ করে পৌঁছে দিতে পেরেছে বহু প্রজন্ম পরের মানবসমাজের কাছে,— স্বরলিপি তেমনই অতীতের গানের কথা ও সুরকে আমাদের কাছে প্রায় অবিকৃতভাবে উপস্থিত করে দিতে চেষ্টা করছে।

তবে লিপির প্রবর্তন ভাষার ক্ষেত্রে যত প্রাচীন, গানের ক্ষেত্রে তেমন নয়। কারণ গানের ক্ষেত্রে গায়কের যে গায়কি বা style, তাকে কোনও লিপির সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না। আর সঙ্গীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতিগুলিও যেহেতু অধরা-প্রায়, তাই তাকেও স্বরলিপিতে ধরে রাখা যায় না। তাই সুস্রষ্টারা তাঁদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আপন সৃষ্টিকে, অর্থাৎ প্রায় বিমূর্ত এই সঙ্গীতকে, তাঁদের শিষ্যশিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ও স্মৃতিতে ভরে দিতে চেষ্টা করতেন। এবং শিষ্যশিক্ষার্থীরাও সেই অধীত বিদ্যাকে তাঁদের স্ব স্ব ব্যক্তিত্বপ্রসাধিত গায়কি সমেত তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের শিষ্যশিক্ষার্থীর কণ্ঠে ও স্মৃতিতে স্থাপিত করে দিতেন। এভাবে, এই গুরুমুখী পদ্ধতিতেই গান চলে এসেছে আজ পর্যন্ত।

ভারতীয় সব সাধনার ক্ষেত্রেই একটা সূক্ষ্ম গুহ্যতা-রক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় সাধকেরা চেষ্টিত থেকেছেন। সাধারণ্যে বহুল-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের সভয় সাবধানতা ছিল। অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে সাধ্যবস্তুর অবমাননা ও সাধনপন্থার বিভ্রান্তি-বিকারের ভয়ে তাঁরা কঠোর রক্ষণশীলতার আশ্রয় নিতেন। নাদকে যাঁরা ব্রহ্ম বলেছেন তাঁদের এ সাবধানতার রক্ষাকবচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

ইতিহাস-দর্শন প্রভৃতিতে নির্বস্তুক আবেগের তুলনায় মননের ভূমিকা অধিকতর। তাই সে ক্ষেত্রে লিপি বাহিত ভাষা বক্তব্যপ্রকাশে যতটা সহায়ক হয়েছে, গানের ক্ষেত্রে ওই আবেগের প্রাধান্য হেতু লিপি বা সংকেতচিহ্ন সে সহায়তা দিতে পারেনি। কবিতাতেও আবেগ এবং সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আছে। তবে তা বাক্যনির্ভর। একটি স্থির শব্দগঠিত বাক্য, অস্খলিত থাকলে, কবির আবেগ ব্যঞ্জনাকে কালোত্তীর্ণ ও দেশোত্তীর্ণ করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। দেশ কালান্তরের পাঠক সেই স্থির বাক্যে শব্দ (word) সমাবেশের মধ্যস্থিত ব্যঞ্জনাকে আস্বাদ করতে পারে। কিন্তু সুরের শ্রুতিগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। তাই গান একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার। ব্যবহারে এবং অভ্যাসে শব্দ (word) এর কিছু নির্দিষ্ট অর্থ মানুষের মনে তৈরি থাকেই। সে ক্ষেত্রে মনে রস সঞ্চারে কোনও বাধা হয় না। কিন্তু গানের স্বরের বা ধ্বনির (sound) এ ধরনের কোনও নির্দিষ্ট ব্যবহারিক অর্থ থাকে না বলে স্বরের লিপি বা সংকেতের প্রচলন হয়ত ক্ষতিকর মনে হয়েছিল।* তাই গান জিনিসটি অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনার মতোই প্রায় গুহাবাসীই রয়ে গেল উনবিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত।

গান ছিল স্মৃতি-নির্ভর। কিন্তু স্মৃতির সীমাবদ্ধতা আছে। কালভেদে বিস্মৃতির কবলে পড়ে গানের রূপ বদলে যেতে পারে এবং যাচ্ছেও। আমরা তানসেনের গান নামে যা পাই তার মধ্যে প্রকৃত তানসেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যথার্থ স্বরলিপির সহায়তা ও বিভ্রান্তির হাত থেকে তানসেনের গানকে পূর্ণত না হলেও (কাঠামো বা অবয়বের দিক থেকেও) অনেকটা বাঁচাতে পারত। একালে তানসেনের বন্দেশে যে কথা ও সুরের বহু রূপান্তর দেখা যায়, তা স্বরলিপির সাহায্যে এড়ানো যেত। নিয়ত-পরিবর্তনশীল গায়কিকে না হলেও বাক্য ও সুর-বদ্ধ বন্দেশকে অক্ষত পাওয়া যেত।

আমাদের দেশে স্বরলিপির প্রচলনের বয়স অনূর্ধ্ব দেড়শ বছর। তার পূর্বে যদি স্বরলিপির উদ্ভাবন হয়েও থাকে তবু তা ব্যবহৃত হয়নি। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রারম্ভিক উদ্যোগের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডের হাতে তার সাবালকত্ব ঘটেছে। ভারতে প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতিগুলির তুলনায় বাংলার আকারমাত্রিক পদ্ধতিই মনে হয় অধিক নির্ভরযোগ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংরক্ষণে এই আকারমাত্রিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

স্বরলিপি কীভাবে আমাদের সাহায্য করে? স্বরলিপি প্রথমত, গানের কাব্যাংশটিকে হুবহু উপস্থিত করে; দ্বিতীয়ত, গানের সুরটিকে স, র, গ, ম, প্রভৃতি স্বরে, কোমল-শুদ্ধ-কড়ি-ভেদে বিভিন্ন সংকেত-চিহ্ন দিয়ে বর্ণনা করে; এবং তৃতীয়ত, গানের সুরগুলিকে এবং কথার অক্ষরগুলিকে গীতরূপের বিন্যাস অনুযায়ী মাত্রাবদ্ধ ও তালবদ্ধ করে। মোটমাট একটি গানের কথা, সুর ও তালকে সাংকেতিক চিহ্নে ধরে রাখে। ফলে পরবর্তীকালে আমরা গানটিকে মোটামুটি অক্ষত পেয়ে যেতে পারি। এভাবে শুধু কালোত্তীর্ণ নয়, দেশোত্তীর্ণ করেও স্বরলিপি আমাদের উপকার করে। বহুদূরের মানুষের ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও স্বরলিপির সাহায্যে গান স্রষ্টার হাত থেকে গায়কের হাতে পৌঁছে যেতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বরলিপির উপযোগিতা সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে না। সে আমাদের বহুবিধ বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা একটি দেশের ঠিকানা জানিয়ে দেয়; কিন্তু তাহলেই কি তাকে যথার্থ চেনা যায়? গানের ক্ষেত্রেও স্বরলিপি একটি নির্দিষ্ট গানের যে কাঠামো উপস্থিত করে—তা-ই কি গানটির পূর্ণ যথাযথরূপ? ভাতখণ্ডের গ্রন্থে শত শত রাগ শত শত বন্দেশ নিয়ে নিষ্প্রাণ পড়ে আছে। কিন্তু সে গান বা রাগ-বন্দেশকে প্রাণময় রসগর্ভ করে তুলতে গেলে আরও কিছু দরকার—যা মুদ্রিত স্বরলিপিতে অনুপস্থিত। আর ওই অনুপস্থিত বস্তুটি রচয়িতার (বা গায়কের) কণ্ঠে থেকে থাকলেও স্বরলিপিকরণকালে বাদ পড়ে গেছে। এই অবশ্যম্ভাবী বাদ-পড়ে-যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে কে? অন্তত বর্তমান স্বরলিপি পদ্ধতি তা পারবে না। Record বা Tape-এর সাহায্যে গানকে যথাযথভাবে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তানসেন তো record করে যাননি। রবীন্দ্রনাথের অপটু কণ্ঠের দু'একটি record থাকলেও অন্যান্য প্রায় দু'হাজার গানের ব্যাপারে আমাদের ওই অক্ষম স্বরলিপির দ্বারেই হাত পাততে হয়।

স্বরলিপির আরও নানারকম সীমাবদ্ধতা আছে।

* আবেগসঞ্জাত সংগীতের নির্ভর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতি ও কণ্ঠের কাকু প্রভৃতির উপর। তার কোনও সাংকেতিক চিহ্ন বা লিপি প্রস্তুত করা এবং তা পাঠ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই গুরুরা সুরকে যথাসম্ভব অটল এবং অচ্যুত রাখবার জন্যে গুরু শিষ্যের সান্নিধ্য এবং প্রত্যক্ষ শিক্ষণকেই প্রচলনে রাখবার চেষ্টা করে আসছেন। এ কারণে গানকে গুরুমুখী হয়েই থাকতে হয়েছে। এবং এ কারণেই ভাষার লিপির তুলনায় গীতের লিপি অর্বাচীন।

কাব্যাংশকে হুবহু উপস্থিত করা গেলেও উচ্চারণকে তো হুবহু দেখানো যায় না। অ-কার এবং ও-কার মধ্যবর্তী উচ্চারণ বোঝাতে স্বরলিপিতে কোনও সংকেতচিহ্ন নেই। অথচ বাংলায় অ-এর উচ্চারণে বিভিন্নতা আছে। 'বনে এমন ফুল ফুটেছে'—বাক্যাংশটির শব্দগুলি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে পারে ব্যক্তি ও অঞ্চল-ভেদে। আমরা যাকে রাবীন্দ্রিক উচ্চারণ বলি তাও আজকাল অত্যন্ত Vegue হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১২৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।' (শব্দতত্ত্ব)। কিন্তু তৎকালীন কলকাতারও বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণে সাম্য ছিল না। আর এখনকার কলকাতার উচ্চারণ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের সংস্পর্শে, English Medium School এবং T.V.-র প্রভাবে বিপর্যস্ত। আমরা 'বনে / বোনে', 'একাকী / এ্যাকাকী' প্রভৃতির ধাঁধায় পড়ি। 'ট' এর উচ্চারণে "T", 'ফ'-এর উচ্চারণে 'F" প্রভাব ফেলছে। এ সবের সংকেত স্বরলিপিতে থাকে না।

সুরকেও আমরা হুবহু লিপিবদ্ধ করতে পারি না। ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরগুলি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে শ্রুতির সূক্ষ্ম সূত্র থাকে। স্বরলিপি অনেকটা হারমনিয়ামের রীডের মতো। দুটি স্বরের মধ্যবর্তী শ্রুতি স্বরলিপির সংকেতে প্রকাশ পায় না। শুধু বিকৃত স্বরের শীর্ষে ১ বা ২ লিখলেই অনুকোমল বা অতিকোমল জ্ঞাপন করে না। ভৈরবের কোমল ধৈবতকে কেবল ভৈরব রাগ অভ্যাসেই পাওয়া যায়—স্বরলিপিতে নয়। কোমলতার মাত্রা গায়কের গলাতেই থাকে। এ কারণেই বোধহয় ভারতীয় প্রাচীন স্রষ্টারা সঙ্গীততত্ত্বের বিচারে কৃতিত্ব দেখালেও স্বরলিপির প্রবর্তনে বিমুখ ছিলেন; যদিও দেখা গেছে যে গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও গান কোনওদিনই অক্ষয় ও অক্ষত থাকেনি।

ঢালা গান ('ও চাঁদ চোখের জলের', 'বড়ো বিস্ময় লাগে', প্রভৃতি) বা টপ্পাঙ্গ ('এ পরবাসে রবে কে', 'কে বসিলে আজি', প্রভৃতি) গানগুলির যথার্থ স্বরলিপি প্রায় অসম্ভব। স্বরবিতানের স্বর এবং মাত্রাবিন্যাস এক্ষেত্রে কাঠামোমাত্র।

স্বরলিপির অক্ষমতার পরে প্রশ্ন আসে স্বরলিপিকারদের অক্ষমতা ও তৎসঞ্জাত বিভ্রান্তি সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন বিস্মৃতিপরায়ণ। স্বরলিপিকারদের স্মৃতিশক্তিও অসীম হতে পারে না। সে কারণেই 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি', 'শুধু তোমার বাণী নয় গো' প্রভৃতি গানের ক্ষেত্রে অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভৃতি স্বরলিপিকারদের মতদ্বৈধ সম্পর্কে সকলেই জ্ঞাত আছেন। মতান্তরে অনেক মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গীতরূপ পাওয়া যাচ্ছে। সব বিকল্প সুরগুলি এখনও স্বরবিতানে মুদ্রিত ও স্বীকৃত হয়নি। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' গানটি তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। মূল হিন্দি গানটির অনুসারী রেকর্ডের সুরটি চলিত হয়ে গেছে। এ সুরটিকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করায় আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে এ সব ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা থাকা দরকার। কে. মল্লিক 'নিশীথশয়নে' গেয়েছেন ভৈরবী রাগে। এম্. এন্. ঘোষ 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার' গেয়েছেন ছায়ানট রাগে। অথবা, কৃষ্ণভামিনী 'ও জে মানে না মানা'* গেয়েছেন প্রচুর তান সহযোগে। এসব অনুমোদন করা যায় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে রেকর্ড করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বা বিশ্বভারতীর কোনও যোগাযোগ ছিল না। তবে সাহানা দেবী, মালতী ঘোষাল প্রভৃতির টপ্পাঙ্গ গানে (এ পরবাসে প্রভৃতি) যে সামান্য তান বিস্তার তা মূল গানটিকে ছাপিয়ে যায়নি বলে এবং বিশেষত এ সব গানে বিশ্বভারতীর অনুমোদন রয়েছে বলে এ সব সুরকে অনুমোদনযোগ্য মনে করা যেতে পারে।

তাল নির্দেশের ব্যাপারেও বিভ্রান্তি কম নেই। 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানটির মাত্রাবিন্যাস ৫/৫ রয়েছে (স্বর-১৬)। বাদক কী বাজাবেন! ঝম্পক, ঝাঁপতাল, অর্ধঝাঁপতাল—কোনওটাই তো নয়। সে রকম 'নাই বা এলে যদি' গানটির তাল নির্দেশ ৬/৬ (স্বর-৩০)। বাদক কী বাজাবেন? এ সবের ঠেকা নির্দেশ থাকা উচিত। 'এবার নীরব করে দাও হে' গানটির (স্বর-৩৭) শীর্ষে 'বিলম্বিত ত্রিতাল' লেখা থাকলেও তালবিভাগ অনুযায়ী দাঁড়ায় ৮/৮ = ১৬ মাত্রা, আবার তালাঙ্কের হিসেবে ৮/৮/৮/৮ = ৩২ মাত্রা রয়েছে। বাদক কী করবেন? বোঝা মুশকিল।

লয় নির্দেশ বর্তমানে কোনও কোনও গ্রন্থে দেওয়া হচ্ছে। লয় নির্দেশ ব্যাপারে (বা তাল ব্যাপারেও) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কোনও অভিমত যে ছিল না তা বোঝা যায় ৫৮নং স্বরবিতানে 'ওগো আমার চির অচেনা' গানটির পাদটীকায় স্বরলিপিকারের নির্দেশে—"আরো পাঁচমাত্রা (২/৩) টানিলে প্রচলিত ঝাঁপতালে গানটি গাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে গানটির গাম্ভীর্য বাড়িবে।" —এ তো রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ নয়।

আমার মনে হয়, তালনির্দেশ বা লয়নির্দেশ শিক্ষার্থীকে সাহায্য করার জন্যই থাকা উচিত। এ নির্দেশ সকলের জন্য আবশ্যিক না হওয়াই উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গায়নকালে, নির্দেশ না দিলেও গুণী বাদক এমন ঠেকা বা ছন্দ বাজাতে পারেন যা স্বরবিতানের নির্দেশ অপেক্ষা সঙ্গততর সঙ্গত হয়ে ওঠে।

* Gramaphone Company of India-র রেকর্ডে (No.- G.C.13190) এই বানান ছিল।

"অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি,"— এ দাঁড়ির বা দণ্ডের সামনে কিন্তু রসিক গায়ককে বিভ্রান্ত হতে হয়। 'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে' (স্বর-৩০) গানটির সমাপ্তি নির্দেশ আছে, 'মুকুল' কথাটিতে— যা কোনও অর্থেই পৌঁছে দেয় না। 'ডাকলে কেন গো' গেয়ে অথবা 'গেল ঝরে' গেয়ে অবসান করলে একটা অর্থে পৌঁছনো যায়। 'এবার নীরব করে দাও হে' (স্বর-৩৭) গানটির সমাপ্তি নির্দেশ আছে স্থায়ীর দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দে— যা অর্থের দিক দিয়ে একেবারেই অসমাপ্তিজ্ঞাপক।

এ রকম আরও অসঙ্গতি আছে। তা সত্ত্বেও স্বরলিপি বা স্বরবিতানকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তবে স্বরলিপিকে কাঠামোমাত্র বলেই ধরে নেওয়া উচিত। কাঠামোর মূল্যও কম নয়। রবীন্দ্রনাথের গানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে স্বরলিপির কাঠামো অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের গান বিশুদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে গেলে চাই একটি প্রামাণ্য মানদণ্ড। স্বরবিতানগুলি সে মানদণ্ডের কাজ করবে। সুতরাং স্বরবিতানগুলির সম্পাদনব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে। ক্যাসেটবদ্ধ করে রাখতে পারলে ভাল হত; কিন্তু সে ব্যাপারে কবিকণ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুকেই তো প্রামাণ্য বলে ভাবা যায় না। সুতরাং স্বরবিতানগুলিই একমাত্র অবলম্বন। আর একথাও সত্য যে স্বরবিতানগুলি আছে বলেই এবং তা পালন করার শাসনমান্যতা বা শিল্পীদের দায়বদ্ধতা আছে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত এখনও অক্ষতই থাকতে পেরেছে, যা অতুলপ্রসাদ বা নজরুলের গান পারেনি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংরক্ষণ ব্যাপারে স্বরবিতান বা স্বরলিপির দায়িত্ব সম্পর্কে যেমন বলা গেল তেমনই আর একটি প্রশ্ন সম্পর্কেও ভাবা উচিত। সেটি রাবীন্দ্রিক গায়কি। সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। আমরা অনেক সময় একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে গায়কি সম্পর্কে কথা বলি; বিশেষ বিশেষ শিক্ষক বা গায়কের style-কেই মনে করি আদর্শ রাবীন্দ্রিক গায়কি। এ ব্যাপারে নির্মোহ এবং যুক্তিবদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন।

গায়ক শব্দের উত্তর ভাবার্থে ই/ঈ প্রয়োগে 'গায়কি'/'গায়কী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।* সেদিক থেকে গায়কি বলতে বোঝায় সেই বস্তুকেই যা গায়কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈশেষিক লক্ষণ বা গায়কের style— অর্থাৎ গায়কের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, স্বরপ্রয়োগ, modulation প্রভৃতি সাঙ্গীতিক আনুষঙ্গিক ব্যাপার। ব্যাপারটি সম্পূর্ণই গায়ক সম্পৃক্ত। তবে পরে শব্দটির অর্থব্যাপ্তি ঘটেছে। এক একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জনপ্রিয় সঙ্গীতস্রষ্টা তাঁর আপন গানে আপন ব্যক্তিত্বকে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁর শিষ্যভক্তরা তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বসৃষ্ট গায়কিকে আয়ত্ত করে পরম্পরায় বয়ে নিয়ে গেছেন। এ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি ঘরানার। কালক্রমে ঘরানাগুলিও আবার বিভক্ত হয়েছে নানা ধারায় নানা গায়কের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে। সংযোগের অপ্রতুলতা এবং গায়কদের কমঠবৃত্তি ঘরানাপ্রথাকে রক্ষা করে এসেছে আজও পর্যন্ত। তবে আজ ঘরানাপ্রথা সংকটের মুখে। গায়কিও তাই।

স্রষ্টা যখন নিজেই গায়ক তখন কোনও সমস্যা থাকে না। কিন্তু গায়ক যখন অপর ব্যক্তি, তখন প্রশ্ন আসে। তখন 'গায়কি' শব্দে আমরা বুঝি মূল স্রষ্টার গায়কি এবং পরবর্তী বা অপর গায়কের নিজস্ব গায়কি-র যোগফল। আবার ওস্তাদরা যখন বলেন —'ঠুংরির গায়কি' বা 'টপ্পার গায়কি' বা 'গজলের গায়কি'— তখন বিশেষ বিশেষ গীতশৈলীর ঢঙ্ বা styleকেও (অর্থব্যাপ্তির কারণে) 'গায়কি' বুঝি। তখন আবার গায়কি মানে দাঁড়াচ্ছে = মূল স্রষ্টার গায়কি + গীতশৈলীর style + গায়কের Style বা গায়কি। এবং এমনি করে মূল গায়কের গায়কি প্রজন্ম গতিকে পরিবর্তিত হতে হতে এগিয়ে যায়। আর আজকাল Communication, Radio, T.V., Record প্রভৃতির কারণে একই গায়ক বহু পূর্বসূরির গায়কিকে অধিগত করে গানে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেন। ফলে তানসেনের গান আজ যাঁরা গাইছেন তাঁরা প্রায় নিজের গায়কিতেই গাইছেন। সুতরাং 'গায়কি' শব্দটির আজ আর কোনও সংজ্ঞা দেওয়া মুশকিল। উৎসমুখের নদী আর মোহনার নদী— নামে এক হলেও রূপে-গুণে আলাদা। (যেমন 'কিরানা' ঘরানা। আব্দুল করিম খাঁর গায়কিকে কিরাণা ঘরানা বলে জানি। সেদিক থেকে হীরাবাঈ ও কুমার গন্ধর্বকে চিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু গন্ধর্ববাঈ একটু আলাদা। ভীমসেন একটু আলাদা, আমীর খাঁও একটু আলাদা। বাঙালি গায়কদের মধ্যেও কিরানা ঘরানার মিশ্রিত পরিবেশন শোনা যায়।)

রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কি বিচার করতে গেলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, কৈশোর থেকে সারাজীবন, ৬০/৭০ বছর, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই একই style-এ সব গান করেননি। এ দীর্ঘ সময়ে নিশ্চয়ই উচ্চারণের পরিবর্তন (তাঁর এবং কলকাতার ও বঙ্গদেশেরও) ঘটেছে; স্বরপ্রয়োগ, কণ্ঠস্বর— সব কিছুতেই পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি গীতশৈলীর আনুপাতিক মিশ্রণে তাঁর গায়কিতে নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছে। তৃতীয়ত, তাঁর গায়কির কোনও প্রত্যক্ষ নমুনা আমরা পাই না। পরোক্ষভাবে যা পাই, তাতে অমলা দাশ, সাহানা দেবী, কনক দাস, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব প্রভৃতির

* গায়ক-এর স্ত্রীলিঙ্গেও 'গায়কী' হয়। 'গাইছে গায়কী'— মধুসূদন।

আপন বৈশিষ্ট্যও মিশ্রিত না হয়ে থাকেনি। (স্মরণ করুন— দিলীপকুমারকে উক্ত রবীন্দ্রনাথের কথা "সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম।") রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের এ সব গায়ক / শিক্ষককে নিয়ে যাঁরা গান শিখেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে : রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কি = রবীন্দ্রনাথের গায়কি (নানা বয়সে নানা রকম) + তাঁর শিখাদের গায়কি + তাঁর প্রশিষ্যদের গায়কি; আর এ ভাবে দেখা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কি বলতে পরিবর্তনশীলতা ছাড়া আর সামান্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে, যাকে আলাদা করে নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা যায় না। যেমন, পূর্বেই মোহনার নদীর উল্লেখ করেছি।

তবে আমার মনে হয়, যিনি নিবিষ্টতার সঙ্গে কিছুদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখেন বা এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের রেকর্ড শুনেও গান করেন, (অবশ্যই ধৈর্যের সঙ্গে) — তাঁর মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরগত জনিত কিছু বিশিষ্টতার বোধ এবং উচ্চারণ, স্বরপ্রয়োগ প্রভৃতি আপনা থেকেই কিছু কিছু এসে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর গায়কির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্পর্শ। যেমন দেবব্রত বিশ্বাস। ইনি রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রশিষ্যদের কারও কাছে তালিম নেননি। তবু কি অরাবীন্দ্রিক? — যদিও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্যও সোচ্চার।

অসাধারণ ক্ষমতাবান ভিন্ন-গানের গায়করাও রবীন্দ্রসঙ্গীতে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। চল্লিশ/পঞ্চাশের দশকে পঙ্কজকুমার মল্লিক বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নানা ধরনের গান গাইলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে আপন আপন অধিকার প্রমাণ করেছেন। এবং একালে কিশোরকুমারের গানেও তার প্রমাণ আছে। কিশোর কুমার খুব অল্প গানই রেকর্ড করে গেছেন। আরও গান গেলে আমরা উপকৃতই হতাম, রবীন্দ্রসঙ্গীতও আরও রসগর্ভতার পরিচয় দিতে পারত। সাহানা দেবীর বা শান্তিদেবের গায়কির সঙ্গে দেবব্রত-হেমন্ত-পঙ্কজের গায়কির যে পার্থক্য — কিশোরকুমারের গায়কির পার্থক্য তার চেয়ে বেশি নয়। এঁর গানগুলিকে অরাবীন্দ্রিক বলে ভাববার কোনও কারণ নেই।

আমার মনে হয় আমাদের বোধ হয় কেউ-ই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গায়কি-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত নই। তাঁর শিখাদের গান এবং গীতশৈলীগত গায়কি থেকেই আমরা এক ধরনের আদর্শ গ্রহণ করি এবং যদি আমাদের নিজস্ব প্রবল গায়ক ব্যক্তিত্ব যুক্ত থাকে তাহলে সেটাই হবে বিশুদ্ধ রবীন্দ্রগায়কি— যদি আদৌ 'বিশুদ্ধ' বলে কিছুকে ভাবা যায়। সব সঙ্গীতধারাই এভাবেই দীর্ঘকাল প্রবাহিত থাকে। নতুন গায়কির স্পর্শ না পেলে গীতধারা লুপ্ত হয়ে যায়। অতএব কারও ভাবা উচিত নয় যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গেলে আমাদের অনোর গায়কি ধার করে গাইতে হবে। গানে গায়কের নিজের গায়কি কিছু যুক্ত না হলে তা ভাল গান হতেই পারে না।

তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিশ্চয়ই গায়কদের কাছে সামান্য নিষ্ঠা দাবি করবে। পদাবলী কীর্তন গাইতে গেলে যেমন গজলের ঢঙে গাওয়া যায় না, কিছুদিন কীর্তন অভ্যাস করতে হয়,— তেমনই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গেলেও তার গীতশৈলীগত পার্থক্যটুকু তো মানতেই হবে। এবং সেজন্য কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা ও অভ্যাস করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে বসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে যুগপৎ 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'সাহানা'কেও শুনতে কিছু চেষ্টা করেছেন— সাহানাও তেমনই আপন গলায় 'সাহানা'র সঙ্গে সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ'কেও প্রকাশ করতে প্রযত্ন করেছেন।

গায়কি সম্পর্কে যা বলা হল তার অনুসৃতি হিসাবে গায়কের স্বাধীনতার প্রশ্নটি আসে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এমনই এক উত্তরাধিকার যার সঙ্গে প্রত্যেকটি বাঙালির হৃদয়ের যোগ আছে। তাই গায়কের দায়িত্ববোধ বা কর্তব্য ও স্বাধীনতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে "গানের গতি অনেকখানি তরল", তাই "গায়কে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে।" রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেননি। আমরাও আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিয়ে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংযম না থাকলে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। এখন আমাদের দেখতে হবে স্বাধীনতার সীমা কতদূর পর্যন্ত এবং দায়দায়িত্বই বা কতটুকু।

প্রশ্নটি উঠেছে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনায়। পূর্বে অনেকেই স্বাধীনভাবে রবিবাবুর গান গেয়েছেন এবং স্বাধীনতার অপব্যয়ও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়েছেন। এবং একটা সীমা নির্ধারণ করার কথা ভেবেই বলেছেন— 'শেষ কথা সুরবিহার সম্বন্ধে। ...এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। " — এ উক্তিতে আমার মনে হয় 'আমার অনেক গান' বলতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাগ-প্রধান ভাঙা গানগুলি সম্পর্কেই এই স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। মালতী ঘোষাল প্রমুখের 'এ পরবাসে রবে কে' প্রভৃতি গানে যে বিশেষ সুরবিহার শুনি তা এ কারণেই অনুমোদনযোগ্য। তবে রবীন্দ্রনাথ এর একটা সীমা রাখতে চাইছেন। বলছেন —"আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে। কতখানি ছাড়া দেব? আর কাকে? বড়ো প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছোট বড়োর তফাৎ আছেই। রবীন্দ্রনাথের 'এই কতখানি ছাড়া দেব'— এটা নির্ভর করবে আমাদের সুসংস্কৃত রসবোধের উপর। আমার মনে হয় রাগপ্রধান ভাঙা গানগুলির ক্ষেত্রে

মালতী ঘোষাল প্রমুখ-কৃত সুরবিহারের পরিস্থিতিই আদর্শ হওয়া উচিত: একটু কম-বেশিও হতে পারে। তা ছাড়া উপায়ও নেই কারণ স্বরবিতান এবং রেকর্ডের সুর একরকম নয়— অর্থাৎ মূল মানদণ্ড বা স্বরবিতান এখানে ধ্রুব নয়, দুর্বল। আর ভালো গানে বা টপ্পাঙ্গ গানে এ ধরনের পার্থক্য ব্যাপারে নিশ্চিত হতে গেলে রেকর্ড বা টেপ্-এর সাহায্য দরকার— যা রবীন্দ্রনাথের কালে দুর্লভ ছিল এ দেশে। সুতরাং এটুকু স্বাধীনতা গায়ক পেতে পারেন। অন্যথায় এ সব গান কোনওদিন গাওয়াই হবে না।

ভাঙা রাগপ্রধান গানগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য স্বরীয় রচনা (গান) প্রসঙ্গে— "একটু দরদ দিয়ে একটু রস দিয়ে গান শিখিও", —"তার উপরে তোমরা যদি স্টীম্ রোলার চালিয়ে দাও আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে"— প্রভৃতি অনুরোধকেই নির্দেশ হিসাবে মানা উচিত। স্বরলিপির নিষ্পাণ অঙ্ক অনুকরণে গান 'চেপ্টা' হয়ে যায় —'স্টীম রোলার' তাকেই বলা হয়েছে মনে হয়। স্বরলিপির বা স্বরবিতানের যখন সীমাবদ্ধতা আছেই, তখন গায়কের 'দরদ' এর খাতিরে কিছু ছাড় বা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। "কতখানি ছাড়"— সেটা নির্ভর করবে গানটির কথা, রাগচরিত্র, তাল ও সুরের কাঠামোকে বজায় রেখে বাতায়ের পরিমিতির উপর। আমার মনে হয় কেবল স্পর্শস্বর ও লয়ের সামান্য রকমফের করা যেতে পারে। যোগ্য শিল্পীরা যে এই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকেই রসসৃষ্টি করতে পারেন— পঙ্কজ-দেবব্রত-হেমন্ত-কিশোরকুমার এবং সুচিত্রা-কণিকারা তা দেখিয়েছেন।

স্পর্শস্বর সম্পর্কে বলি। 'দেশ' রাগাশ্রিত 'এসো শ্যামল সুন্দর' গানটির প্রাথমিক ঋষভ স্বরটিতে যদি স্বরলিপি বহির্ভূত মধ্যমের স্পর্শ লাগে তো সেটা দোষাবহ হবে না। কিন্তু কেউ যদি — দেশ-রাগে কদাচিৎ কোমল গান্ধার ব্যবহার হয় বলে — এ গানটিতেও যত্রতত্র কোমল গান্ধার লাগান, তবে সেটা অন্যায় হবে। বেহাগ-আশ্রিত কোনও কোনও গানে তিনি কড়ি মধ্যম বর্জন করেছেন। কোনও গায়ক যদি বেহাগে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার আছে বলে ওই সব গানে কড়ি মধ্যমের স্পর্শ লাগান, তবে তা অনুচিত হবে। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের রাগ-ধারণা তাঁর যৌবন ও মধ্য বয়সে বাংলাদেশে প্রচলিত বিশেষ ধরনের ভীমপলশ্রী, বেহাগ, মূলতান, মেঘ, মল্লার, পূরবী, তোড়ী, বসন্ত প্রভৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং স্পর্শস্বরের ক্ষেত্রেও রাগনিয়মকে যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। এর সঙ্গে অনুকোমল ও অতিকোমলকেও মনে রাখা দরকার। সুতরাং বাতায় সাধন করতে গেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভাল করে জেনে বুঝে নেওয়া উচিত।

সর্বোপরি মনে রাখা কর্তব্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অপব্যবহার যেমন দেশের ক্ষতি করে তেমনই গানের ক্ষেত্রেও সুরের বা কথার বিকৃতিতে আমাদের সংস্কৃতির সমূহ ক্ষতি। কথায় বলে— যাকে রাখ সেই রাখে। ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধর্মকে রক্ষা করলেই ধর্মও আমাদের রক্ষা করবে। এ কথা নিত্যর গরজীরা ব্যবসাদারী ব্যস্ততায় যেন ভুলে না যান।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সর্বশক্তিতে রক্ষা করার জন্য শিল্পীদের সচেতন প্রয়াস শিল্পীদের আপন আনন্দের জন্যই প্রয়োজন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার সৃষ্টি শিল্পীকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যত সযত্নে গ্রহণ করা যাবে ততই সে আমাদের গভীর গভীরতর আনন্দের স্বর্গলোকে নিয়ে যাবে। কারণ শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ শিল্প এই রবীন্দ্রসঙ্গীত অতলস্পর্শ রসগর্ভতায় কালোত্তীর্ণ হবার অধিকারী। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে সবচেয়ে লাভবান হবেন গায়ক নিজেই। □

"ঘেরাও মন্ত্রী" সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে

"আমাকে কলুষিত করবেন না"

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে (নভেম্বর ২২, ১৯৯৭) শ্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এক বাংলা সংবাদপত্রের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন "স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষেই গণতন্ত্র নিষ্কলুষ হোক"। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে জানান যে "ক্রিমিনালরা কোনও কোনও রাজ্য দখল করে নিয়েছে। কেন্দ্রেও ওই ঘটনা ঘটবে। আশা ওটা দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব না।" হায় ঘটবে। আশা ওটা দেখার জন্য আমি বেঁচে থাকব না।"

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে তিনি সৎ চিন্তা ও সৎ রাজনীতি করার জন্য তাঁর মন উজাড় করে কথাগুলো বলেছেন। কিন্তু শুনতে যতই ভাল লাগুক মনে রাখতে হবে যে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তিনি "ডাইনি শিকার" করবেন না বা করতে দেবেন না। এবং সে অঙ্গীকার তিনি পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। তিনি কোন 'ডান' বা 'ডাইনি'কে আইনের শিকার হতে দেওয়া থেকে যতটা পারেন তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাই যখন সব কোর্টে হেরে গিয়ে কোনও রাজ্যের এক কলুষিত মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার সময় এল, তখন তিনি তাঁর বশংবদ কর্মচারীদের দ্বারা তাঁকে অ্যারেস্ট হতে না দিয়ে কোর্টে আত্মসমর্পণের সুযোগ করে দিলেন। একটি অতিথিশালাকে জেল বলে ঘোষণা করে সেখানে তিন/চার তারকার সুযোগ সুবিধে দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন। কোর্টের আদেশের ন্যূনতম মর্যাদাও দিলেন না। শুধু কি তাই, তাঁর স্বল্পশিক্ষিত ও রাজশাসনে অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ পত্নীকে তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী করে গণতন্ত্রের প্রতি যে চরম উপহাস করা হচ্ছে তার মূলেও এই ব্যক্তি যিনি নিষ্কলুষ রাজনীতি করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এঁদের কথায় কোনও বিশ্বাস রাখা যায় না। এঁদের কথার কোনও মূল্য নেই। যতদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে আদর্শবাদ ফিরে না আসছে ততদিন পর্যন্ত এ দেশের রাজনীতি নোংরা থাকতে বাধ্য। যে রাজনৈতিক দল শুধু আদর্শ কপায়ণের জন্য ক্ষমতায় আসবে একমাত্র সেই দলই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা চালাতে পারবে। তা ছাড়া আজ দেশের সামনে রোল মডেলই বা কোথায়? কাকে দেখে লোকে বলতে পারবে যে এই এক সৎ রাজনৈতিক দল এবং এর নেতারা সৎ চরিত্রের লোক। হয়ত ব্যক্তিগত সততা আজও কিছু নেতার মধ্যে আছে; কিন্তু তাঁরা জঘন্যতম রাজনৈতিক অসততা করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করেন না। কলুষিত রাজনীতি করে নিষ্কলুষ চরিত্র রাখা যায় না।

অথচ এ নয় যে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ও দলগত সততাসম্পন্ন নেতা ছিলেন না। মহাত্মাজি বা তাঁর আমলের নেতাদের কথা ছেড়েই দিলাম। অধুনাকালেও প্রাদেশিক নেতাদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত সততা দেখেছি আমার কর্মজীবনে তা যদি কিছুটা লিপিবদ্ধ করে না রাখি তাহলে শুধু তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে তা নয়, এ প্রজন্মের ছেলে মেয়েদেরও বঞ্চিত করা হবে ইতিহাসের কিছু উজ্জ্বল শিক্ষা থেকে।

আজ যাঁর কথা লিখব তিনি হচ্ছেন প্রয়াত সুবোধ ব্যানার্জী। উনি Socialist Unity Centre পার্টির নেতা ছিলেন। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-৭০ সনের দুই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সনে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে উনি ছিলেন শ্রমমন্ত্রী। "ঘেরাও"-কে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের ন্যায়সঙ্গত হাতিয়ার বলে ঘোষণা করে তিনি খুবই বিতর্কিত ব্যক্তি হয়ে পড়েন। সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও তাঁর নাম হয় "ঘেরাও মন্ত্রী"। তিনি ইংরাজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন এক নতুন শব্দের সংযোজনা করে। "ঘেরাও" কথাটি The Concise Oxford Dictionary-তে আছে। তাতে বলা হচ্ছে "gherao (gerow)n. (pl-s) (India and Pakistan) harassment of employers

etc. by workers preventing them from leaving premises until claims are granted [f. Hind. gherna-besiege]"

ফরাসি বিপ্লবে পর "গিলোটিন' কথাটি যেমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিল সমস্ত য়ুরোপে — সুবোধ ব্যানার্জীর "ঘেরাও" তেমনই এক ভয়ঙ্কর ভীতিসঞ্চারক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল মালিক শ্রেণীর মধ্যে। অনেকে বলেন যে পঃ বঙ্গের অর্থনৈতিক বিশেষ করে শিল্পের অবক্ষয়ের শুরু হয় ঘেরাও থেকে যার রেশ আজও সম্পূর্ণ কাটেনি।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে আমি পঃ বঙ্গের শ্রম সচিব ছিলাম। মনে আছে মুম্বাইয়ের এক বিখ্যাত অর্থনীতি বিষয়ক দৈনিক কাগজ আমাকে পঃ বঙ্গের শ্রমসমস্যার উপর একটি লেখা দিতে বলেন। আমি "Labour Mood In West Bengal" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি। তার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে যত শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার অধিকাংশ হয়েছিল 'লক-আউটের' জন্য — তারপর ধর্মঘট। ঘেরাওয়ের জন্য নষ্ট হয়েছিল অতি সামান্য, ৫ শতাংশেরও কম। এই পরিসংখ্যান মালিকের দেওয়া শ্রমদিবস নষ্ট হবার কারণ দেখানো রিটার্নের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে এই লেখা সে আমলে বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি করে।

তখন শ্রমমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত গোপাল দাস নাগ। এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক। শ্রম সচিব হিসাবে ট্রেড য়ুনিয়ন নেতাদের সঙ্গে অহরহ দেখাশুনা হয় মিটিং হয়। একদিন এদের কারুর মারফত খবর পেলাম যে সুবোধ ব্যানার্জী খুবই অসুস্থ হয়ে ট্রপিকাল স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। আমি গোপালবাবুকে জানালাম। উনি বলেন যে, কিছুদিন আগেই তো ওই হাসপাতালে ছিলেন এবং ছাড়া পেয়েছিলেন। আবার কি হল একবার খোঁজ নিয়ে আসুন। এবং জিজ্ঞেস করবেন কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কি না।'

সেদিনই বিকালে ভিসিটিং আওয়ারে গেলাম। দেখলাম উনি খুবই দুর্বল। খুব আস্তে আস্তে কথা বলছেন। মুখে একটি শান্ত স্মিত হাসি। খুব খুশি হলেন আমাকে দেখে। গোপালবাবুকে ধন্যবাদ জানালেন খোঁজ খবর নেবার জন্য। যখন জিজ্ঞেস করলাম কোনও কিছুর দরকার আছে কিনা, হেসে উত্তর দিলেন "এ রোগের তো কোনও ওষুধ নেই — কাজেই কিছুই দরকার নেই। আর আমার মেয়াদ বড় জোর তিন মাস। সেটা তিন সপ্তাহও হতে পারে আর তিন-চার দিনও হতে পারে। এ কদিনের জন্য আমার কোনও কিছুই দরকার নেই। আপনারা এসে আমার খোঁজ নিচ্ছেন সেটাই আমার মহৌষধ।" বলে আবার সেই সুন্দর হাসি।

সময় হয়ে গেছে। বাইরে এলাম। দেখলাম করিডর দিয়ে দুজন ডাক্তারবাবু আসছেন। বুঝলাম ওঁরা সন্ধ্যের রাউণ্ডে বেরিয়েছেন। যখন দেখলাম যে ওঁরা সুবোধবাবুর ঘরে ঢুকছেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। মিনিট দশেক পরে ওঁরা বেরুলে আমি পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কোনও ওষুধ আনতে হবে কিনা। সিনিয়র ডাক্তার তাঁর জুনিয়রের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে বললেন যে আগামীকাল এ সময়ে এসে ওর সঙ্গে যেন ওঁর চেম্বারে দেখা করি। যদি কিছু করার থাকে তাহলে বলে দেবেন।

পরের দিন একটু দেরি করে এসে সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম একদিনেই বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন। গলার স্বর আরও ক্ষীণ। কিন্তু চোখ উজ্জ্বল ও মুখে সেই সুন্দর হাসি। যথাসময়ে সেই ডাক্তারবাবুর ঘরে হাজির হলাম। একটু পরে রাউণ্ড সেরে উনি এলেন এবং বললেন যে উনি ওঁর অন্যান্য সহকর্মী ও ডিরেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ওষুধ ঠিক করেছেন। এটি Life Saving ওষুধ নয় Life prolonging ওষুধ। এটাতে রোগের নিরাময় হবে না তবে দ্রুত অবনতি রুখে দিতে পারবে। একটা কোর্স হচ্ছে পনেরোটা injection। রোগী যদি দশটা injection সহ্য করে সামলে উঠতে পারে তাহলে রোগী আট-দশ মাস থেকে দেড় দুবছর বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ ওষুধ ভারতে বাণিজ্যিকভাবে আসেইনি। কেন্দ্রীয় সরকারের Central Drug Store বা Army Drug Store-এ ওষুধ নেই। এটা সরাসরি বিলেত থেকে কিনে আনতে হবে। এঁরা এ ওষুধের কথা কাউকে বলেন না কারণ রোগীর মনে আশা জাগিয়ে নিরাশায় ফেলে দিলে মৃত্যু আরও তাড়াতাড়ি হয়। যেহেতু শ্রমমন্ত্রী চেষ্টা করবেন বলেছেন তাই উনি এই ওষুধের নাম দিলেন।

গোপালবাবু বেশ সন্ধ্যে পর্যন্ত অফিসে থাকতেন। তাই হাসপাতাল থেকে সোজাসুজি ওঁর কাছে গেলাম। সব জানালাম। তখন যেসব কড়া আইন কানুন ছিল সেসব মেনে সরকারিভাবে ওষুধ আনতে তিন-চার সপ্তাহ লেগে যেত। ততদিন সুবোধবাবু থাকবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তখন ঠিক হল যে কলকাতায় যেসব বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে যাদের প্রচুর রপ্তানী হয় বিলেতে এবং সেখানেও অফিস আছে এদের কারুর মাধ্যমে ওষুধ তাড়াতাড়ি আনাতে হবে। আমরা যখন কথাবার্তা বলছি তখন কলকাতার এক ইংরাজি কাগজের সাংবাদিকও ঘরে ছিলেন এবং তিনিও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক হল যে দাম যা হবে তা নিয়মমতো অনুমতি নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে পরে পাউন্ডে দেওয়া হবে।

পরের সকালে সেই কাগজে খবর বেরুল যে সুবোধবাবু খুব গুরুতর অসুস্থ এবং সরকার তাঁর জন্য বিলেত থেকে এক দুষ্প্রাপ্য ওষুধ আনাবার ব্যবস্থা করছেন। অফিসে আসার পরই কলকাতার British Airwaysএর ম্যানেজারের ফোন

এল যে যদি ওষুধটা বিলেতে কিনে ওঁদের দেওয়া হয় তাহলে ওঁরা বিনা খরচায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় পৌঁছে দেবেন। গোপালবাবুও অফিসে এসে একটি নামী প্রতিষ্ঠানের মালিককে তাঁর সঙ্গে তখনি দেখা করতে অনুরোধ করলেন। তিনিও খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন। এবং কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন তাঁর বিলেতের অফিসের মাধ্যমে ওষুধটা কিনতে। দামের কথা যখন বলা হল তখন উনি জানালেন যে humanitarian groundএ সামান্য কিছু খরচ বিলেতের audit গ্রাহ্য করে তাই কোনও দাম দেবার দরকার নেই। শ্রমমন্ত্রীর অফিস থেকেই ওই ভদ্রলোকটির সঙ্গে British Airwaysএর ম্যানেজারের যোগাযোগ করানো হল এবং সেদিনই দুপক্ষের খবর তাদের নিজ নিজ দপ্তরে পৌঁছে গেল ওষুধ কিনে British Airways মারফত পাঠাবার জন্য। বোঝা গেল যে শত চেষ্টা করলেও সেদিন থেকে চারদিনের আগে ওষুধ পৌঁছবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে বললাম যে চারদিনের মাথায় ওষুধ কলকাতায় পৌঁছবে — এর আগে করা সম্ভব হবে না — কিন্তু সেটা কি খুব দেরি হয়ে যাবে? উনি জানালেন যে যদিও সুবোধবাবুর অবস্থা খুবই তাড়াতাড়ি অবনতি হচ্ছে তাহলেও উনি দিন চার-পাঁচেকের মধ্যে বড় কিছু হবে সে আশঙ্কা করছেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে চারদিনের ভেতর আদৌ ওষুধ এসে পৌঁছবে।

ঠিক চারদিনের দিন ওষধু পৌঁছল। কিন্তু সন্ধের পরে তখন আমরা অফিস থেকে চলে এসেছি। সে রাত্তিরে আর কিছু করা হল না। পরের দিন সকালে অফিসে পৌঁছে দেখি যে British Airwaysএর এক অফিসার একটা বড় প্যাকেট নিয়ে হাজির। প্যাকেটটিকে শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে নিয়ে গেলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরকে ফোনে জানালেন যে ওষধু এসে গেছে এবং তখনই যেন চিকিৎসা শুরু হয়। আমাকে বললেন আমি যেন তখনই সুবোধবাবুর ঘরে ওষুধের প্যাকেটটি রেখে আসি।

গত পাঁচদিন আমি সুবোধবাবুর ঘরে যাইনি। সেদিন সকালে গিয়ে দেখি যে ওঁর অবস্থার ভীষণ অবনতি হয়েছে। কথা বলছেন না। ওঁর হাতে একটি স্লেট ও পেনসিল। মুখে সেই হাসি যদিও চোখের সজীবতা অনেকটা কমে গেছে। আমি ওষুধের প্যাকেটটা ওঁর সাইড টেবিলে রেখে বললাম যে শ্রমমন্ত্রী এই ওষুধ বিলেত থেকে আনিয়েছেন এবং হাসপাতালে ফোন করেছেন এখনই চিকিৎসা শুরু করার জন্য। শুনে একটা অদ্ভুত হাসি হাসলেন। এবং স্লেটে লিখলেন "এই ওষুধ কি কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কিনে দিয়েছেন?" আমি ঠিক উত্তর না দিয়ে বললাম যে ব্রিটেনের সরকারি এয়ার লাইন এই ওষুধ বিনা খরচায় নিয়ে এসেছেন। উনি আবার লিখলেন "উত্তর হল না। বলুন ঠিক কি হয়েছে?" আমি আর মিথ্যা কথা বলতে পারলাম না। সব খুলে বললাম এবং ওঁকে জানালাম যে সরকার এখনও পাউন্ড দিতে রাজি আছেন যদি ওঁরা চান।

ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ধীরে ধীরে স্লেট পরিষ্কার করলেন। তারপর ছোট ছোট করে লিখলেন "গোপালবাবুকে ধন্যবাদ। ওই প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ। সারা জীবন যা করিনি মৃত্যুর আগে আমাকে কলুষিত করবেন না। দয়া করে ওষুধ ফেরত নিয়ে যান।"

স্লেটটা আমার হাতে তুলে দিলেন এবং হাসলেন। পড়ে স্লেটটি, ওঁর পত্নী বসেছিলেন, তাঁকে দিলাম। উনি পড়ে সম্ভবত ওঁদের কন্যা বসেছিলেন তাকে দিলেন। দুজনের পড়া হয়ে গেলে সবিনয়ে শ্রীমতী ব্যানার্জী আমাকে বললেন যে, আপনারা যা করেছেন তা তুলনাহীন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। দয়া করে এখনই প্যাকেটটা নিয়ে যান নইলে হয়ত বিরাট বিপদ হবে।

আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তিনজনের মুখের দিকে তাকালাম। রোগী জানেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। পত্নী ও কন্যা জানেন যে তাঁদের স্বামীর ও পিতার সময় আর নেই। সামনে ওষুধ যা তাঁর জীবনকে ছ'মাস, ন'মাস দেড় বছর দু'বছর বাড়িয়ে দিতে পারবে। দুষ্প্রাপ্য জীবনদায়ী ওষুধ। কিন্তু তিনি দৃঢ় ও রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন কেননা এ ওষুধ মালিকের টাকায় কেনা তাই কলুষিত। তিনজনের একজনও কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না ওষুধ ফেরত দিতে। ওষুধের বাক্স হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আবার সুবোধবাবুর দিকে তাকালাম। উনি হেসে মাথাটি একটু নাড়লেন। হঠাৎ দেখলাম চোখের সে উজ্জ্বলতা আবার ফিরে এসেছে। মনে হল ওঁর মন থেকে একটা বিরাট ভারী বোঝা নেমে গিয়ে ওঁকে হাল্কা করে দিয়েছে। বেরিয়ে আসার পর পর্দা সরিয়ে আর একবার দেখলাম। মুখ যেন রণক্লান্ত কিন্তু রণজয়ীর বিজয়উল্লাসে উদ্ভাসিত। চোখে তাঁর একটু দুষ্টুমির দৃষ্টি, মুখে তাঁর সেই মন ভোলানো হাসি। এর দিন পাঁচেকের মধ্যেই উনি মারা যান।

একেই বলে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। মাথা উঁচু করে মরব — কিন্তু বাঁচার জন্য মাথা একটুও ঝোকাব না। এসব চরিত্র আজ রূপকথার গল্প মনে হয়। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে এই সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে। খুব বেশি দিনের কথা নয়। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে ক্লান্ত মনে দিন কাটাবার দরকার নেই — আদর্শগত নিষ্ঠা ও চারিত্রিক সততা দিয়ে আজও এই পঙ্কিল রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করা যায়। □

কলকাতা

নভেম্বর ২৪, ১৯৯৭

সম্পাদকের কিছু কথা

আবদুর রউফ

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যা (৫৭ বর্ষ ৩সংখ্যা) প্রকাশে বেশ বিলম্ব হল। বিলম্বের কারণ নতুন করে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। সম্পূর্ণ একটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস চলিয়ে যেতে হয় সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই সেকথা জানা আছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রায় পার করে দিয়ে সংখ্যাটি বের হলেও এতে চতুরঙ্গ-পাঠকদের প্রত্যাশা পূরণের আপ্রাণ প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে সেটা এখন পাঠকদেরই বিবেচ্য।

পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে — স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক আলাপ-আলোচনার জোয়ার শুরু হলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম — এই জোয়ার থেমে গেলে যেসব বিষয় তখনও অনালোচিত থেকে যাবে আমরা জোর দেব সেগুলির ওপর। সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণে রেখে আমরা প্রকাশ করেছি শ্রীনিরপেক্ষ এবং অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যের নিবন্ধ দুটি। শ্রীনিরপেক্ষ রচিত নিবন্ধটি আগে দু কিস্তি বেরিয়ে যাওয়া নিবন্ধের ধারাবাহিকতার অংশ হলেও এতে এমন একটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তীর পূর্তি উপলক্ষে যে আলোচনা খুবই জরুরি ছিল। আমরা যে-ধরনের সেকুলারিজম এবং গণতন্ত্রের চর্চা এযাবৎ করে আসছি তার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন শ্রীনিরপেক্ষ। এ ব্যাপারে আমাদের পুরাতন প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসগুলিকে নস্যাৎ করে দিতে উদ্যত হয়েছেন তিনি। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নজির টেনে যেভাবে তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারীদেরও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করে উপায় থাকবে না। অনুরূপ ভাবে চিন্তা উদ্রেককারী আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে সাফল্যের তুলনায় সমস্যার জটিলতা বেড়ে গেছে অনেক বেশি পরিমাণে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে এসবের মূল কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সমাজভাবনার যথাযথ যোগাযোগ না থাকা। উল্লেখিত দুটি নিবন্ধেই এমন কিছু পর্যবেক্ষণ এবং মৌলিক ভাবনার অবতারণা করা হয়েছে যেগুলি এড়িয়ে গেলে স্বাধীনতার অর্ধশতবর্ষের মূল্যায়ন কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। নিবন্ধ দুটি প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে চতুরঙ্গকে তার ঐতিহ্যসম্মত ভূমিকা পালনে এবং পাঠকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা করায় দুই নিবন্ধকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ বর্তমান সংখ্যার বাকি লেখকদের কাছেও। তাঁদের লেখা না পেলে চতুরঙ্গের ঐতিহ্যসম্মত মান বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব হত না। প্রসঙ্গক্রমে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় শ্রীমতী গৌরী আইয়ুবকে। বর্তমানে তিনি কি পরিমাণ শারীরিক কষ্টের মধ্যে আছেন সেকথা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। বাত ব্যাধিতে জর্জর অঙ্গগুলি সঞ্চালনের যাবতীয় ক্লেশকে উপেক্ষা করে সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে যে অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণটি তিনি করেছেন সেটির ঐতিহাসিক মূল্য রসজ্ঞ পাঠকেরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবেন। অনুরূপ গুরুত্বই আরোপ করতে হয় সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণটির প্রতি। প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথাটাই সবার জানা আছে। অনেকেই জানেন তিনি নাকি তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করেছিলেন। যে কারণে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্ক চুকে যায়। কিন্তু এই আপাত দ্বন্দ্বের আড়ালে প্রীতির যে ফল্গুধারা ছিল — সে খবর বেশির ভাগ পাঠকেরই জানা নেই। তথাকথিত প্রহারের ঘটনার মধ্যেও আসলে যা ঘটেছিল সে খবরও তাঁরা জানতেন না। শ্যামলবাবুর স্মৃতিচারণে সেসব কথার খুঁটিনাটি প্রকট হওয়ায় অনেক ধন্দই স্বচ্ছ হয়ে যাবে। অধ্যাপক অম্লান দত্ত এবং চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের (চিরঞ্জীব) লেখা দুটিও বাকি সন্তোষকুমার ঘোষকে বুঝতে অনেকখানি সহায়তা করবে। সন্তোষকুমারের 'চলার পথে' নামে শেষ গ্রন্থটি নিয়ে চতুরঙ্গের পাতায় যে অপ্রীতিকর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল এভাবেই সেটির অবসান ঘটান হল।

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যায় আরও অনেক লেখার সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যশস্বী অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. দেবকুমার বসু-র মূল্যবান রচনা দুটির কথা। রচনা দুটিতে প্রতিফলিত তাঁদের শুভ অভিপ্রায় পাঠকদের ভাবিত করুক — এই মুহূর্তে এটা আমাদেরও আন্তরিক কামনা।

ENJOY

Arambagh's chicken

SERVED **FRESH-N-CHILLED**

WITHIN MINUTES OF YOUR ORDER

FROM ANY OF OUR EXCLUSIVE

COUNTERS AT CALCUTTA

ARAMBAGH HATCHERIES LIMITED

59B, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700 020

DIAL : 240-2179/2760/1930/0873. FAX : 91-332474137

Sales Offies.351 5037/350 3089

PSL UniMcCann